খুত্বাতে মাদানিয়্যাহ

আবদুল হামীদ ফাইযী

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

পূর্বাভাষ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

যাঁরা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করেন, যাঁদেরকে সমাজের সামনে দু-চারটি ইসলামের কথা বলতে হয়, যাঁদেরকে জুমআর মিম্বরে উঠে খুতবা দিতে হয়, তাঁদেরকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করার জন্য এবারের এই লেখা। এ বইয়ে অবশ্য আমার মনের সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ করতে পারিনি। কারণ তাতে তার কলেবর বৃদ্ধি হতো এবং নতুন খতীবের কাছে তা সুদীর্ঘও মনে হতো। সুতরাং অনেক বিষয়ে কেবল পয়েন্ট নোট করেছি এবং কুরআন-হাদীস উল্লেখ ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্য প্রয়োজনে খতীব তার ব্যাখ্যা ক'রে সবিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন। আর কিছু বিষয় আছে, যা আমার অন্য কোন বই থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে; যাতে খুতবার এই বইটিও উক্ত বিষয়-সমৃদ্ধ হয়।

জুমআর খুতবা যেমনভাবে দিতে হয়, ঠিক সেইভাবে প্রত্যেকটি খুতবা লিখলে, বই মোটা হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় কেবল মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। অবশ্য তার নিয়ম শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে। খতীব সাহেব 'খুতবাহ মাসনূনাহ' আরবীতে পাঠ করার পর মূল আলোচ্য বিষয় পরিবেশন করতে পারেন। যেমন আলোচ্য বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে উভয় খুতবাকেই আলোচনা সমৃদ্ধ করার ব্যাপারটিকেও তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি সময় বুঝে এক একটি বিষয় নির্বাচন ক'রে পরিবেশন করবেন। খুতবা চলাকালে সময়ের খেয়াল রাখবেন, উপস্থিত জামাআতের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য রাখবেন, দরূদ ও দুআর যথার্থ খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ চাইলে তাঁর দ্বারা জামাআতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

আমার উপদেশ হল, কুরআনের আয়াত ও হাদীস ভাল মতো মুখস্থ ক'রে পরিবেশন করবেন। আর মুখস্থ করার শক্তি বা সময় না থাকলে ছোট কাগজে নোট ক'রে খুতবা দেবেন। তাতে অনেকে আপনাকে ছোট ভাবতে পারে; তবুও যে মূল বিষয় ছেড়ে অনেক বিষয়ে আবোল-তাবোল বলে যায়, তার চাইতে আপনি অনেক বড়।

আল্লাহ সকলকে সঠিক কথা বলার ও সঠিক পথে চলার তওফীক দিন আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
১৭/১/২০১০খ্রিঃ

জুমআর খুতবার আহকাম

(সালাতে মুবাশ্‌শির থেকে)

জুমআর খুতবার দুটি অংশ। প্রথম অংশটি প্রথম খুতবাহ এবং শেষ অংশটি দ্বিতীয় খুতবা নামে প্রসিদ্ধ। খুতবাহ মানে হল ভাষণ বা বক্তৃতা। এই ভাষণ দেওয়া ও শোনার বহু নিয়ম-নীতি আছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

খুতবার জন্য ওযূ হওয়া শর্ত নয়। তবে খুতবার পরেই যেহেতু নামায, তাই ওযু থাকা বাঞ্ছনীয়। খুতবা চলাকালে খতীবের ওযূ নষ্ট হলে খুতবার পর তিনি ওযূ করবেন এবং সে পর্যন্ত লোকেরা অপেক্ষা করবে। *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্ দার্ব, ইবনে উসাইমীন ১/২০৮)*

খুতবা পরিবেশিত হবে দন্ডায়মান অবস্থায়। বিনা ওজরে বসে জুমআর খুতবা সহীহ নয়।

মহানবী ﷺ খুতবায় দাঁড়াবার সময় লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। *(আদাঃ ১০৯৬নং)* অবশ্য অনেকে বলেন, এ ছিল মেম্বর বানানোর পূর্বে। অল্লাহু আ'লাম।

মহানবী ﷺ-এর অধিকাংশ সময়ে মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। সুতরাং যারা পাগড়ী ব্যবহার করে না, তাদের বিশেষ ক'রে জুমআহ বা খুতবার জন্য পাগড়ী ব্যবহার করা বিদআত। *(আনাঃ ৬৭পৃঃ)*

জুমআর খুতবা হবে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। যাতে সকল নামাযীকে খতীব দেখতে পান এবং তাঁকে সকলে দেখতে পায়। এ ক্ষেত্রে ২ থাকি বা ৩ থাকি অথবা তার চেয়ে বেশী থাকির কোন প্রশ্ন নেই। আসল উদ্দেশ্য হল উঁচু জায়গা। অতঃপর সেই উঁচু জায়গায় পৌঁছনোর জন্য যতটা সিড়ির দরকার ততটা করা যাবে। এতে বাধ্যতামূলক কোন নীতি নেই। শুরুতে মহানবী ﷺ একটি খেজুর গাছের উপর খুতবা দিতেন। তারপর এক ছুতোর সাহাবী তাঁকে একটি মিম্বর বানিয়ে দিয়েছিলেন; যার সিড়ি ছিল ২টি। *(আদাঃ ১০৮১নং)* এই দুই সিড়ি চড়ে তৃতীয় (শেষ) ধাপে মহানবী ﷺ বসতেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মিম্বর ছিল তিন ধাপবিশিষ্ট। আর এটাই হল সুন্নত। *(ফবাঃ ২/৩৩১)* (এবং করতে হয় মনে করে) তার বেশী ধাপ করা বিদআত। *(আনাঃ ৬৭পৃঃ)*

বিশেষ করে জুমআর জন্য জুমআর দিন মিম্বরের উপর কার্পেট বিছানো বিদআত। *(আনাঃ ৬৬পৃঃ)*

মিম্বরে চড়ে মহানবী ﷺ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতেন। *(ইমাঃ ১১০৯, সিসঃ ২০৭৬নং)* এরপর বসে যেতেন। মুআযযিন আযান শেষ করলে উঠে দাঁড়াতেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তিনি খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ ক'রে লোকেদেরকে নসীহত করতেন। *(মুঃ, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

খুতবাহ হবে মহান আল্লাহর প্রশংসা, মহানবীর নবুঅতের সাক্ষ্য, আল্লাহর তাওহীদের গুরুত্ব, ঈমান ও ইসলামের শাখা-প্রশাখার আলোচনা, হালাল ও হারামের বিভিন্ন আহকাম, কুরআন মাজীদের কিছু সূরা বা আয়াত পাঠ, লোকেদের জন্য উপদেশ, আদেশ-নিষেধ বা ওয়ায-নসীহত এবং মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য দুআ সম্বলিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে খুতবায় তাশাহহুদ, শাহাদত বা আল্লাহর তাওহীদের ও রসূলের রিসালতের সাক্ষ্য থাকে না, তা কাটা হাতের মত (ঠুঁটো)।" *(আদাঃ ৪৮৪১, সজাঃ ৪৫২০নং)*

তাঁর খুতবার ভূমিকায় মহানবী ﷺ যা পাঠ করতেন তা নিম্নরূপ ঃ-

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (١) سورة النساء

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } (١٠٢) سورة آل عمران

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (٧١) سورة الأحزاب

এই খুতবা পাঠ করার পর তিনি 'আম্মা বা'দ' (অতঃপর) বলতেন।

কখনো কখনো মহানবী ঐ খুতবায় উল্লেখিত আয়াত ৩টি পাঠ করতেন না। কখনো কখনো আম্মা বা'দের পর বলতেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

অর্থাৎ, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহর গ্রন্থ। সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। আর সর্বনিকৃষ্ট কর্ম হল নবরচিত কর্ম। প্রত্যেক নবরচিত কর্মই বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা দোযখে। *(তামিঃ ৩৩৪-৩৩৫পৃঃ)*

তিনি খুতবায় সূরা ক্বাফ এত বেশী পাঠ করতেন যে, উম্মে হিশাম (রাঃ) প্রায় জুমআতে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপরে পাঠ করতে শুনে তা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। *(আঃ, মুঃ ৮৭২-৮৭৩নং, আদাঃ, নাঃ)*

তারপর একটি খুতবা দিয়ে একটু বসতেন।

এ বৈঠকে পঠনীয় কোন দুআ বা যিক্‌র নেই। খতীব বা মুক্তাদী সকলের জন্যই এ সময়ে সূরা ইখলাস পাঠ করা বিদআত। *(মুবিঃ ১২২পৃঃ)* মহানবী ﷺ বসে কোন কথা বলতেন না। অতঃপর উঠে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ ১০৯২, ১০৯৫নং)*

এই সময় (দুই খুতবার মাঝে) কারো দুআ করা এবং তার জন্য হাত তোলা বিধেয় নয়। *(আনাঃ ৭০পৃঃ)*

তাঁর উভয় খুতবাতেই নসীহত হত। সুতরাং একটি খুতবাতে কেবল ক্বিরাআত এবং অপর খুতবাতে কেবল নসীহত, অথবা একটি খুতবাতে নসীহত এবং অপরটিতে কেবল দুআ করা সঠিক নয়। *(আনাঃ ৭১পৃঃ)*

খুতবা হবে সংক্ষেপ অথচ ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক। মহানবী ﷺ-এর খুতবা এবং নামায মাঝামাঝি ধরনের হত। *(মুঃ ৮৬৬, আঃ ১১০১, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)* তিনি বলতেন, "(খতীব) মানুষের নামায লম্বা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া তার দ্বীনী জ্ঞান থাকার পরিচয়। সুতরাং তোমরা নামাযকে লম্বা এবং খুতবাকে সংক্ষেপ কর।" *(আঃ, মুঃ ৮৬৯নং)* হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে খুতবা ছোট করতে আদেশ দিয়েছেন।' *(আদাঃ ১১০৬নং)*

জুমআর খুতবার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া এবং উচ্চস্বরে প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা ব্যবহার করে পরিবেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি সামনে রেখে ভাষণ দান করা খতীবের কর্তব্য। মহানবী ﷺ যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত; যেন তিনি লোকেদেরকে এমন এক সেনাবাহিনী সম্পর্কে

সতর্ক করছেন, যা আজই সন্ধ্যা অথবা সকালে তাদেরকে এসে আক্রমণ করবে। *(মুঃ, ইমাঃ)*

গান গাওয়ার মত সুর করে খুতবা দেওয়া বিধেয় নয়, বরং তা বিদআত। *(আনাঃ ৭২পৃঃ)*

খতীবের উচিত, খুতবায় দুর্বল ও জাল হাদীস ব্যবহার না করা। প্রত্যেক খুতবা প্রস্তুত করার সময় ছাঁকা ও গবেষণালব্ধ কথা বেছে নেওয়া উচিত।

জুমআহ বাসরীয় খুতবার মধ্যে খতীব মুসলিম জনসাধারণকে সহীহ আকীদাহ শিক্ষা দেবেন, কুসংস্কার নির্মূল করবেন, বিদআত অনুপ্রবেশ করার ব্যাপারে ও তা বর্জন করতে আহবান জানাবেন। সচ্চরিত্রতা ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেবেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন ঘটাবেন। মার্জিত ভাষায় ও ভঙ্গিমায় বাতিল মতবাদ ও বক্তৃতা-লেখনীর খন্ডন করবেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ও ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে তার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলবেন ভাষণের মাধ্যমে। উদ্বুদ্ধ করবেন মযহাব, ভাষা, বর্ণ ও বংশ ভিত্তিক সকল প্রকার অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও তরফদারী বর্জন করতে।

মিম্বর মুসলিম জনসাধারণের। এ মিম্বরকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কোন দলেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তরফদারী করা যাবে না এতে চড়ে। খতীব সাহেব সাধারণভাবে সকলকে নসীহত করবেন। তিনি হবেন সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। অবশ্য ইসলাম-বিরোধী কোন কথা বা কাজে তিনি কারো তোষামদ করবেন না।

বলা বাহুল্য, মসজিদ আল্লাহর ঘর। এটা কোন মানবরচিত রাজনীতির আখড়া নয়। এখানে দ্বীন উঁচু করার কথা ছাড়া অন্য দল বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা আলোচিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَداً﴾

অর্থাৎ, আর অবশ্যই মসজিদসমূহ আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে আহবান করো না। *(কুঃ ৭২/ ১৮)*

খুতবাদানে বিভিন্ন উপলক্ষ্য সামনে রাখবেন খতীব। মৌসম অনুপাতে খুতবার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করবেন। বারো চাঁদের খুতবার মত বাঁধা-ধরা খুতবা পাঠ করেই দায় সারা করে কর্তব্য পালন করবেন না।

সপ্তাহান্তে একবার এই বক্তৃতা একটি সুবর্ণ সুযোগ দ্বীনের আহবায়কের জন্য। যেহেতু এই দিনে নামাযী-বেনামাযী, আমীর-গরীব, মুমিন-মুনাফিক এবং অনেক সময় মুসলিম নামধারী নাস্তিকও কোন স্বার্থের খাতিরে উপস্থিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকলের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেওয়া খতীবের কর্তব্য।

খুতবায় হাত তুলে দুআ বিধেয় নয়। *(আনাঃ ৭২পৃঃ)* বরং এই সময় কেবল তর্জনীর ইশারায় দুআ করা বিধেয়। খতীবকে হাত তুলে দুআ করতে দেখে বহু সলফ বদ্দুআ করতেন।

বিশ্র বিন মারওয়ানকে খুতবায় হাত তুলে দুআ করতে দেখে উমারাহ বিন রুয়াইবাহ বললেন, 'ঐ হাত দুটিকে আল্লাহ বিকৃত করুন।' *(মুঃ ৮৭৪, আদাঃ ১১০৪নং)*

মাসরুক বলেন, '(জুমআর দিন ইমাম-মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দুআ করে) আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিন।' *(ইআশাঃ ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩ নং)*

বিধেয় নয় মুক্তাদীদের হাত তুলে দুআ। *(আনাঃ ৭৩পৃঃ)* বরং ইমাম খুতবায় (হাত না তুলে) দুআ করলে, মুক্তাদী হাত না তুলেই একাকী নিম্নস্বরে বা চুপে-চুপে 'আমীন' বলবে। *(ফইঃ*

১/৪২৭, ৪২৮)

হ্যাঁ, খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনা বা বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য দুআ করার সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলে হাত তুলে ইমাম দুআ করবেন এবং মুক্তাদীরা 'আমীন-আমীন' বলবে। *(বুঃ ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুঃ ৮৯৭নং)*

কোন জরুরী কারণে খুতবা ত্যাগ করে প্রয়োজন সেরে পুনরায় খুতবা পূর্ণ করা খতীবের জন্য বৈধ। একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন ؓ পড়ে-উঠে তাঁর সামনে আসতে লাগলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ)

(অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাই তো।) আমি এদেরকে পড়ে-উঠে চলে আসতে দেখে ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বরং খুতবা বন্ধ করে এদেরকে তুলে নিলাম।" *(আঃ, সুআঃ)*

হযরত আবূ রিফাআহ আদাবী ؓ বলেন, একদা আমি মসজিদে এসে দেখলাম নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! একজন অপরিচিত বিদেশী মানুষ; যার দ্বীন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। এক্ষণে সে জ্ঞান লাভ করতে চায়।' তিনি খুতবা ছেড়ে দিয়ে আমার প্রতি অভিমুখ করলেন। এমনকি তিনি আমার নিকট এসে একটি কাঠের চেয়ার আনতে বললেন যার পায়া ছিল লোহার। তিনি তারই উপর বসে আমাকে দ্বীনের কথা বললেন। অতঃপর মিম্বরে এসে খুতবা পূর্ণ করলেন। *(মুঃ ৮৭৬নং, নাঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, জরুরী মনে করে নিয়মিতভাবে إن الله وملائكته... এবং اذكروا الله يذكركم... পাঠ ক'রে খুতবা শেষ করা বিদআত। *(আনাঃ ৭৩পৃঃ)*

তাওহীদ ও তার কলেমার মাহাত্ম্য

{أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابتٌ وَفَرْعُهَا في السَّمَاء (٢٤) تُؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حين بإِذْن رَبِّهَا وَيَضْربُ اللهُ الأَمْثَالَ للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلمَة خَبيثَة كَشَجَرَة خَبيثَة اجْتُثَّتْ منْ فَوْق الأَرْض مَا لَهَا منْ قَرَار (٢٦) يُثَبِّتُ اللهُ الَّذينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثَّابت في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفي الآخرَة وَيُضلُّ اللهُ الظَّالمينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ} (٢٧)

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে কুবাক্যের উপমা এক মন্দ বৃক্ষ; যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা ইব্রাহীম ২৪-২৭ আয়াত)*

বারা ইবনে আযেব ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়,

তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। এই অর্থ রয়েছে আল্লাহ তাআলার ঐ বাণীতে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহান আল্লাহ নিজে এই তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানিগণ। তিনি বলেন,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١٨)

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮)*

তিনি মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে এই তাওহীদের আদেশ দিয়ে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসূল প্রেরণ করিনি। *(সূরা আম্বিয়া ২৫ আয়াত)*

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦) سورة النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

মানব জাতিকে তাওহীদ ও একত্ববাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুকে শরীক করো না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

এ তাওহীদ হল মানুষের শক্ত হাতল; যা ভাঙ্গার নয়। তিনি বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত)*

এই তাওহীদ ও তার কলেমার রয়েছে বিরাট মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব।

মহানবী ট বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।" *(মুসলিম)*

উসামা ইবনে যায়দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি

বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।' তিনি বললেন, "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?" অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তির খবর তিনি অবহিত হলে উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, "তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে। এ দেখে আমি তার উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি তাকে হত্যা করে দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে তখন তুমি কি করবে?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কি করবে?" (তিনি বারংবার একথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না। *(মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মালেক ইবনে দুখ্শুম কোথায়!" একটি লোক বলে উঠল, 'সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' নবী ﷺ বললেন, "ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ও লোকেদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (সভা থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। (সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি যাও! অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।" *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কলেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। *(তিরমিযী)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একদা নূহ ﷺ তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করে বললেন, ---আমি

তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।---" *(আহমাদ২/ ১৭০, ত্বাবরানী, বায্যার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২ ১*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।" *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমল-নামা) রেজিষ্টার বিছিয়ে দেবেন; প্রত্যেকটি রেজিষ্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি লিখিত পাপের কোন কিছু অস্বীকার কর? আমার আমল সংরক্ষক ফিরিশ্তা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে?' লোকটি বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোন পেশ করার মত ওযর আছে অথবা তোমার কি কোন নেকী আছে?' লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আর আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।' অতঃপর একটি কার্ড বের করা হবে, যাতে লিখা থাকবে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরসূলুহ।' আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে আদেশ করবেন। লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! এতগুলি বড় বড় রেজিষ্টারের কাছে এই কার্ডটির ওজন আর কি হবে?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।' অতঃপর রেজিষ্টারগুলোকে দাঁড়ির এক পাল্লায় এবং ঐ কার্ডটিকে অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে। দেখা যাবে, রেজিষ্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কার্ডটির ওজন ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়।" *(আহমাদ২/২ ১৩, তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ ৪৩০০নং, হাকেম ১/৪৬)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না ক'রে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব। *(তিরমিযী, হাসান)*

মুআয ইবনে জাবাল رضي الله عنه বলেন, আমি গাধার উপর নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না তিনি তাকে আযাব দেবেন না।" অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে

(এ) সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, "তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

কিয়ামতের মাঠে কঠিন ভয়াবহতার শিকার হবে মানুষ। সেখানে মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ ক'রে পরিত্রাণের উপায় খুঁজবে মানুষ। সেই সুপারিশের অধিক সৌভাগ্য লাভকারী হবে সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। *(বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠ অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

যতদিন তাওহীদের কালেমা আছে, ততদিন পৃথিবী আছে। মহানবী ট বলেন, ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন পৃথিবীতে একটি লোক অবশিষ্ট থাকবে, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩০ ১৬নং)*

এই সেই তাওহীদ, যার প্রতিষ্ঠাকল্পে মহান আল্লাহ বিশ্ব রচনা করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

সুতরাং বান্দার প্রথম ফরয হল তাওহীদের জ্ঞান শিক্ষা করা। আর যখন সে তাওহীদের জ্ঞানলাভ করবে, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট সাহায্য চাইবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদে আহবান করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা রাখবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো বা কিছুর ওপর ভরসা রাখবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কুরবানী করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে মানত মানবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো বা কিছুর সামনে মাথা নত করবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান মানবে না। ইত্যাদি।

জেনে রাখা ভাল যে, তাওহীদ তিন প্রকার ঃ (ক) তওহীদুর রব্ব্ (প্রতিপালক বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল এই কথার স্বীকার যে, আল্লাহই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অবশ্য একথা কাফেরদলও স্বীকার করেছে; কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবিষ্ট করেনি।

(খ) তওহীদুল ইলাহ (উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল সকল প্রকার বিধিবদ্ধ ইবাদত - যেমন, দুআ ও প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা, তওয়াফ, যবেহ, নযর ইত্যাদিতে আল্লাহকে একক মান্য করা। এই প্রকার তওহীদকেই কাফের দল অস্বীকার করেছিল, এবং এই তওহীদ নিয়েই নূহ عليه السلام থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ছিল।

(গ) তওহীদুল আসমা-ই অস্‌সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে একত্ববাদ); আর তা হল, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত সিফাত বা গুণাবলী, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না করে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না করে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না ক'রে ঈমান ও প্রত্যয় রাখা।

সুতরাং তওহীদ হল এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ নিজ সার্বভৌমত্বে ও কর্মাবলীতে একক; তাতে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে একক; তাঁর কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত নেই। তিনি নিজ মা'বূদত্বে ও উপাস্যত্বে একক; তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

আবারো জেনে রাখা দরকার যে, তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর জন্যই আমাদের শেষনবী ট-কে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ এই তাওহীদের জন্যই কত কষ্ট বরণ করেছেন। তাঁদের দাওয়াতেও প্রথম সেই তাওহীদই ছিল। যেহেতু এ তাওহীদ না থাকলে অন্য তাওহীদ কাজে দেবে না এবং কোন আমল ও ইবাদতও ফলপ্রসূ হবে না।

মুআয ইবনে জাবাল বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠালেন ও বললেন, নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি (যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত থাকবে এবং মযলূম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুআ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদবাদী মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শির্ক অতি মহাপাপ

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }

অর্থাৎ,(স্মরণ কর) যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন অংশী করো না। আল্লাহর অংশী করা তো চরম অন্যায়।' *(সূরা লুক্বমান ১৩ আয়াত)*

মহানবী বলেন, "একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর---অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।" *(বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

নবী ﷺ বলেছেন, "কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, (অন্যায় ভাবে) কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী)*

শির্ক সবচেয়ে বড় পাপ ও মহা অন্যায়। কিয়ামতের দিন অন্য পাপ মাফ হতে পারে, কিন্তু

শির্কের পাপ মাফ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)*

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(ঐ ১১৬ আয়াত)*

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, সে সুস্থ প্রকৃতি ও আন্তরিক পবিত্রতার দিক দিয়ে পবিত্রতা ও নির্মলতার এক উচ্চাসনে আসীন থাকে। কিন্তু যখনই সে শির্কের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে নিজেকে উঁচু হতে একদম নীচে, পবিত্রতা হতে অপবিত্রতায় এবং নির্মলতা হতে কর্দম ও পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ }

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহর শরীক করে (তার অবস্থা) সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। *(সূরা হাজ্জ ৩১ আয়াত)*

যেই হোক, যত বড় ওলীই হোক আর যত বড় নবীই হোক, শির্ক করলে সমস্ত আমল পণ্ড। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (٨٨)

অর্থাৎ, এ আল্লাহর পথ নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত। *(আনআম ৮৮)*

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

অর্থাৎ, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। *(সূরা যুমার ৬৫ আয়াত)*

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا } (٢٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব। *(সূরা ফুরক্বান ২৩ আয়াত)*

মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ }

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মাইদাহ ৭২ আয়াত)*

জাবের ؓ বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্মদু'টি কি কি?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি

আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না করে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

মুশরিক আল্লাহর খায়, আর গায়রুল্লাহর ইবাদত করে। গায়রুল্লাহকে বিপদে আহবান করে, তাকে সিজদা করে, তার নামে নযর মানে, কুরবানী করে। একজনের খায়, অপরজনের গুণ গায়! যেমন এক ভ্রষ্ট মহিলা পতির খায়, কিন্তু উপপতির গুণ গায়! এই খিয়ানতে মিল থাকার কারণে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٣) سورة النور

অর্থাৎ, ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য তা অবৈধ। *(সূরা নূর ৩ আয়াত)*

শির্ক আল্লাহর শানে অপবাদ ও অপমান। শির্ক মানবতার অপমান। শির্ক কুসংস্কার ও অমূলক বিশ্বাসের বাসা। শির্ক ভয় ও অমূলক ধারণা এবং সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। মহান আল্লাহ বলেন,

{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ} (١٥١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! *(সূরা আলে ইমরান ১৫১ আয়াত)*

শির্ক ফলপ্রসূ আমল (কর্ম) ব্যাহত করে। যেহেতু শির্ক তার অনুসারীদেরকে মাধ্যম ও সুপারিশকারীদের উপর ভরসা ও নির্ভর করতে শিক্ষা দেয়। ফলে তারা সৎকর্ম ত্যাগ করে বসে এবং পাপকর্মে আলিপ্ত থাকে, আর বিশ্বাস এই রাখে যে, ওরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! শির্ক দুই প্রকারের; শির্কে আকবার ও শির্কে আসগার।

শির্কে আকবারের ভয়াবহতার কথাই আগে বলা হল। আর তা হল আল্লাহর কোন প্রকার ইবাদত গায়রুল্লাহকে নিবেদন করা। মানুষ এই শির্ক মূর্তিপূজার মাধ্যমে ক'রে থাকে। মাজার ও পীর-পূজার মাধ্যমে ক'রে থাকে। পূজিতরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে অথবা তাঁর নৈকট্য দান করবে বলে তাদের পূজার মাধ্যমে শির্ক ক'রে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١٨) سورة يونس

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।' *(সূরা ইউনুস ১৮ আয়াত)*

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}

অর্থাৎ, জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী। *(সূরা যুমার ৩ আয়াত)*

দুআ ও ফরিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর শরীক ক'রে থাকে। তারা অনুপস্থিত ও মৃত মানুষকে এমন সাহায্যের জন্য আহবান ক'রে থাকে, যে সাহায্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো করার ক্ষমতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ}

অর্থাৎ, আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)*

{وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ، إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}

অর্থাৎ, তোমরা তাদের আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ, তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। *(সূরা ফাত্বির ১৪ আয়াত)*

এইভাবে আনুগত্যের শির্ক আছে, আশ্রয় প্রার্থনার শির্ক আছে, সাহায্য প্রার্থনার শির্ক আছে, আশা ও বাসনার শির্ক আছে, রুকূ, সিজদাহ ও কিয়ামের শির্ক আছে, তাওয়াফের শির্ক আছে, কুরবানী ও যবেহর শির্ক আছে, মানতের শির্ক আছে, ভালোবাসার শির্ক আছে, ভয়ের শির্ক আছে, ভরসার শির্ক আছে, মাধ্যম বা অসীলা মানা বা উকীল ধরার শির্ক আছে, সুপারিশের শির্ক আছে, কবর পূজার শির্ক আছে, তাবার্রুকের শির্ক আছে ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয় শির্ক হল শির্কে আসগার। আর তা হল লোখ-দেখানি যাবতীয় আমল। এ কাজ ভাল লোক দ্বারা হয় এবং তাতেও আমল বরবাদ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি। (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।)" *(মুসলিম)*

আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

আল্লাহর ওপর ভরসা

বিপদে-আপদে, বালা-মসীবতে, দুশমনের দুশমনির ক্ষেত্রে অথবা যে কোন প্রয়োজনে নির্ভরস্থল একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, পালনকর্তা, ভাগ্যবিধাতা। অতএব তিনিই আমাদের একক মাবূদ এবং একক ভরসাস্থল। তাঁরই উপর ভরসা রাখা উচিত প্রত্যেক মুসলিমের এবং বিশেষ ক'রে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের। যেহেতু ঈমান ও ইসলামের একটি শর্ত এই যে, মঙ্গল আনয়নে এবং অমঙ্গল দূরীকরণে মু'মিন ও মুসলিম কেবল তাঁরই উপর ভরসা রাখবে। মহান আল্লাহ এক মু'মিন ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

{وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٢٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি মু'মিন হও, তাহলে আল্লাহরই উপর ভরসা কর। *(সূরা মাইদাহ ২৩ আয়াত)*

মূসা ﷺ নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

{يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} (٨٤) سورة يونس

অর্থাৎ, (মূসা বলেছিল,) হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাক, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। *(সূরা ইউনুস ৮৪ আয়াত)*

মু'মিনের গুণই হল, আল্লাহর ওপর ভরসা করা। তিনি বলেন,

{إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, আর মুমিনদের উচিত, আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মু'মিনের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

অর্থাৎ, মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণকালে কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। *(সূরা আনফাল ২ আয়াত)*

মু'মিনের আল্লাহ ছাড়া আছে কে? আল্লাহই তার উকীল, আল্লাহই তার কর্মবিধায়ক, আল্লাহই তার সুখ-দুঃখের সাথী। তাঁর ওপর ছাড়া আর কার ওপর ভরসা রাখা যাবে? তাঁর ওপর ছাড়া আর কার ওপর নির্ভর করা যাবে? মু'মিন আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখবেই বা কেন? তিনি ছাড়া আর কেউ আছে কি, যে বালা-মসীবত দূর করতে পারে? বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? রুযী দিতে পারে? দুশমন থেকে বাঁচাতে পারে?

আকাশ থেকে কে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে? কে ফলাতে পারে সোনার ফসল? কে দিতে পারে সুখ-সম্মান-সমৃদ্ধি ও সন্তান? মহান আল্লাহ বলেন, তিনিই।

তিনি বলেন,

{قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ}

অর্থাৎ, বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি

অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক। *(সূরা যুমার ৩৮ আয়াত)*

{قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা।' *(সূরা তাওবাহ ৫১ আয়াত)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন,

{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি কোন কাজের সঙ্কল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন। তার বিপদ বা বালা দূর ক'রে দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয় আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)*

আল্লাহর উপর ভরসার ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীর;

(১) কেবল আল্লাহর উপর ভরসাকারী। এরা তদবীর না করেই ভরসা করে। দৈহিক পরিশ্রম করে না এবং মনে কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে না।

(২) কেবলমাত্র তদবীর বা ব্যবস্থাবলম্বনের উপর ভরসা রাখে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখে না।

(৩) আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং সেই সাথে তদবীরও করে। এই শ্রেণীর মানুষ হল প্রকৃত মুমিন।

বুঝা গেল, তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তদবীরের প্রয়োজন আছে। (অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বিনা তদবীরেও বান্দাকে বহু কিছু দান করতে পারেন।) মুমিনের আসল ভরসা আল্লাহর উপর থাকে এবং ব্যবস্থাবলম্বন একটা হেতুমাত্র, যা পরিহার্য নয়। আল্লাহর নবী ﷺ-এর মত আল্লাহর উপর কে যথাযথ ভরসা ও তাওয়াক্কুল রাখতে পারে? অথচ তিনি সফরে সম্বল সাথে নিতেন। যুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও করতেন।

এক ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করার ধরন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে বলল, 'আমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর নির্ভর করব, নাকি উট ছেড়ে দিয়ে?' উত্তরে মহানবী ট বললেন, "বরং তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি উপকরণ বিনাও সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম হল, উপকরণ ও কারণ দ্বারাই কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। তিনি যে সকল উপকরণ ও কারণ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কিছু আছে বৈধ, কিছু অবৈধ। মানুষ অবৈধ উপকরণ ও কারণ ব্যবহার করতে পারে না।

পক্ষান্তরে বৈধ উপকরণ ও কারণ ব্যবহার বৈধ। আর তা হল দুই প্রকার; কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মুমিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না। অবশ্য যাদু, ঐন্দ্রজালিক, শিকী ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু তা ব্যবহার করা অবৈধ।

বলা বাহুল্য, রোগ-মসীবতে পড়ে আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে বসে থাকা মুমিনের উচিত নয়। অধৈর্য হলে অবৈধ উপকরণ বা চিকিৎসা ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ হল বৈধ উপকরণ ও চিকিৎসা ব্যবহার। যেহেতু শরয়ী চিকিৎসা মহানবী ট নিজে ব্যবহার করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন রোগের সঠিক ওষুধ নিরূপিত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে সে রোগটি সেরে উঠে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা করো না। আল্লাহ হারামকৃত বস্তুর ভিতরে আরোগ্য রাখেন নি।" সুতরাং যথার্থ চিকিৎসায় দোষ নেই। দোষ হল অবৈধ চিকিৎসায়।

উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখুন, আর সেই সাথে তদবীরও করে যান। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে।" *(আহমাদ)*

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পাখী বাসাতে বসে থেকে রুযী পাবে, তা নয়। বরং তাকে বাসা হতে বের হয়ে যেতে হবে। আর তবেই সে সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরবে। বলা বাহুল্য, উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে বান্দাকে।

মহান আল্লাহ বলেন, "নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।" *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার তওফীক দিন। আর জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, চাকুরি, তাবীয-মাদুলি, লোহা, পিতল, কালি হাঁড়ি, মুড়ো ঝাঁটা ইত্যাদির ওপর ভরসা রাখা থেকে দূরে রাখুক। আমীন।

তাগূত হতে সাবধান

উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ!

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তাঁর প্রতি ঈমান রাখতে বলেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্য সকলকে অস্বীকার করতে আদেশ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, তাগূতকে অস্বীকার না ক'রে

আল্লাহর প্রতি ঈমান কোন কাজে দেবে না। তিনি বলেছেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦) سورة النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(বাক্বারাহ ২৫৬)*

তাগূতকে অস্বীকার করার মানে এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা যাবে না, অন্যকে আল্লাহর মত মান্য করা যাবে না, বরং তাগূতকে অমান্য ও ঘৃণা করতে হবে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার মানে এই বিশ্বাস যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ, তিনি ছাড়া আর কেউ সত্য মা'বূদ নেই। অতঃপর সকল প্রকার ইবাদত কেবল তাঁরই জন্য নিবেদন করা এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। তওহীদবাদীদেরকে ভালবাসা এবং অংশীবাদীদেরকে ঘৃণা করা।

আর এটাই হল ইব্রাহীমী মিল্লত ও মতাদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (٤) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' *(মুমতাহিনাহ ৪)*

যে এই মিল্লত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে নির্বোধ মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ} (١٣٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে? *(সূরা বাক্বারাহ ১৩০ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, আর তাগূত হল কাফেরদের অভিভাবক।

{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে (মু'মিন)। তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *(ঐ ২৫৭ আয়াত)*

যারা আল্লাহকে একক উপাস্য মেনে নিয়ে তাগূতকে মান্য করা হতে দূরে থাকে, তাদের জন্য

রয়েছে সুসংবাদ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ }

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে......। *(যুমার ১৭)*

প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই তাগূত বলা হয়।

এ দুনিয়ায় তাগূত বহু আছে। অবশ্য তাদের প্রধান হল পাঁচটি ঃ-

(১) শয়তান।

অধিকাংশ মানুষ শয়তান তাগূতের পূজা ক'রে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ তার পূজা ও অনুসরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন; তিনি বলেছেন,

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ } (٦١) سورة يــس

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই দাসত্ব কর। এটিই সরল পথ। *(সূরা ইয়াসীন ৬০-৬১ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৮)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ } (٢١) سورة النــور

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। *(সূরা নূর ২১ আয়াত)*

(২) আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী অত্যাচারী শাসক। যে ইসলামী আইনে বিকৃতি সাধন করে, আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানুষের মনগড়া আইন প্রবর্তন করে। যে কুফরী, শির্ক, বিদআত ও মদ-ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপকে আইনতঃ বৈধতার স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয়! মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا }

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। *(সূরা নিসা ৬০ আয়াত)*

(৩) আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচারকর্তা শাসক।

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

(৪) আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবীদার।

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ }

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' *(সূরা নামল ৬৫ আয়াত)*

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ } (٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।

মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জাহিলাতের সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, 'তুমি তাদের কাছে যেও না।' আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, 'এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কাজে) বাধা না দেয়।' আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, '(প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।' *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোন (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।" *(মুসলিম ২২৩০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে, তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।" *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৯৩৯নং)*

(৫) আল্লাহর পরিবর্তে (নযর-নিয়ায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা) যার পূজা করা ও যাকে (বিপদে) আহবান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে।

{وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ }

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত' তাকে আমি শাস্তি দিব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। *(সূরা আম্বিয়া ২৯ আয়াত)*

❁❁❁❁❁❁❁❁

বিদআত হতে সাবধান

উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ!

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর ইবাদত কোথায়, কোন্ সময়, কোন্ নিয়মে, কি পরিমাণে করব তা মানুষের জানা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি দুনিয়ার বুকে নবী পাঠিয়েছেন। নবী এসেছেন আল্লাহকে চিনাবার জন্য, তাঁর ইবাদত করার আদেশ সহ তার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

এ জন্যই প্রত্যেক ইবাদত কবুল হয় দু'টি শর্তের ভিত্তিতে; ইখলাস বা আন্তরিকতা এবং তরীকায়ে মুহাম্মাদী। বলা বাহুল্য, যে ইবাদতে ইখলাস নেই, তা শির্ক হয়। আর যে ইবাদতে মুহাম্মাদী তরীকা নেই, তা বিদআত হয়।

উক্ত শর্ত দু'টির ভিত্তিতেই আমল সালেহ, হাসান বা নেক হয়। আর মহান আল্লাহ আমাদেরকে শুধু আমলই নয়; বরং নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢)

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সবচেয়ে ভাল? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(সূরা মুলক ২ আয়াত)*

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ মুসলিম আমল তো করে অনেক বেশী। কিন্তু তা নেক আমল নয়। যেহেতু তা উক্ত শর্ত দু'টির অনুসারী হয় না। বরং তারা নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি অথবা কোন বুযুর্গের পদ্ধতি অনুযায়ী তা সম্পাদন ক'রে থাকে। ফলে তাদের অবস্থা তাই হয়, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (١٠٤)

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে ক'রে যে, তারা সৎকর্ম করছে। *(সূরা কাহফ ১০৩-১০৪ আয়াত)*

কিয়ামতে তাদের হাল সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً} (٤) سورة الغاشية

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমন্ডল হবে ভীত-সন্ত্রস্ত; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে। *(সূরা গাশিয়াহ ২-৪ আয়াত)*

এমনই অবস্থা হবে বিদআতীদের। যেহেতু তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-র অর্থ না বুঝে আমল করে। বরং অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক আমল নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি অনুযায়ী করে। আর তার ফলে তা 'ইবাদত' হয় না, বরং বিদআত হয়।

বিদআতের আভিধানিক অর্থ; বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উদ্ভাবন করা বা আবিষ্কার করা।

শরয়ী পরিভাষায় এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ--যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তাঁর কোন সাহাবী বলেননি বা করেননি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বীনে বা কুরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই, নতুনভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে---যা আসল শরীয়তের সমতুল মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন ক'রে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি স্বরূপ করার উদ্দেশ্যে হয়---তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই আমল (ইবাদত মনে ক'রে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে বা

শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা, যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত শরীয়তে নেই তাকে বিদআত বলে। *(হুজাজ ক্বাবিয়্যাহ)*

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! জেনে রাখা উচিত যে, ইবাদত মূলতঃ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, তার সহীহ দলীল না থাকলে তা করা যাবে না। সহীহ দলীলে কোন কাজ ইবাদত বলে প্রমাণ হলে, তবেই তা করা যাবে; নচেৎ না।

বিদআত ইসলামে জঘন্য ও নিকৃষ্ট আমল বলে পরিগণিত। শরীয়ত এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক ক'রেছে,

ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (মুসলিম রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

জাবের ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ ধারণ করত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলতেন, (সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে। আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টিকে মিলিত ক'রে বলতেন যে, "আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দুটির মত (কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।" আর তিনি বলতেন, "আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করার) পর, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা। ...." *(মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই---তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।"

বলা বাহুল্য, দ্বীনের ব্যাপারে কোন নতুন আবিষ্কার বিদআত, দুনিয়ার ব্যাপারে নব আবিষ্কার বিদআত নয়। আর কোন কাজ ভাল হলেও, তার নির্দেশ শরীয়তে না থাকলে তাও বিদআত। তা 'বিদআতে হাসানাহ' বলা যায় না। যেহেতু বিদআতের এই শ্রেণীর কোন ভাগ নেই। কারণ মহানবী ট বলেছেন, "কুল্লু বিদআতিন যালালাহ" (অর্থাৎ, প্রত্যেক অথবা সর্বপ্রকার বিদআতই ভ্রষ্টতা)।

বিদআতীর নিন্দা করা হয়েছে সুন্নাহতে। হওয কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের) দিন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উট

বিতাড়িত করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, 'ওরা আমার দলের। (বা ওরা তো আমার উম্মত)।' বলা হবে। তিনি বলবেন, 'আপনি জানেন না, আপনার তিরোধানের পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।' তখন নবী ﷺ তাদেরকে বলবেনঃ "দূর হও, দূর হও।" *(মুসলিম)*

রসূল ট বলেছেন, "যে ব্যক্তি (দ্বীনে) অভিনব কিছু রচনা করে অথবা কোন নতুনত্ব উদ্ভব রচয়িতাকে স্থান দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট হতে নফল ইবাদত (অথবা তওবা) এবং কোন ফরয ইবাদত (অথবা ক্ষতিপূরণ করবেন না।)" *(বুখারী-মুসলিম)*

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০নং)*

পাপকে পাপ মনে ক'রে তওবা করার তওফীক লাভ হয়। কিন্তু বিদআতকে দ্বীন মনে ক'রেই পালন করে বিদআতী। সুতরাং তা থেকে তওবা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না তার মনে। সে জন্যই শয়তানের নিকট পাপ অপেক্ষা বিদআত অধিক পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে বিদআতী যদি হক জেনে বিদআত ছেড়ে বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে, তাহলে অবশ্যই তওবার দরজা খোলা আছে। আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (١٠٦)

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ থেকে আহলে-সুন্নাত এবং আহলে-বিদআতকে বুঝিয়েছেন। *(ইবনে কাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)* (অর্থাৎ, কিয়ামতে সুন্নাহর অনুসারীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতীদের চেহারা কালো হবে।) আর এ থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ইসলাম হল ওটাই, যার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আহলে-সুন্নাত। আহলে-বিদআত এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। অথচ এটাই হল মুক্তির একমাত্র পথ।

(১) প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস; যদিও বা তা ইজতিহাদী হয়; যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয়, তা বিদআত।

(২) প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।

(৩) প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিধেয় হওয়া সম্ভব নয় অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই, তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহাবী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে, তা বিদআত বলা যাবে না।

(৪) কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা; যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদতরূপে (বা করতে হয় ভেবে) পালন করা হয়, তা বিদআত।

(৫) যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকীহ বা আলেম -বিশেষ করে পরবর্তীকালের উলামাগণ বিবৃতি পেশ করেছেন অথচ তার সপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়ও বিদআত।

(৬) প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা মওযু' (গড়া বা জাল)

হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি, তা করা বিদআত।

(৭) ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করাই) বিদআত।

(৮) প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে; কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। *(আহকামুল জানায়েয, আলবানী)*

(৯) প্রত্যেক সেই আচার, কুপ্রথা বা কুসংস্কার; যা শরীয়ত-সম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান-সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। *(মানাসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫ পৃঃ)*

ব্রাদারানে ইসলাম! বিদআত থেকে বাঁচব কিভাবে? বেশী বেশী সুন্নাহ জেনে, সর্বকাজে সুন্নাতের উপর আমল ক'রে, তার মূল কারণ ধ্বংস ক'রে, তার বিরুদ্ধে মুখ ও কলম দ্বারা জিহাদ ক'রে, হাতুরে ডাক্তারের মত হাতুরে আলেমদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা না ক'রে, অন্ধভাবে বুযুর্গদের কথায় আমল (ব্যক্তিপূজা) না ক'রে, যয়ীফ ও জাল হাদীস ব্যবহার না ক'রে, বিজাতির অনুকরণ না ক'রে, দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানকে প্রাধান্য না দিয়ে আমরা বিদআত রুখতে পারি। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

আল্লাহর তাক্বওয়া

তাক্বওয়া মানে পরহেযগারী, সংযমশীলতা, সাবধান হওয়া, ভয় করা, বেঁচে চলা ইত্যাদি। পরিভাষায় যথাসাধ্য আদেশ ও বিধেয় কর্ম পালন ক'রে এবং সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কর্ম থেকে এমনকি কিছু বৈধ কর্ম থেকেও দূরে থেকে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেওয়াকে তাক্বওয়া বলা হয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়ার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

অর্থাৎ, হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

যাঁরা মুত্তাকী, তাঁরা আল্লাহর ওলী। যাঁর তাক্বওয়া যত বেশী, তিনি তত বড় আল্লাহর ওলী। তাঁদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তাও নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ}

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন ক'রে থাকে। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৩ আয়াত)*

যে যত বড় পরহেযগার, সে আল্লাহর নিকট তত বড় মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তাক্বওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (١٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ পরহেযগার মানুষদের সাথী। তিনি বলেন,

{وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (١٩٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথী। *(ঐ ১৯৪ আয়াত)*

{إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (١٢٨) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। *(সূরা নাহল ১২৮ আয়াত)*

পরহেযগার মানুষদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী। মহাভয়ঙ্কর দিনেও তাঁদের বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (٦٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে মুত্তাক্বীরা নয়। *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)*

সংযমশীল মানুষ সফলকাম হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য। *(সূরা নূর ৫২ আয়াত)*

{لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (١٧٢) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। *(সূরা আলে ইমরান ১৭২ আয়াত)*

আর সেই সফলতা ও মহাপুরস্কার হল আল্লাহর বেহেশ্ত। তিনি বলেন,

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ}

অর্থাৎ,ঐশীগ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত ও সংযমী হত, তাহলে আমি তাদের দোষ অপনোদন করতাম এবং তাদেরকে সুখদায়ক উদ্যানে প্রবেশাধিকার দান করতাম। *(সূরা মাইদাহ ৬৫ আয়াত)*

{قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ} (١٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, আমি কি তোমাদেরকে এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫ আয়াত)*

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ} (١٩٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম। *(ঐ ১৯৮ আয়াত)*

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ} (٢٠) سورة الزمر

অর্থাৎ, তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। *(সূরা যুমার ২০ আয়াত)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" *(তিরমিযী)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর তাক্বওয়া রাখে, আল্লাহ তাকে সুস্থ বিবেক দান করেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٢٩) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

পরহেযগার লোকেরা শত বিপদে রক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আযাব ও গযব থেকে বাঁচিয়ে নেন। তিনি বলেন,

{وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} (٥٣) سورة النمل

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, তাদেরকে আমি (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি। *(সূরা নামল ৫৩ আয়াত)*

যারা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সব কাজ সহজ ক'রে দেন, সমস্ত

সমস্যার সমাধান দান করেন, বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় ক'রে দেন, তাদেরকে ধারণাতীত উৎস থেকে রুযী দান করেন এবং তাদের গোনাহ-খাত্বা মাফ ক'রে প্রচুর সওয়াব দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (٣) سورة الطلاق

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ ক'রে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩)*

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (٤) سورة الطلاق

অর্থাৎ, আল্লাহকে যে ভয় করবে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ ক'রে দেবেন। *(ঐ ৪ আয়াত)*

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } (٥) سورة الطلاق

অর্থাৎ, আল্লাহকে যে ভয় করবে তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার। *(ঐ ৫ আয়াত)*

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } (٩٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, আকাশে রয়েছে আমাদের রুযীর উৎস; সূর্য ও মেঘমালা। বৃষ্টি হয়, ফসল ফলে। এ ছাড়া পৃথিবীতে গুপ্ত রয়েছে কত গুপ্তধন খনিজ পদার্থ। এ সব সুখের সামগ্রী মহান আল্লাহ মুমিন-মুত্তাকী বান্দাদেরকে দান ক'রে থাকেন। আর তাদেরই বদৌলতে কাফেররাও ভোগ ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাক্বী বানাবার জন্য বিভিন্ন ইবাদত ফরয করেছেন। যেমন তিনি রোযা ফরয ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াত)*

কেবল মুখে ও লেবাসে-পোশাকে বাহ্যিকভাবে নয়, মহান আল্লাহ আমাদেরকে যথার্থ তাক্বওয়ার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } [آل عمران : ١٠٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১০২)*

উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে; তিনি বলেন,

{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن :١٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

আল্লাহ আমাদেরকে সেই তওফীক দেন।

((اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى)).

ইসলামের দ্বিতীয় রুক্ন ঃ নামায

ব্রাদারানে ইসলাম! নামাযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য একজন আল্লাহ-ভক্ত মু'মিনকে বুঝাতে হবে না। যেহেতু নামায হল ঃ-

১। মু'মিন-মুত্তাক্বীনদের কর্ম। মহান আল্লাহ মু'মিনদের পরিচয় দিয়ে বলেন,

{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (٣) سورة البقرة

অর্থাৎ,এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক। যারা অদেখা বিষয়ে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে দান করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২-৩ আয়াত)*

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } (٤)

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে দান করে। তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। *(সূরা আনফাল ২-৪ আয়াত)*

{هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ } (٣)

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ। যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী। *(সূরা নামল ২-৩ আয়াত)*

{هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (٥)

অর্থাৎ, (এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য,) সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ; যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। ওরাই ওদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে আছে এবং ওরাই সফলকাম। *(সূরা লুকমান ২-৫ আয়াত)*

২। নামায প্রভু ও বান্দার মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী ইবাদত।

মহানবী ট বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে (ফিস্‌ফিস্ করে কথা) বলে। আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৩। নামায হল মুনাজাত। যার শুরু হয় তকবীর দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম দিয়ে। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই নামাযী তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ)*

৪। নামায হল নয়নাভিরাম বাগিচা, তাতে রয়েছে নানা ইবাদতের গাছ ও ফুল। তাতে রয়েছে, তকবীর, তসবীহ, তহলীল, তহমীদ, কিয়াম, রুকূ, সিজদা, কুরআন তেলাঅত, দরূদ ও দুআ।

৫। নামায মু'মিনদের হৃদয়ের শীতলতা ও মনের শান্তি। একদা মহানবী ﷺ বিলাল ﷺ-কে বললেন, "নামাযের ইকামত দিয়ে আমার মনে শান্তি দাও হে বিলাল!" *(আহমাদ, আবূ দাউদ)*

৬। নামায ত্যাগ কাফেরদের কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী কর, অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (١١)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি। *(ঐ ১১ আয়াত)*

{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (٣١) سورة الروم

অর্থাৎ, তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা রূম ৩১ আয়াত)*

একদা রসূল ﷺ বলেন, "এমন এক শ্রেণীর আমীর হবে; যাদের জন্য দেহের চামড়া নরম হবে এবং তাদের প্রতি হৃদয়-মন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। অতঃপর এক শ্রেণীর আমীর হবে যাদের প্রতি হৃদয়-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, 'না। তাদের নামায কায়েম করা পর্যন্ত নয়।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(মুসলিম) ব্যক্তি ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ।" *(আহমাদ)*

"(মুসলিম) ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমাদের এবং ওদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে সে কুফরী করবে। (অথবা কাফের হয়ে যাবে।)" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬১ নং)*

মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, "একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা

তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক উকাইলী (রঃ) বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণ নামায ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬২নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে তার দ্বীনই নেই।" *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

আবূ দারদা ﷺ বলেন, "যার নামায নেই তার ঈমানই নেই।" *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

৭। নামাযে শৈথিল্য করা মুনাফিকদের আচরণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে ক'রে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

৮। নামাযের গুরুত্ব রয়েছে বিরাট। মহান আল্লাহ নামায পড়তে আদেশ করেছেন, কুরআন মাজীদের বহু জায়গায়। নামায হল দ্বীনের দ্বিতীয় খুঁটি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ্ব করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

নামায হল দ্বীনের খুঁটি। একদা মহানবী ﷺ মুআয ﷺ-কে বলেছিলেন, "তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" মুআয বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" *(তিরমিযী)*

তিনি কা'ব বিন উজরাকে বলেছিলেন, "নামায হল (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা এবং তোমার (ঈমানের) দলীল।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

যথা সময়ে নামায হল মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি

বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা।” *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

আমাদের নবী ﷺ উম্মতকে নামাযের জন্য বড় তাকীদ করতেন। এমনকি ইন্তিকালের সময়ও তিনি নামাযের ব্যাপারে তাকীদ ক’রে গেছেন। তিনি উম্মতকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বারবার বলে গেছেন, “নামায, নামায। আর তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীগণ (সম্বন্ধে সতর্ক হও)। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ)*

যে সব মু’মিনরা নামাযে যত্নবান, মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। নামাযে যত্নবান হতে তাকীদ ক’রে তিনি বলেছেন,

{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَات والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (٢٣٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক’রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াত)*

নামাযে যত্নবান না হলে এবং একটি মাত্র নামায ছুটে গেলে বিশাল পরিমাণ ক্ষতি হয় মুসলিমের। নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।” *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল!” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

“কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে তা হল নামায। সুতরাং তা সঠিক হয়ে থাকলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ অন্যান্য সকল আমল নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।” *(ত্বাবারানী)*

৯। জ্ঞান বর্তমান থাকলে আজীবন নামায পড়তে হবে। নাবালক শিশু, পাগল ও ঋতুমতী মহিলা ছাড়া নামায কারো জন্য মাফ নয়। কারো জন্য কোন অবস্থাতেই মাফ নয়। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে প্রাণহন্তা রক্ত-পিপাসু শত্রুদলের সামনেও নয়! *(কুঃ ৪/১০২)* অসুস্থ অবস্থায় খাড়া হয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে কাৎ হয়ে শুয়েও নামায পড়তেই হবে। *(বুঃ, মিশকাত ১২৪৮ নং)* ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা না করতে পারলে মনে মনে নিয়তেও নামায পড়তে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও পবিত্র থাকতে অক্ষম হলেও ঐ অবস্থাতেই নামায ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়ে নাও)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৯ আয়াত)*

১০। নামায আল্লাহকে স্মরণকারীদের স্মরণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত)*

তিনি মূসা عليه السلام-কে বলেছিলেন,

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١٤) سورة طـه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। *(সূরা ত্বাহা ১৪ আয়াত)*

নামায বিপদে-আপদে মহাসংকটে সাহায্য প্রার্থনাস্থল। বিনয়ীরা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে

মনের আবেগ প্রকাশ করে, ধৈর্যশীলরা তারই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দুআ ও প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} (٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (١٥٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(ঐ ১৫৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ কোন প্রকার দুশ্চিন্তা অথবা সংকটগ্রস্ত হলে নামায শুরু করতেন। *(আবূ দাঊদ)*

১২। নামায নামাযীকে মন্দ, অশ্লীল ও নোংরা কাজে বাধা দেয়, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

১৩। নামায নামাযীর পাপ খন্ডন করে, মানুষকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু’ প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত)*

আবু উসমান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান رضي الله عنه-এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?’ আমি বললাম, ‘কেন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, “হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?” আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, “মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। *(আহমাদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত (সংঘটিত সাগীরা গোনাহ) মুছে ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা নয়)।” *(মুসলিম)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক’রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা

অবশিষ্ট থাকবে কি?” সাহাবীরা বললেন, ‘(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।’ তিনি বললেন, “পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন ক’রে দেন।” *(বুখারী)*

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে। তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে ‘রুকূ’ সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহীর ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। *(মুসলিম)*

১৪। নামায হল মুক্তির উপায়, পরিত্রাণের পথ, সাফল্যের সোপান। যারা নামাযী নয়, তাদের মুক্তি নেই। মসজিদে মসজিদে আযানে আহবান করার হয় সেই সাফল্যের দিকে, ‘হাইয়্যা আলাস স্বালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ।’ আর মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } (١٥) سورة الأعلى

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। *(সূরা আ’লা ১৪-১৫ আয়াত)*

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } (٢) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।...... *(সূরা মু’মিনূন ১-২ আয়াত)*

তারা মুক্তি পাবে না, যারা আহবান শুনেও নামাযে আসে না অথবা লোক দেখানোর জন্য আসে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজ পদনালী উন্মোচন করবেন (যেভাবে উন্মোচন করা তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ)। তখন প্রতিটি মু’মিন নর-নারী তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তবে তারা সিজদা করতে পারবে না, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ পাটার মত এমন শক্ত হয়ে যাবে যে, তা ঝুঁকানো সম্ভব হবে না। *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ } (٤٣) سورة القلم

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তো তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হত। *(সূরা ক্বালাম ৪২-৪৩ আয়াত)*

বরং অনেক সময় তারা নামায নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। নামাযের জন্য ডাকা হলে তারা উপহাস করত। মহান আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতেও নিষেধ করেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ } (٥٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা

তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা ওকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। কেননা তারা এক নির্বোধ জাতি। *(সূরা মাইদাহ ৫৭-৫৮ আয়াত)*

১৫। নামায নামাযীকে চির সুখময় বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, “যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান...... এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান, তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে।” *(সূরা মাআরিজ ২২, ৩৪-৩৫ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

১৬। নামায ত্যাগ করলে অথবা লোক প্রদর্শনের খাতিরে নামায পড়লে অথবা সময় নষ্ট ক’রে নামায পড়লে দোযখে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ } (٦)

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ (ওয়াইল দোযখ) সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক’রে তা) করে.....। *(সূরা মাঊন ৪-৬ আয়াত)*

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا }

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)*

{فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } (٤٣)

অর্থাৎ, তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, ‘তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে?’ তারা বলবে, ‘আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।..... *(সূরা মুদ্দাসসির ৪০-৪৩ আয়াত)*

সামুরাহ ইবনে জুনদুব ؓ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, “তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?” অতঃপর যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, “গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, ‘চলুন।’ আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। এক সময় আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক’রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। এদিকে ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! এটা কি?’ তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।.........

এইভাবে আরো অনেক কিছু দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তাদেরকে বললাম, ‘এগুলোর তাৎপর্য কি?’ তারা আমাকে বলল, ‘আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক’রে তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে!” *(বুখারী)*

১৭। নামায ফরয হয় মি’রাজের রাত্রে সাত আসমানের ওপরে। সেখানেই ফায়সালা হয় পঞ্চাশ

ওয়াক্ত নামায। কিন্তু পরে তা পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে এনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

ব্রাদারানে ইসলাম! এই নামায পড়ুন ও পরিবারকে পড়তে আদেশ করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার নিকট কোন রুযী চাই না। আমিই তোমাকে রুযী দিয়ে থাকি। আর সংযমীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ত্বাহা ১৩২ আয়াত)*

লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

অর্থাৎ, হে বৎস ! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। *(সূরা লুকমান ১৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের বয়স ৭ বছর হলেই নামাযের আদেশ দাও। ১০ বছর বয়সে নামাযে অভ্যাসী না হলে তাদেরকে প্রহার কর। আর তাদের প্রত্যেকের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৫৭২নং)*

আর নামাযী পরিবার পেতে দুআ করুন আল্লাহর কাছে এই বলে,

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} (٤٠) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর।

ইসলামের তৃতীয় রুকন ঃ যাকাত

ব্রাদারানে ইসলাম! প্রত্যেক নবীর যুগে যাকাত প্রচলিত ছিল। আমাদের নবীর যুগেও যাকাত এসেছে। যাকাত ফরয হয় মক্কায় এবং তার বিস্তারিত বিবরণ অবতীর্ণ হয় মদীনায়। যাকাত ইসলামের ৩নং রুকন। কলেমা অতঃপর নামায, আর নামাযের পরেই হল যাকাতের মান। কুরআন মাজীদে নামাযের পাশাপাশি যাকাতকে প্রায় ৮২ জায়গায় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। *(সূরা বাকারাহ ৪৩ আয়াত)*

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দান কর উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্নে পেশ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতররূপে এবং পুরস্কার হিসাবে সবচেয়ে বড়রূপে পাবে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াত)*

{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} (٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (١١) سورة التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। *(সূরা তাওবাহ ১১ আয়াত)*

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে; নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(সূরা বাইয়্যিনাহ ৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি; (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং (৫) কাবাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী + মুসলিম)*

ব্রাদারানে ইসলাম! যাকাতের ফরয অমান্যকারী কাফের ও মুরতাদ্দ। আবূ বাক্র সিদ্দীক رضي الله عنه বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কারণ, যাকাত হল মালের অধিকার।---' *(বুখারী)*

যাকাত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর ফরযকৃত একটি এমন আমল, যার দ্বারা তিনি বান্দাকে তার প্রিয় বস্তুর কিয়দংশ ত্যাগ করতে বাধ্য ক'রে পরীক্ষা ক'রে থাকেন।

১। যাকাত হল আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত পালন করলে মুসলিম সওয়াব অর্জন করতে পারে। মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে, লাভ করতে পারে ইচ্ছাসুখের স্বর্ণরাজ্য। আবু আইয়্যুব আনসারী رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, 'আরে, কি হল ওর কি হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬নং, মুসলিম ১৩নং)*

২। যাকাত ও সাদকাহ হল মুসলিমের আখেরাতের পুঁজি। আজ যা দান করবে, কাল তা আল্লাহর নিকটে বর্ধিত আকারে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٢٧٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত)*

{وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (٣٩) سورة الروم

অর্থাৎ, মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সূদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; ওরাই হল সমৃদ্ধশালী। *(সূরা রূম ৩৯ আয়াত)*

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না ---সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা

ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

৩। যাকাত আদায়ের মাঝে মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

৪। যাকাতে পবিত্রতা লাভ হয়। তাতে যেমন মাল পবিত্র হয়, তেমনি পবিত্র হয় আত্মা। মহান আল্লাহ বলেন,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } (١٠٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, তুমি ওদের মাল থেকে সাদকাহ (যাকাত) আদায় কর। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

৫। যাকাত আদায় দিলে মালের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম)*

৬। যাকাত আদায় দিলে মালে বরকত আসে, আল্লাহর তরফ থেকে মাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (٣٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দান করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

৭। যাকাত আদায় দিলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে কৃপণ নামে অভিহিত হওয়া থেকে বাঁচা যায় এবং দানী, দাতা, দানশীল, দানবীর বা বদান্যরূপে পরিচিত হওয়া যায়।

৮। যাকাত প্রদানকারীর হৃদয় অবশ্যই দয়ার্দ্র। আর দয়ালু মানুষকে পরম দয়াবান আল্লাহ তাআলা দয়া ক'রে থাকেন।

৯। যাকাত দানকারী সমাজে জনপ্রিয় উপকারী মানুষরূপে পরিচয় লাভ করে।

১০। যাকাত প্রদানের ফলে সমাজের অভাবগ্রস্ত মানুষদের অভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। নিজের জাতির শক্তি বর্ধমান হয়। ইসলামের শান-শওকত ফিরে আসে।

১১। যাকাত নিয়মিত আদায় ও বন্টন হলে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির মত সামাজিক অপরাধ অনেকাংশে বন্ধ হতে পারে। কারণ, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' সুতরাং যাকাত বন্টনের মাঝে সমাজের অভাব দূর করলে স্বভাবকেও সুন্দর হতে লক্ষ্য করা যাবে।

১২। যাকাত প্রদানের ফলে মুসলিম অনেক মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে পারে।

১৩। যাকাত আদায়ে মহাদাতার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়। আর শুক্র আদায় করলে নিয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ }

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক আকারে দান করব। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার আযাব হবে কঠিন। *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

১৪। যাকাত আদায়ে ফকীর-মিসকীনদের দুআ পাওয়া যায়।

১৫। যাকাতে রয়েছে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ইলাহী অর্থব্যবস্থা।

১৬। যাকাত আদায়ে অর্থ ও কর্ম বাজার চাঙ্গা থাকে। কারণ, অর্থ জমা থাকলে যাকাতে খেয়ে নেবে। আর এই ভয়ে মানুষ নিজ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে এবং কর্মে মনোযোগ দেবে। আর সেই সাথে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

১৭। যাকাত না দেওয়ার পরিণাম হল মুনাফিকী। যাকাত না দেওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } (٧٧)

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকাহ দেব এবং সৎ হব।' অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন, তখন ওরা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাল। পরিণামে ওদের অন্তরে কপটতা স্থান পেল আল্লাহর সাথে ওদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত। কারণ, ওরা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং ওরা ছিল মিথ্যাচারী। *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৭ আয়াত)*

১৮। যাকাত দিতে অনেক মানুষেরই কষ্ট হয়। যাকাতকে অনেক মানুষই জরিমানা বা অর্থদন্ড মনে করে। আসলে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। মাল কমে যাওয়ার ও গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (٢٦٨)

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৮ আয়াত)*

কিন্তু মুসলিমকে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়। শয়তানের সকল চক্রবন্ধনকে উল্লংঘন করে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি লাভ করতে হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি তার যাকাত বের করে, তখনই সে তার দ্বারা ৭০টি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।" *(আহমাদ ৫/৩৫০, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৮নং)*

১৯। হিসাব করে যাকাত আদায় না করা মহাপাপ। যাকাত আদায় না দিলে তার জন্য রয়েছে পরকালের মহা লাঞ্ছনা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا

مَا كُنتُمْ تَكْنِزُوْنَ } (٣٥)

অর্থাৎ, "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডার (জমা) করে রাখে, আর তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে,) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য যা জমা করেছিলে তাই। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।" *(সূরা তাওবাহ ৩৪-৩৫)*

২০। যাকাত না দেওয়ার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব ভোগ করতে হবে কিয়ামতে।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উঁটের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উঁটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না -আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতে দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উঁটসকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উঁটদল তাদের খুড় দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা দোযখের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুড় দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।" *(বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না সেই ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তার দ্বারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা হবে -যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।"

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন

কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত) (বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে অভিশপ্ত।" *(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮নং)*

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা

হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা কাজ শুরু করবে সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

ব্রাদারানে ইসলাম! ইসলামের অর্থনৈতিক কাঠামো ও মুসলিমদের এ অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যাকাত আদায় দিন। হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে সঠিক হিসাব ক'রে যাকাতের মাল সঠিক হকদারের কাছে পৌঁছে দিন। আর খবরদার! এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার অপচেষ্টা করবেন না।

আপনি অবশ্যই জানেন যে, সকল ধনীরা যদি সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করত, তাহলে মুসলিমদের মধ্যে কেউ ভিখারী থাকত না। সভ্য সমাজে ভিক্ষুক নজরে আসলে অসভ্য লাগে, অশোভনীয় দেখায়। কিন্তু আপনি যদি সেই মাল হকদার পর্যন্ত পৌঁছে না দেন, তাহলে সেই সভ্যতা রাখা কি সম্ভব হবে?

আপনার সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, যিনি আপনাকে যাকাত আদায়কারীরূপে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যাকাত গ্রহণকারীরূপে নয়। যদি আপনাকে যাকাত গ্রহণ করতে হত, যাকাত গ্রহণের জন্য আদায়ে বের হতে হত, তাহলে আপনি কি করতেন ?

জেনে রাখুন যে, এ মাল আপনি উপার্জন করলেও তা এসেছে কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকেই। ভেবে দেখুন না, আপনার মত বহুজনই একই চেষ্টা করেও আপনার মত মাল সঞ্চয়ে সক্ষম হয় নি, আল্লাহর তওফীক অথবা বর্কত পায় নি। কিন্তু আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

অতএব আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ ও কার্পণ্য করবেন না। আর অবশ্যই কারূনের মত হবেন না, যে অকৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিল, "এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" *(সূরা ক্বাসাস ৭৮-আয়াত)* বরং আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন, যাকাত আদায়ে তৎপর হন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি তা আপনার নিকট থেকে কবুল ক'রে নেন।

সাড়ে সাত ভরি বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ হলে প্রত্যেক বছর তার যাকাত দিন। এই স্বর্ণ কেনার মত টাকা সারা বছর থাকলে তার যাকাত দিন। মাত্র এক শতে আড়াই টাকা। সাড়ে সাত কুইন্টাল ধান-গম হলে ঝাড়াইয়ের পর তার ওশর দিন। দিন তাকে, যাকে মহান আল্লাহ দিতে বলেছেন।

(ফরয) সাদক্বাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং সাদক্বাহ (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও (বিপদগ্রস্ত) মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৬০ আয়াত)*

যাকাতের বাকী আহকাম জেনে নিন। আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন। আমীন।

দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার গুরুত্ব

মানুষের উপর প্রথম ফরয ঃ জ্ঞান। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আদেশ ঃ পড়। দ্বিতীয় ফরয ঃ আমল। তৃতীয় ফরয ঃ তাবলীগ বা প্রচার। চতুর্থ ফরয ঃ এ সব কর্মের পথে ধৈর্য।

জ্ঞান ও জ্ঞানীর মান ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।" *(ইবনে মাজাহ)*

যে তাকওয়ায় বড় সেই আল্লাহর কাছে বড়। আর যার জ্ঞান বড় তার তাকওয়া বড়।

আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এ শিক্ষার শিক্ষিতরা নবীদের ওয়ারেস।

সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন আলেমের মর্যাদা, যেমন সাহাবীদের তুলনায় নবী ﷺ-এর মর্যাদা এবং তারকারাজির মাঝে চাঁদের মর্যাদা।

শিক্ষা ছাড়া কেউই জ্ঞান, সম্মান ও নিপুণতা লাভ করতে পারে না।

জ্ঞানেই আনন্দ, নির্জনতার সাথী, জীবনের বন্ধু।

জ্ঞান যার নেই, তার শক্তি ও সাহস বলতে কিছুই নেই।

সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল জ্ঞান, সবচেয়ে নিম্ন মানের দীনতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় নীচতা হল গর্ব এবং সবচেয়ে বড় বংশ হল সুন্দর চরিত্র। জ্ঞানীর যত জ্ঞান বাড়ে, তার তত বিনয় বাড়ে।

বান্দার পক্ষে আল্লাহর সর্বোত্তম দান হল, জ্ঞান। তা না থাকলে, আদব। তা না থাকলে, মাল; যা উক্ত সব কিছুকে গুপ্ত করে। তা না থাকলে, বজ্র; যা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। আর তার ক্ষতি থেকে দেশ ও দশ নিরাপদে থাকে।

ধনের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। কারণ, ধনকে হিফাযত করতে হয়, কিন্তু জ্ঞান মানুষকেই হিফাযত করে। খরচ করলে ধন নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান বর্ধিত হয়। ধন বিচারাধীন হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় বিচারক। ধন সঞ্চয়কারীরা জীবন থাকতেই মারা যায়, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়কারীরা মরণের পরও জীবিত থাকেন। যাঁদের দেহ তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি থেকে যায় সকলের মনে।

'বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,
নরের মাহাত্ম্য নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার।'

দ্বীনী আলেমের মর্যাদা কি?

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উদাহরণ চক্ষুষ্মান ও অন্ধের মত, আলো ও অন্ধকারের মত, ছায়া ও রৌদ্রের মত, জীবিত ও মৃতের মত। মহান আল্লাহ বলেন,

{هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ } (٩) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (١١)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুজাদিলাহ ১১ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে। *(তিরমিযী)*

“শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্‌র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্‌ম নয়।” *(তিরমিযী)*

“যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইল্‌মের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্‌মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।” *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, “সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে দয়া করে না এবং আমাদের আলেমদের মর্যাদা রক্ষা করে না।” *(সজাঃ ৫৪৪৩নং)*

একজন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'উলামা শ্রেষ্ঠ, নাকি ধনীদল?' বললেন, 'উলামাই শ্রেষ্ঠ।' বলা হল, 'তাহলে উলামাকে ধনীদের দরজায় বেশী বেশী আসতে দেখা যায়, অথচ ধনীদেরকে উলামাদের দরজায় ততটা বা মোটেই দেখা যায় না কেন?' বললেন, 'কারণ উলামারা ধনের কদর জানেন। আর ধনীরা জ্ঞানের কদর জানে না তাই।'

ইল্‌মের (জ্ঞানের) মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে প্রকৃত আলেম নয়, সে তা দাবী করে এবং অজ্ঞানীকে 'জ্ঞানী' বললে সে খোশ হয়। আর মূর্খতার নিন্দা প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মূর্খ হয়েও কেউ নিজেকে মূর্খ মনে করতে চায় না এবং কাউকে মূর্খ বললে, সে রেগে যায়।

একজন সলফ তাঁর মরণ মুহূর্তে একজন যিয়ারতকারী আলেমকে বললেন, 'আমাকে অমুক মাসআলাটা বলে দিন।' তিনি বললেন, 'এই মরণ যন্ত্রণার সময় আপনি মাসআলা শুনবেন?' বললেন, 'হ্যাঁ। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, “যারা জ্ঞান শিক্ষা করার পথে থাকে, তারা আসলে বেহেশ্তের পথে থাকে!” আর আমি বেহেশ্তের পথে থাকা অবস্থায় মরতে চাই।'

আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি আপনি জানতে পারেন যে, আপনি আজ সন্ধ্যায় মারা যাবেন, তাহলে আপনি কি করবেন? বললেন, 'মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি ইলম অনুসন্ধান করব।'

কোন্ আলেম প্রকৃত আলেম? যিনি নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন।

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (٢٨) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(সূরা ফাত্বির ২৮ আয়াত)*

অতএব ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করুন!

মুনাফিকের ইল্‌ম তার মুখে এবং মু'মিনের ইল্‌ম তার আমলে।

আদবের ফল সঠিক জ্ঞান এবং ইলমের ফল নেক আমল।

মানুষ যত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, যদি তার দ্বারা সে নিজে উপকৃত না হতে পারে, তবে এমন শিক্ষিতকে 'মূর্খ' বলে আখ্যায়ন করলে অন্যায় হবে না।

পাপ যত ছোটই হোক তা খারাপ। আলেমের পক্ষে পাপ অধিক অশোভনীয় এবং অধিক সম্ভাব্যও। কারণ, ইল্‌ম শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার। তাই শয়তান চেষ্টা করে, যার হাতে হাতিয়ার তাকেই প্রথমে প্রতিহত করা।

এ শিক্ষায় এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী লাভ না হলেও পরকালের চিরস্থায়ী জগতের ভোগবিলাস ও ইচ্ছাসুখের রাজত্ব লাভ হয়। এ জন্যই একজন আলেম মানুষ দুনিয়াদার ও লোভী হতে পারেন না।

ইল্‌ম যত বাড়ে, বাসনা ততই ছাড়ে। চাই নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ। যে তাজ-বিষয় আনে মুহূর্তে বিনাশ।

মুসলিম নারী ও মায়ের জন্যও এ শিক্ষা ফরযঃ

'আমাকে একটা শিক্ষিতা মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষিত জাতি দেব।' মায়ের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ।

কোন্ জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয? কোন্ শিক্ষিতের জীবনের এক আনাও মিছে নয়?

একদা এক শিক্ষিত ভদ্রলোক নদীপথে এক মাঝির নৌকায় চড়ে যাত্রা করছিলেন। কথায় কথায় তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাঝি বীজগণিতের সূত্র জান?' বলল, 'না।' বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের চার আনাই মিছে।' বললেন, 'ভূগোল জান?' বলল, 'না।' বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের ৮ আনাই মিছে।' বললেন, 'জ্যামিতি জান?' বলল, 'আজ্ঞে না।' বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের ১২ আনাই মিছে।'

আকাশে মেঘ জমে ছিল, ঝড় শুরু হল। নৌকা ডুবুডুবু। ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝি এবারে কি হবে?' বলল, 'নৌকা ডুবে যাবে। আপনি সাঁতার জানেন তো?' বললেন, 'না।' বলল, 'তাহলে আজ্ঞে, আপনার জীবনের তো ১৬ আনাই মিছে।'

বলা বাহুল্য, মাদ্রাসার ছাত্র অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সরকারী চাকরী না পেলেও কবর, কিয়ামত ও দোযখের মহাসমুদ্রে তুফানের সময় সাঁতার কেটে নাজাত পাওয়ার বিদ্যা তার আছে। আর এ হল মহাসাফল্য। সে ও তার মত শিক্ষিত লোকের জন্য কবরের তিনটি প্রশ্নের উত্তর সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিদ্যায় অশিক্ষিত লোকেরা যখন উত্তর দিতে অক্ষম হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পড়ও নি, জানও নি!

আলেম ও মাদ্রাসা মুসলিমকে কি দেয়?

এ জগতে আপনি মানুষকে যাই কিছু দান করেন, জ্ঞানদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই।

যে নিজেই নিজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, সে শিক্ষিত না হয়ে বোকা হয়।

একটি প্রদীপ থেকে শত শত প্রদীপ জ্বালালে যেমন তার আলো কমে না, তেমনি শিক্ষার আলো যত বেশী দান করা যায় ততই মঙ্গল।

জ্ঞানই একমাত্র মহামূল্যবান সম্পদ, যা খরচ করলে কখনো কমতি পড়ে না। চারিত্রিক ও

পারত্রিক এ সম্পদই দান করা হয় মাদ্রাসায়।

মাদ্রাসার বিদ্যা ঃ

এ বিদ্যা ভিখেরী বিদ্যা নয়। এ বিদ্যা নববী বিদ্যা, রাজবিদ্যা, বেহেশ্‌তী বিদ্যা। সমাজের এক শ্রেণীর কৃপণ মানুষ এ বিদ্যার পিছনে যথার্থ অর্থ ব্যয় না ক'রে, মাদ্রাসার কর্মী ও ছাত্রদেরকে তাদের দরজায়-দরজায় আসতে বাধ্য ক'রে তার নাম দিয়েছে 'ভিখেরী বা ফকীরী বিদ্যা!' দেশের সরকার এ বিদ্যার মান না দিয়ে এবং তাতে চাকুরীর সুযোগ না দিয়ে তার নাম দিয়েছে 'ভিখেরী বিদ্যা।' যদিও নববী জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানীদের সে কথায় কোন পরোয়া নেই। কারণ, তাঁরা তো সুনাম ও চাকুরী নেওয়ার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা শিখেন না। তাঁরা এ শিক্ষা শিখেন এ জগতে মানুষরূপে এবং পরকালে বেহেশ্তীরূপে বাঁচার জন্য। আর সেটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।

উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'যদি পার, তাহলে আলেম হও। না পারলে, তালেবে-ইল্‌ম হও। তাও না পারলে, তাঁদেরকে ভালোবাস। তাও যদি না পার, তাহলে তাঁদেরকে ঘৃণা করো না।'

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিক্ষা অপরের উৎসাহদানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। অতএব যারা জ্ঞান শিক্ষার পথের পথিক, তাদেরকে উৎসাহিত করুন।

কতিপয় ভুল আক্বীদার সংশুদ্ধি

আল্লাহ কোথায় আছেন?

অনেকে বলে, 'আল্লাহ কোথায় আছেন, তা কেউ জানে না।' অনেকে বলে, 'তিনি আছেন মু'মিনের অন্তরে।' অনেকে বলে, 'তিনি আছেন সর্বস্থানে। তিনি সর্বত্র বিরাজমান।'

ইমাম আবু হানীফাহ (রঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বলে যে, 'জানি না আমার প্রতিপালক আকাশে আছেন, নাকি পৃথিবীতে' সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়।"

আর 'আল্লাহ' মু'মিনের অন্তরে থাকলে বহুশ্বরবাদের গন্ধ আসে। আসলে আল্লাহর যিক্র মু'মিনের অন্তরে থাকে।

অনুরূপ সর্বস্থানে আল্লাহ থাকলে, তাঁর শানে বেআদবী হয়। কারণ তাতে পাক-নাপাক সকল জায়গায় তিনি আছেন বলে ধারণা হয়।

অতএব সঠিক আক্বীদা এই যে, মহান আল্লাহ আছেন সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। গ্রহ-নক্ষত্র পার হয়ে প্রথম আসমান এবং তার পরে আরো ছয় আসমানের উপরে আছে তাঁর কুরসী। কুরসী তাঁর পা রাখার জায়গা। তার উপরে আছে মহা আরশ। আরশের উপরে তিনি আছেন। আর তাঁর উপরে কিছু নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

(الرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)

অর্থাৎ, দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন। *(সূরা ত্বা-হা ৫ আয়াত)* এর অর্থও (তিনি আরশের) উর্ধ্বে আছেন এবং (তার উপরে) উঠেছেন। আর এইভাবে কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে, তিনি আরশে আছেন। *(দেখুন ঃ সূরা আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ত্বাহা ৫, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪ আয়াত)*

তিনি সাকার না নিরাকার?

তাঁর আকার আছে, তাঁর মুখমন্ডল বা চেহারা আছে। সে চেহারা জান্নাতীরা জান্নাতে দর্শন করবে। মহানবী ﷺ বলেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময়

আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর মহান আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম)*

তাঁর হাত আছে, তিনি নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তওরাত লিখেছেন। তাঁরআঙ্গুল আছে, আদম সন্তানের হৃদয় তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দুই আঙ্গুলের মাঝে থাকে। তাঁর পা আছে। জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইয্‌যতের কসম!' আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। *(বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং, আবূ আওয়ানাহ)*

তাঁকে পরকালে দেখা যাবে, দুনিয়ায় দেখা যাবে না। তিনি মূসা ﷺ-কে বলেছিলেন, "তুমি আমাকে কখনই দেখবে না।" *(সূরা আ'রাফ ১৪৩)* আল্লাহর নবী ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন। অন্য মানুষ স্বপ্নেও দেখতে পারে না।

ফিরিশ্তা কি পাপ করেন?

'--দু'দিনে আতশী (?) ফেরেশ্তা প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়-
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙা পায়!
অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের মার ভীতি,
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরি খুনে তিতি!'
কোথা ভেসে গেল সংযম বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ পুষ্প পুটে!!'

কবির এ মজার গল্পটি ইতিহাস নয়। এটি ঘটনা নয়, রটনা।

জ্বিন-জগতের প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী। মানুষের ওপর জ্বিন সওয়ার হয়, তার ব্রেন ও জিভ নিয়ে কথা বলে। অবশ্য যাদু, হিস্টিরিয়া বা পরিকল্পিত অভিনয়কে জ্বিন জ্ঞান করা ঠিক নয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সব কিতাব সত্য। তবে কুরআন ছাড়া পূর্বের সকল কিতাবে মানুষের ভেজাল ঢুকে গেছে; মানুষ কর্তৃক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। কেবল কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে। মহান আল্লাহ নিজে তার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

কুরআন ত্রিশ পারা। সূরা ফাতিহা তার ভূমিকা। যারা বলে, কুরআন চল্লিশ অথবা নব্বই পারা, তারা ভ্রষ্ট। আল-কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ নেই।

প্রত্যেক জাতিতে নবী গেছেন। ঈসা নবীর কোন পিতা ছিল না। যোশেফ তাঁর পিতা নয়, জনকও নয়। তিনি বৈধ বা অবৈধভাবে কোন প্রকার মিলনের সন্তান ছিলেন না। তিনি কেবল মায়ের গর্ভে আল্লাহর 'রূহ' রূপ সন্তান ছিলেন। এ কথা তিনি দোলনায় বা কোলে থেকে শিশু অবস্থায় কথা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি এখনো জীবিত আছেন। আল্লাহ তাঁকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ নন, আল্লাহর পুত্র নন; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। শেষ যামানায় তিনি আবার পৃথিবীতে শেষনবীর উম্মত হয়ে অবতরণ করবেন

এবং তাঁর হাতে সারা বিশ্বের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।

আমাদের শেষনবী ﷺ নূরের সৃষ্টি ছিলেন না। তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন। অবশ্য আমরা তাঁর মত মানুষ নই। তিনি মানুষের মত রক্ত-চামড়ার তৈরী ছিলেন। মানুষের মত ব্যথা পেতেন, ভুলে যেতেন। তাঁর পেশাব-পায়খানা পাক ছিল না। তাঁর দেহের ওজন ছিল, ছায়া ছিল। যিনি রব তিনিই নবী নন। তিনি বিনা আয়নের আরব (অর্থাৎ রব) নন, বিনা মীমের আহমাদ (অর্থাৎ আহাদ) নন। এই শ্রেণীর বিশ্বাস খ্রিষ্টানদের মত কুফরী।

তিনি না হলে সারা জাহান পয়দা হত না---এ কথা ঠিক নয়। মহান আল্লাহ তাঁর জন্য বিশ্ব রচনা করেছেন---এ কথাও সঠিক নয়। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য বিশ্ব রচনা করেছেন এবং সেই ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন।

শেষ নবী ﷺ নিজের ইচ্ছায় কাউকে মুক্তি দিতে পারবেন না। তিনি বলেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সকল মানুষ অপেক্ষা তাঁকে বেশী ভালবাসা ওয়াজেব। অবশ্য তাঁকে ভালবাসার উপায় মীলাদ, কিয়াম, নবী-দিবস, শবে-মি'রাজ ইত্যাদি পালন নয়। তাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর অনুসরণ করে।

কোন নবীই গায়েব জানতেন না। আল্লাহ ছাড়া কেউই গায়েব জানে না। নিজস্ব শক্তিতে গায়বী বা অদৃশ্যের খবর জানা একমাত্র সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সিফাত (গুণ)। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। মহান আল্লাহ বলেন, "তাঁর নিকটেই গায়বের চাবি, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।" *(কুঃ ৬/৫৯)* "বল, আমি তোমাদের এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। অদৃশ্য (গায়বী বিষয়) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" *(কুঃ ৬/৫০)* "বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়বের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" *(কুঃ ৭/১৮৮)* তিনি অহীর মাধ্যমে গায়বী খবর বলতেন।

তাঁর জীবনে স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্ক রটা, মধু হারাম করা ইত্যাদি বহু ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব জানতেন না।

তিনি শেষনবী ছিলেন, তাঁর পর আর কোন নবী নেই। ঈসা নবীও নবী হয়ে আসবেন না। তাঁরপর কেউ নবুঅত দাবী করলে সে মিথ্যুক।

মানুষ মরার পর কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে। এ পৃথিবীতে কোন মানুষ আর ফিরে

আসবে না। জন্মান্তরবাদ ভ্রষ্ট বিশ্বাস। অনুরূপ বিবর্তনবাদও ভ্রষ্টতা। মানুষ পূর্বে মানুষই ছিল; কোনও কালে বানর ছিল না; যদিও লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় ক'রে বিজ্ঞানী মানুষ নিজেকে বানর প্রমাণিত করতে তৎপর!

মানুষ মারা যাওয়ার পর বিশেষ অবস্থা ছাড়া কবর থেকে কিছু শুনতে পায় না। সুতরাং মৃতকে আহবান করা ভ্রষ্টতা।

মানুষের তকদীর আছে। তবে মানুষ পুতুল বা কলের গাড়ি নয়। নিজের তদবীর ও কর্মও আছে। আবার তদবীরই সবকিছু নয়। তকদীর আছে, তদবীর চাই। দুআ ও কর্ম উভয় চাই। তবেই হবে পরিপূর্ণ ঈমান।

আল্লাহ আমাদের ঈমান নবায়ন করুন। আমীন

সুন্দর চরিত্র

একজন মুসলিম হবে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। এ ব্যাপারে তার নমুনা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)*

আর তিনি ছিলেন, মনুষ্য-সমাজের সবচেয়ে বড় চরিত্রবান। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন,

{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (٤) سورة القلم

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। *(সূরা ক্বালাম ৪ আয়াত)*

মা আয়েশা (রাঃ)কে তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।' *(মুসলিম)*

মানুষের ব্যবহারই মানুষের পরিচয়। মানবের চরিত্রই মানবের মানবতা। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীস মেনে চলে, সেই হল মহান চরিত্রের অধিকারী।

সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য আছে অনেক। মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী)*

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" *(তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম। আর তোমাদের উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার

এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।" *(আবু দাঊদ)*

তিনি আরো বলেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।" *(আবূ দাঊদ)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৭৯নং)*

তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(সহীহুল জামে' ১৭৪৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষকে সুন্দর চরিত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ (সম্পদ) অন্য কিছু দান করা হয়নি।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৯৭৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী ৬৩৫ নং, মুসলিম ২৩২১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২১৪৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আবু যার্রের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার্র! তোমাকে আমি এমন দু'টি আচরণের কথা বলে দেব না কি? যা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ এবং (নেকীর) মীযানে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক ভারী?" আবু যার্র ﷺ বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোন আমলই করেনি।" *(আবু য়্যা'লা, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলা সহীহাহ ১৯৩৮ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তারা, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। যারা অমায়িক (সহজ-সরল), যারা সম্প্রীতির বন্ধনে সহজে আবদ্ধ হয়। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি তারা, যারা চুগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়।" *(ত্বাবারানী)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে

প্রবেশ করানো হোক, তার মৃত্যু যেন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখা অবস্থায় আসে এবং লোকেদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করে, যে রকম ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

'নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।'

মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! চরিত্রের সবক নিয়ে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। নিশ্চয় সচ্চরিত্রের মানুষ ব্যভিচারী হয় না, মদখোর হয় না, চুগোলখোর হয় না, গীবতকারী হয় না, নির্লজ্জ, প্রগলভ, ধৃষ্ট, চোয়াড় ও বখাটে হয় না, অহংকারী হয় না, হিংসুটে হয় না, পরশ্রীকাতর হয় না, লোভী হয় না, ঝগড়াটে ও ফাসাদী হয় না, কুৎসা রটনাকারী হয় না, দাগাবাজ, ধড়িবাজ ও ঠকবাজ হয় না।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে মুসলিম ভায়ের সাথে সাক্ষাৎকালে সালাম দিন এবং হাসি মুখ প্রদর্শন করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করুন। যেহেতু চরিত্রে সেই ব্যক্তি সবার চেয়ে ভাল, যে তার (ভাল) স্ত্রীর কাছে ভাল।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে ছেলে-মেয়েদের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করুন, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করুন, তার সাথে ক্ষমাশীলতার আচরণ প্রয়োগ করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে আপনার নেতা, ম্যানেজার ও শিক্ষকের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করুন। তাদেরকে সামনে ও পিছনে শ্রদ্ধা করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে আপনার বড়দেরকে সম্মান দিন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে আপনার স্নেহভাজনদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। দুর্বলদের প্রতি দয়া করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে কাফেরদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করুন।

আপনার চরিত্র সুন্দর করতে জন্তু-জানোয়ারের প্রতিও মায়াময় ব্যবহার প্রয়োগ করুন।

জেনে রাখুন যে, লোকেরা সেই মানুষকে ভালবাসে, যে চরিত্রে সুন্দর, ব্যবহারে অমায়িক, বাক্যালাপে মধুর, আচরণে বিনয়ী, ভাবে-ভঙ্গিতে ভদ্র, লেবাসে-পোশাকে স্বাভাবিক, আদান-প্রদানে সরল, সাক্ষাতে হাসমুখ, উপদেশে আন্তরিক, পরামর্শে হিতাকাঙ্ক্ষী, ব্যথা-বেদনায় সহমর্মী, দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী, অভাবে দরদী, প্রয়োজনে উপকারী, ভুলে ক্ষমাশীল। এমন মানুষকে আল্লাহও ভালবাসেন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের আখলাক-চরিত্রকে সুন্দর করুন।

তাবীয-মাদুলি ও ঝাড়-ফুঁক

ব্রাদারানে ইসলাম! কোন মুসীবত বা বিঘ্ন নিবারণ করার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জ্বিন বিতাড়ন বা ঘর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাবীয (কবচ বা মাদুলি, কোন ধাতু নির্মিত) বালা, নোয়া বা সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করা মু'মিনের ঈমান অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য। এসব ব্যবহার করা ব্যবহাকারীর বিশ্বাসানুযায়ী শির্কে আকবরও হতে পারে; শির্কে আসগরও।

বিপদ-বালাই দূর করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ}

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

তাবীয, নোয়া ইত্যাদিকে ঔষধের সাথে তুলনা করা মহা ভুল। কারণ, আল্লাহ-পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাবীয বা বালার মসীবত দূর করার সাথে কোন সম্পর্কই নেই, তার মধ্যে সে শক্তিও নেই। তাঁর ব্যবস্থা-পত্রানুসারে পালন ও ঔষধ ব্যবহার করলে দৈহিক আপদ-বালাই দূর হয় এবং আত্মিকও।

তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কোন না কোন কারণ বা হেতু সৃষ্টি করেছেন, যার সম্মিলনে কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মুমিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না। অবশ্য যাদু, ঐন্দ্রজালিক ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু তা ব্যবহার করা অবৈধ।

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

তাবীয সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর দেখা যায়।

(১) কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড়, মাযারের ধুলো বা গাঁজার ছাই, মসজিদের ধুলো ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

(২) যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা নোংরা-নাপাক জিনিস দিয়ে কুরআন আয়াত লিখে তৈরী করা হয়, তার ব্যবহারও শির্ক।

(৩) কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয। এ প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ,

প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য

অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে। আশ্চর্যের কথা যে, ওদের মতে তাবীয বেঁধে মড়াঘর বা আঁতুড়ঘর গেলে তাবীয ছুত হয়ে যায়। কিন্তু অচ্ছুতের গায়ে ঐ তাবীয ছুত হয় না!

তৃতীয়তঃ, যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

প্রকাশ থাকে যে, যা ব্যবহার করা হারাম তা ক্রয় করা, লেখা, প্রচার করা, তাতে অর্থ উপার্জন করা এবং তার ব্যবসা করাও হারাম।

কোন ধাতু বা পাথরের আংটির মাধ্যমে কোন বিপদ-আপদ বা বালা-মুসীবত দূর করতে চাওয়াও শির্ক।

নিজেকে কিংবা শিশুকে বদনযর, জ্বিন-ভুত বা রোগ-বালাই হতে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করা বৈধ নয়। (বরং তার জন্য যথাযথ নববী দুআ ব্যবহার করা বৈধ।) তেমনি পশু, ক্ষেতের ফসল বা গাছের ফলাদিকে বদনযর বা অন্যান্য আপদ হতে বাঁচাবার জন্য মুড়ো ঝাঁটা, তার, ছেঁড়া জাল, লোহা, তামা, কোন পশুর মুন্ড বা হাড়, ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা শির্ক। তদ্রূপ লগনধরা বর-কনের হাতে বা কপালে সুতো বাঁধা, (সাধারণতঃ বদনযর বা জিন ইত্যাদি থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে) সঙ্গে সর্বদা লোহা (যাঁতি বা কাজল লতা) রাখা, বিবাহের পর দাম্পত্যের মঙ্গল বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনী ভেবে স্ত্রীর (এয়তীর প্রতীকরূপে) হাতে চুড়ি বা কোন অলঙ্কার (অনুরূপভাবে স্বামীর সাথেও আংটি) রাখা জরুরী ভাবা, ছেলেদের খতনা করার পর তাদের পায়ে বা হাতে লোহা বাঁধা, মৃতের গোসল দেওয়ার পর তার ময়লাদি ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহা রাখা, আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা বা ছেঁড়া জাল ইত্যাদি রাখা, কোন খাবার জিনিস বাড়ির বাইরে গেলে তাতে লোহা বা লঙ্কা প্রভৃতি রাখা, গাড়িতে ছেঁড়া জুতা বাঁধা ইত্যাদি -যাতে শরয়ী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন যুক্তি বা হেতু থাকে না তা---ব্যবহার করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

আপনি শরয়ী হেতুতে যথার্থ বিশ্বাস রাখুন। কুরআনী আয়াত বা (সহীহ) দুআয়ে রসূল দ্বারা ঝাড়ফুঁকে রোগী সুস্থ হতে পারে। বিশেষ ক'রে বিষাক্ত জন্তুর দংশনে, বদনজরে ও শয়তান দূরীকরণার্থে কার্যকরী।

বিশ্বাস রাখুন কুরআনী আয়াত ও দুআর শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব ধর্ম ও প্রকৃতিগত গুণের উপর। যেখানে আল্লাহরই আদেশে তাঁর অনুগত ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধন ক'রে থাকেন। যেমন, হারাম-কার্যে এবং যোগ-যাদু প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াতে শয়তান সাহায্য ক'রে থাকে।

ঝাড়-ফুঁক ইসলামে স্বীকৃত। রসূল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁর উপর করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ-কে নামায পড়া অবস্থায় বিছুতে দংশন করলে, নামায শেষ হতেই তিনি পানি এবং লবণ আনতে আদেশ করলেন এবং তা দিয়ে তিনি দষ্ট জায়গায় মলতে লাগলেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস ও সূরা নাস পাঠ করতে থাকলেন। *(সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৫৪৮-নং)*

একদা আবু হাবেস জুহনী ﷺ-কে নবী ﷺ বললেন, "হে আবু হাবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?" তিনি বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন।' মহানবী ﷺ এই সূরা দুটিকে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।" *(সহীহ নাসাঈ আলবানী ৫০২০নং)*

নবী ﷺ মানুষ ও জিনের বদ নজর থেকে (আল্লাহর) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই দুটি সূরা অবতীর্ণ হল, তখন থেকে তিনি ঐ দুটিকে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বাকী অন্যান্য (দুআ) বর্জন করলেন। *(সহীহ তিরমিযী, আলবানী ২ ১৫০ নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখনই নবী ﷺ-এর কোন কষ্ট হত, তখন তিনি মুআব্বিযাতাইন (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস) সূরা দু'টি পড়ে নিজ শরীরে ফুঁক দিতেন। যখন (শেষ জীবনে) তাঁর কষ্ট-বেদনা বৃদ্ধি পেল, তখন আমি উক্ত সূরা দুটি পড়ে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাতের বর্কতের আশা রেখে তা নবী ﷺ-এ এর শরীরে ফিরাতাম। *(বুখারী-মুসলিম)*

যখন নবী ﷺ-কে যাদু করা হল, তখন জিব্রাঈল ﷺ এই দুই সূরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে, এক ইয়াহুদী (লাবীদ বিন আ'সাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী ﷺ-কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিব্রাঈল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সূরা থেকে এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ ক'রে দুই হাতের তালুতে ফুঁক মেরে সারা শরীরে ফিরাতেন। প্রথমে মাথা, মুখমন্ডল তারপর শরীরের অগ্রভাগে হাত ফিরাতেন। তারপর যতদূর পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছত, ততদূর তা ফিরাতেন এবং তিনি এইরূপ তিনবার করতেন। *(সহীহ বুখারী ফাযায়েলে কুরআন, মুআব্বিযাত পরিচ্ছেদ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

অতএব মুসলিমও ঝাড়-ফুঁক করতে পারে। কিন্তু এর বৈধতার জন্য দুটি শর্ত আছে। প্রথমতঃ যেন তা কুরআনী আয়াত, (সহীহ) দুআয়ে রসূল অথবা আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) দ্বারা হয়। দ্বিতীয়তঃ যেন রোগী ও ঝাড়-ফুঁককারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ঝাড়-ফুঁকের (অনুরূপভাবে ঔষধের) নিজস্ব কোন শক্তি বা তাসীর নেই। বরং (তা আল্লাহর

দানে) আরোগ্য তাঁর ইচ্ছা ও তকদীরের উপর হয়। বলা বাহুল্য, কোন ফিরিশ্তা, জিন বা কোন দেবতার (যেমন, ষাট বা ষষ্ঠি মায়ের) নামের যিক্র নিয়ে অথবা কোন অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বা করানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাদারানে ইসলাম! ঘর বন্দ করার সময়ও শির্কী আচরণ থেকে বাঁচুন। বাড়ির দরজায়-জানালায় তাবীয চিটিয়ে, বাড়ির আঙিনায় আয়না টাঙ্গিয়ে, ঘরের কোণে কোণে শির্কী পদ্ধতিতে মাটির ভাঁড় পুঁতে বাড়ি থেকে জিন-ভুত দূর হয় না এবং ঘরের বর্কতহীনতা দূর হয়ে বর্কত আসে না। সুতরাং ঘর বন্দ করার জন্য শরয়ী পদ্ধতি ব্যবহার করুন। ঘরে নিয়মিত সূরা বাক্বারার তিলাঅত করুন। ঘরে মরিচের ধোঁয়া দেওয়া হলে সে ঘরে কোন মানুষ টিকতে পারবে না। তেমনি শয়তানের জন্য মরিচের ধোঁয়া হল, মহান আল্লাহর যিক্র। আল্লাহর যিক্রে সে জ্বলে ওঠে। আযানে আল্লাহর যিক্র শুনে সে পাদতে পাদতে পলায়ন করে। বলাই বাহুল্য যে, ঘর থেকে তাকে বিতাড়িত করতে, অন্য কথায় শয়তান থেকে 'ঘর বন্দ' করতে আপনি শরয়ী পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক চিকিৎসা ব্যবহারের তওফীক দিন আমীন।

কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ

রাস্তার ধারে এক সুন্দর দেওয়ালে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে জরিমানা লাগিবে।'

কিন্তু অনেকে এসে সেই লেখার উপরেই পেশাব করছে। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার চারটির মধ্যে একটি হতে পারে ঃ-

(ক) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, পাশে দৃষ্টি-আকর্ষী জিনিস থাকার কারণে তারা তা ধেয়ান দিয়ে দেখে না।

(খ) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, তারা তা পড়তে জানে না বা বুঝে না।

(গ) পড়তে পারে, কিন্তু ভুল পড়ে; তারা পড়ে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে জরিমানা লাগিবে!' সুতরাং তারা জরিমানা দেওয়ার ভয়ে পেশাব করেই যায়!

(ঘ) পড়তে পারে, বুঝে ও জানে; কিন্তু মানে না, গুরুত্ব দেয় না।

মুসলিমদের অবস্থাও তাদের মতই হতে পারে। তারা কলেমা পড়ে, কিন্তু কলেমা-বিরোধী কর্ম করে। বরং অধিকাংশ মানুষ তার অর্থ বুঝে না। আর অর্থ না বুঝে পড়লে কলেমা কোন কাজে দেবে না।

বাঙালী হাজীর একটি গ্রুপ হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। নিজেরা রান্না ক'রে খাচ্ছিলেন। প্রথম দিন এক হাজী সাহেব রান্নার জন্য লবণ আনতে গেলেন। দোকানে গিয়ে বললেন, 'লবণ, লবন!'

দোকানদার ফ্রিজ থেকে একটি ডিব্বা বের ক'রে দিল। ডিব্বা ঠান্ডা ছিল। হিলিয়ে দেখলেন, ভিতরে যেন তরল কিছু আছে। ভাবলেন, সঊদী আরব উন্নত দেশ। হয়তো বা এ দেশে লবণ এইভাবে প্যাকেটে লিকুইড বিক্রি হয়। কিন্তু বাসায় ফিরে এসে তরকারীতে দেওয়ার আগে জিভে লাগিয়ে দেখা গেল, সেটা লবণ নয়, দই!

শব্দের অর্থ না জানার জন্য এই শ্রেণীর বিভ্রাট ঘটতেই পারে। আসলে আরবীতে 'লবণ' মানে দই। কিন্তু সে কথা তো বাঙালী হাজী সাহেবের জানা ছিল না।

এই অবস্থা কলেমা পাঠকারী এবং নামাযীদের। অর্থ না জানার ফলে অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়ে বসে থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

এই কলেমার সাক্ষ্য দিতে হয়। আর না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া যায় না, না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া অন্যায়। সুতরাং কলেমার সাক্ষ্য দিতে হলে তার মানে জানা একান্ত জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই। তবে যারা সত্য জেনে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। *(সূরা যুখরুফ ৮৬)*

কলেমার অর্থ না জানলে ঈমান আসবে না। শুধু চিনি চিনি করলে মুখ মিষ্টি হয় না। চিনি না খেলে মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায় না।

মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আসুন আমরা প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য সেই কলেমার অর্থ জানি।

এমনিতে জান্তাদের মধ্যে এর ৪টি অর্থ প্রচলিত আছে। যার মধ্যে তিনটি অর্থ ভুল এবং একটি সঠিক। আর তা হল ঃ-

১। 'আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।' অর্থাৎ আপদে-বিপদে আল্লাহ ছাড়া উদ্ধারকর্তা আর কেউ নেই। এ কথা ঠিক; কলেমার অর্থ তা নয়। অথবা বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ। আর এ অর্থ হল সর্বেশ্বরবাদীদের। অর্থাৎ, চোখের সামনে যা দেখি, সবই আল্লাহ। সবই একাকার আল্লাহ!

নিশ্চয় এ অর্থ ও বিশ্বাস ভ্রষ্টতা। এই অর্থে কেউ কলেমা পড়ে থাকলে সে মুসলিম হতে পারে না।

২। 'আল্লাহ ছাড়া কোন মালিক বা সৃষ্টিকর্তা নেই।' অনেকে কলেমার অর্থ এই ক'রে থাকেন। কিন্তু কথা হিসাবে তা ঠিক হলেও অর্থ হিসাবে ঠিক নয়। কারণ, কলেমার অর্থ তা-ই হলে মক্কার মুশরিকদেরকে আর কলেমা পড়ার জন্য আদেশ করা হতো না। আল্লাহর নবী ﷺ বলতেন না, "হে লোক সকল! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল পরিত্রাণ পাবে।" যেহেতু মুশরিকরা এ কথা জানত ও মানত যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মালিক বা সৃষ্টিকর্তা নেই।' মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ}

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।' *(সূরা যুখরুফ ৯ আয়াত)*

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٨٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? *(ঐ ৮৭ আয়াত)*

{قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(সূরা ইউনুস ৩১ আয়াত)*

এ সত্ত্বেও দয়ার নবী ﷺ কলেমার দাওয়াত দিলেন এবং তার জন্য কত গালি খেলেন, শাস্তি ভোগ করলেন, পাথর খেলেন, স্বদেশ ত্যাগ ক'রে হিজরত করলেন, জিহাদে দাঁত ভাঙ্গলেন। আর তার মানে তারা যে বিশ্বাস ও কর্ম করত তা 'মুসলিম' হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, তা ছিল তাওহীদুর রবূবিয়্যার বিশ্বাস। 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' তাদের মধ্যে ছিল না। তারা আল্লাহ আছেন এ কথা স্বীকার করত, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা-রুযীদাতা--তাও বিশ্বাস করত, কিন্তু তাঁর নৈকট্যদাতা ও তাঁর নিকট সুপারিশকারীরূপে গায়রুল্লাহর ইবাদত করত।

বলা বাহুল্য উক্ত অর্থ বিশ্বাস রেখে যদি কেউ কলেমা পড়ে, তাহলে মুসলিম হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

৩। 'আল্লাহ ছাড়া কেউ হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা নেই।' যাঁরা রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেন, তাঁরা কলেমার এই শ্রেণীর বিকৃত অর্থ গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু উক্ত কথা ঠিক হলেও কলেমার অর্থ তা নয়। 'ইলাহ'-এর অর্থ 'হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা' নয়। অবশ্য এ অর্থ 'ইলাহ'-এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে শামিল। কিন্তু সেই ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ ক'রে একটি আংশিক অর্থে সীমাবদ্ধ করা এবং দাওয়াতের শুরুতে রাজনীতির অনুভব দিয়ে মানুষকে দ্বীনের দিকে আহবান করা মহানবী ﷺ-এর আদর্শ ছিল না।

মহানবী ﷺ-কে কলেমা প্রচার বন্ধ করার বিনিময়ে মক্কার রাজা করতে চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা হননি। যেহেতু কলেমার আসল যে অর্থ, সেই অর্থহীন রাজত্ব তাঁর কাম্য ছিল না। গদি লাভের পর পিটিয়ে সমস্ত মানুষকে কলেমার আসল অর্থের মুসলমান বানিয়ে ফেলবেন, সে আশাও দুরাশা ছিল। তাই তিনি রাজা হয়ে রাজনীতিতে না গিয়ে প্রথমে কলেমা দিয়ে 'মুসলিম' তৈরীর কাজে মন দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াত রাজনীতি-ভিত্তিক ছিল না; যেমন ফাযায়েল-ভিত্তিকও ছিল না। তাঁর দাওয়াত ছিল গুরুত্ব-ভিত্তিক।

একটি লোকের যদি দৈহিক পাঁচটি রোগ থাকে। অতঃপর রাত্রে যদি তাকে সাপে কাটে, তাহলে সকালে অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চয়ই সাপে কাটার চিকিৎসা আগে করবেন। নচেৎ তা বাদ দিয়ে যদি তিনি সর্দি-কাশি বা অন্য কোন জীবন-নাশক নয় এমন রোগের চিকিৎসা শুরু করেন, তাহলে জানতে হবে যে, তিনি চিকিৎসক নন, ঘাতক।

৪। 'আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই।' এই হল কলেমার আসল অর্থ। 'লা' মানে 'নেই'। 'ইলাহ' মানে 'মা'বূদ, উপাস্য, ইবাদতের যোগ্য'। আপদে-বিপদে যাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয় এবং যিনি আশ্রয় দেন। সকল সৃষ্টি যাঁর উলূহিয়্যাত মেনে চলে, তিনি 'ইলাহ'। বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জিনিস যাঁর ইবাদত করে, তিনি 'ইলাহ'। বিপদে-আপদে বালা-মুসীবতে যাঁকে আহবান করা হয়, তিনি 'ইলাহ'। সকল সৃষ্টির যিনি আশা-ভরসা, তিনি 'ইলাহ'। বঞ্চনায় যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়, তিনি 'ইলাহ'। সারা সৃষ্টি যাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি 'ইলাহ'। সুতরাং 'লা ইলাহা'-এর অর্থ হল 'নেই কোন উপাস্য'।

'ইল্লা' শব্দের অর্থ 'ছাড়া, ব্যতীত'। কলেমার পুরো অর্থ হল, 'নেই কোন উপাস্য ছাড়া আল্লাহ।'

এতে রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি কথা। 'লা' শব্দের তরবারি দিয়ে সমস্ত ইলাহের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। অতঃপর 'ইল্লা' শব্দ দিয়ে কেবল আল্লাহর ইলাহত্বকে বাকী রাখা

হয়েছে। কোন প্রকারের, কোন রকমের, কোন ভাবের ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সকল প্রকার ইবাদতের যোগ্য কেবল সেই আল্লাহ; যিনি সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা ইত্যাদি। একমাত্র তিনিই সকল প্রকার ইবাদতের যোগ্য অধিকারী। বাকী যাদের ইবাদত-অর্চনা করা হয়, তারা আসলে তার যোগ্য নয়। তারা 'ইলাহ' নাম পাওয়ারই যোগ্য নয়। তাদেরকে লোকে 'ইলাহ' মানলেও সত্যিকারে তারা 'ইলাহ' নয়; তারা 'মিথ্যা ইলাহ'। সত্য মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ। এই জন্য কলেমার অর্থে বন্ধনীতে (সত্য) বা (সত্যিকার) কথাটি অতিরিক্ত করা হয়।

মহান আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা। অথচ মানুষ তা চিনেও অন্যের ইবাদত করে! আল্লাহর বান্দা তাঁর বন্দেগী বাদ দিয়ে অথবা তাঁর বন্দেগীর সাথে সাথে অন্য বান্দারও বন্দেগী করে! যে রাজা অনুগ্রহ করলেন, সে রাজার মাথায় মুকুট না দিয়ে মুকুট দেয় দারোয়ানের মাথায়!

মানুষের এই ভুল ভাঙ্গবার জন্যই যুগে যুগে এই কলেমা এল, মানুষকে সৃষ্টির উপাসনা বর্জন ক'রে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার আহবান জানাতে এই বাণী এল। এই কথারই আহবান এল বিভিন্ন শব্দে,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦) سورة النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। *(নিসা ৩৬)*

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত)*

সুতরাং যে ব্যক্তি এ কলেমা পাঠ করে, সে আসলে এই ঘোষণা করে যে, 'আমি আমার যাবতীয় ইবাদতের যোগ্যরূপে কেবল আল্লাহকেই মানি। অন্য কাউকে ইবাদত, উপাসনা, আরাধনা, অর্চনার যোগ্য মনে করি না।

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}

অর্থাৎ, এ জন্য যে, আল্লাহ; তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে আহবান করে, তা নিঃসন্দেহে অসত্য। আর আল্লাহ; তিনিই তো সমুচ্চ, সুমহান। *(সূরা হাজ্জ ৬২ আয়াত)*

নিশ্চয় 'ইলাহ' তিনিই, যিনি সর্বভাষা বোঝেন, একই সময় সব ডাক শুনতে পান, সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, যিনি সদা জাগ্রত।

এই কলেমা পড়ার সাথে সাথে এ কথারও ঘোষণা থাকে যে, আমি তাঁর সাথে ইবাদতে অন্য কাউকে, কোন কিছুকে শরীক করি না।

সুতরাং যারা শির্ক করে, তারা কালেমার মানে বোঝে না। কালেমা পড়ে যারা কবরে যায়, মানত মানে, গায়রুল্লাহর আইন মানে, পীর-আওলিয়াকে বিপত্তারণ বা উদ্ধারকর্তা মানে, তারা

এ কলেমার মানে বুঝে না।

যারা নামাযে 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন' বলে আল্লাহর প্রশংসা ক'রে নিজের সাফাই ঝাড়ে এবং তার সাথে অমুক বাবা বা বুযুর্গের কাছে সাহায্য চায়, সন্তান চায়, সুখ-সমৃদ্ধি চায়, তারা তার মানে বুঝে না। 'বন্দে মাতরম' বাক্যের মানে বুঝে না বলেই তো মুসলিম ছেলেরা তা গায়। একজন মহিলা (বিয়ে পড়ানোর সময়) 'স্বামী' শব্দের অর্থ বুঝে না বলেই তো তার সাথে অন্য পুরুষকেও তার দেহ, যৌবন, রূপ, সৌন্দর্য, আনুগত্য ও প্রেমে শরীক করে।

তারা জানে না অথবা মানে না। এই কলেমার মানে বুঝত জাহেলী যুগের মানুষরা। তাই তো তারা কালেমা বলতে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল,

{أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} (٥) سورة ص

অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' *(সূরা স্বাদ ৫ আয়াত)*

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ}

অর্থাৎ, ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' *(সূরা স্বাফফাত ৩৬ আয়াত)*

তারা অর্থ বুঝেছিল বলেই সে তওহীদের বাণী উচ্চারণ করতে অহংকার প্রদর্শন করেছিল।

মহানবী ﷺ-এর চাচা আবু তালেব বুঝেছিলেন বলেই তিনি মরণের সময়ও তা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক'রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।"

কিন্তু পাশে বড় বড় নেতারা বসে ছিল। আবূ জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, 'আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?'

যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ ক'রে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

এর যথার্থ মানে বুঝেছিলেন সাহাবাগণ। এই জন্য তাঁরা শুরুতে সাফা-মারওয়ার সাঈ করতে অসুবিধা বোধ করেছিলেন। জাহেলিয়াতে মুশরিকরা স্বাফা পাহাড়ে 'ইসাফ' এবং মারওয়া পাহাড়ে 'নায়েলা' নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল। সাঈ করার সময় তারা এদেরকে চুম্বন বা স্পর্শ করত। যখন তারা কলেমা পড়ে ইসলাম কবুল করে, তখন তাদের মাথায় এই খেয়াল এল যে, মনে হয় স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করলে ক্ষতি হতে পারে। কারণ, ইসলামের পূর্বে তারা উক্ত দু'টি মূর্তির জন্য সাঈ করত। মহান আল্লাহ তাদের সন্দেহ ও মনের কিন্তুকে দূর ক'রে বলেছিলেন,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দু'টি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং

যে কা'বাগৃহের হজ্ব কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৮ আয়াত)*

কলেমার সঠিক অর্থ বুঝেছিলেন বলেই উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ 'হাজরে আসওয়াদ' চুমতে গিয়ে বলছিলেন, 'আমি সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার, আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমতাম না।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উঁট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। ....." *(আবূ দাউদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

কলেমার সঠিক অর্থ বুঝেছিল বলেই সে লোকের মনে ঐ শ্রেণীর প্রশ্ন উদয় হয়েছিল।

ইবনে মসউদ ﷺ-এর স্ত্রী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মসউদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কি?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' একথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মসউদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।" *(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

কলেমার সঠিক অর্থ বুঝেছিলেন বলেই ইবনে মাসউদ ﷺ-এর এই আচরণ।

আবূ জাহল এ কলেমার অর্থের ব্যাপারে জাহেল ছিল না। আর তার জন্যই সে তা পাঠ করেনি। কিন্তু বর্তমান যুগের জাহেলীরা কলেমা মুখে পড়ে এবং কবরকে সিজদা করে। তারা কি কলেমার অর্থ জানে? আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন।

কলেমার শর্তাবলী

ব্রাদারানে ইসলাম! মুখে 'ঈমান এনেছি' বললেই কেউ মু'মিন হয়ে যায় না। মু'মিন হওয়ার শর্ত পালন করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (١٤) سورة الحجرات

অর্থাৎ, মরুবাসী (বেদুঈন)গণ বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' তুমি বল, 'তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ বিশ্বাস এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা হুজুরাত ১৪ আয়াত)*

একজন স্ত্রী যেমন শাদী কবুলে কেবল 'হুঁ' বললেই কারো স্ত্রী থাকে না, যতক্ষণ না সে স্বামীর সংসারে এসে দাম্পত্যের সকল শর্ত মেনে না নিয়েছে, তেমনি একজন মু'মিনও ততক্ষণ মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না ঈমানের কথা অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করেছে।

কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বললেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। তার শর্তাবলী পালন না করলে ঐ কালেমা বলার কোন মূল্য থাকে না।

হাসান বাসরী (রঃ)কে বলা হল, কিছু লোকে মনে করে, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে"---এ কথা কি ঠিক? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তা বলবে এবং তার হক ও ফরয আদায় করবে, সেই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।'

অহাব বিন মুনাব্বিহকে বলা হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো জান্নাতের চাবি। সুতরাং তা পড়ে নিলেই তো যথেষ্ট।' তিনি বললেন, 'তা জান্নাতের চাবি অবশ্যই। কিন্তু চাবিতে একাধিক দাঁত থাকে। তাছাড়া তালা খোলা যায় না।'

বলা বাহুল্য, আমল ছাড়া কেবল কলেমা পড়ে বেশ্তে যাওয়া যাবে না। এ জন্যই কুরআন মাজীদে লক্ষ্য করবেন যে, যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে, প্রায় সেখানেই পাশাপাশি নেক আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু আমল ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ নয় এবং কেবল ঈমানের দাবি ক'রে জান্নাত যাওয়া সহজ নয়।

কলেমার ৭টি শর্তাবলী চাবির দাঁত স্বরূপ। সেই শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ-

(১) নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক নিরূপণ ক'রে তার অর্থ জানতে হবে। কলেমার সঠিক অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করলে হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

এই কলেমার সাক্ষ্য দিতে হয়। আর কোন কিছুর সাক্ষ্য তা না জেনে দেওয়া যায় না। সুতরাং মুসলিম মুখে যে কলেমার সাক্ষ্য দেবে, তার মানে জানা একান্ত জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই। তবে যারা সত্য জেনে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। *(সূরা যুখরুফ ৮৬)*

জ্ঞানীরাই কেবল সজ্ঞানে সাক্ষ্য দিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (١٨)

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(আলে ইমরান ১৮)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মারা যায়, আর সে জানে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

(২) তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও প্রত্যয় হতে হবে।

কলেমার অর্থ জানার সাথে সাথে হৃদয়-মনে তা স্থান পেতে হবে। যে অর্থ মুসলিম বুঝবে, সেই অর্থ অন্তরে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে। সেই অর্থে কোন প্রকার সন্দেহ হলে চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } (١٥) سورة الحجرات

অর্থাৎ, বিশ্বাসী তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। *(সূরা হুজুরাত ১৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' যে ব্যক্তি সন্দেহহীন হয়ে এই দুই কলেমা নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আবূ হুরাইরাকে বলেছিলেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" *(ঐ)*

(৩) বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করতে হবে।

কলেমা পড়তে হবে বিশুদ্ধচিত্তে ইখলাসের সাথে। অর্থাৎ, তাতে শির্কের দুর্গন্ধ থাকলে কলেমা পড়ার কোন লাভ নেই। কলেমার সাথে শির্কের বড় শত্রুতা আছে। আলো-অন্ধকারের মত সম্পর্ক আছে। কলেমা পাঠকারী মুশরিক হতে পারে না। আর কোন মুশরিক মুসলিম থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } (٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। *(সূরা যুমার ৩ আয়াত)*

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার সুপারিশের অধিক সৌভাগ্য লাভকারী হবে সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

এই শর্ত পালনের জন্য মুসলিমের প্রত্যেক আমল খাঁটি ও সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'আমল যদি বিশুদ্ধ আল্লাহর জন্য হয়, কিন্তু সঠিক না হয়, তাহলে তা কবুল হবে না

এবং তা যদি সঠিক হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, তাহলেও কবুল হবে না। বিশুদ্ধ হবে (সকলের সন্তুষ্টি দৃষ্টিচ্যুত ক'রে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করলে। আর সঠিক হবে (সকল তরীকা বাদ দিয়ে) কেবল মহানবী ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী আমল করলে।' *(আল-ক্বাওলুস সাদীদ ৪০পৃঃ)*

(৪) তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা থাকতে হবে।

মুখে যে কলেমা পড়া হচ্ছে সেই কলেমার অর্থে এবং সেই অনুযায়ী আমলে কপটতা থাকলে হবে না। মুখে এক অন্তরে অন্য এক হলে চলবে না। মুনাফিক্বীর ধোঁকাবাজি থাকলে হবে না। এমনকি কোন বিপদ-আপদে পতিত হলেও কলেমায় সত্যনিষ্ঠা প্রমাণ করতে হবে এবং কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তাতে পাশ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা আনকাবূত ২-৩ আয়াত)*

{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } (١٠)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী', কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ এবং বিশ্বাসিগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না। এটা তারা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ৮- ১০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে কেউ হৃদয়ের সত্যবাদিতার সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম ক'রে দেবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অবশ্যই যে ভালবাসার দাবি করবে, তাকে কাজে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। কাজে প্রমাণ বিপরীত পাওয়া গেলে জানতে হবে সে কপট প্রেমিক।

ইবনে রজব (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, অতঃপর আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও বিরোধিতায় শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্য করে, সে ব্যক্তির কর্ম তার কথার মিথ্যায়ন করে। আর আল্লাহর অবাধ্যতায় শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্যের পমিাণ অনুযায়ী তার তওহীদ হ্রাস পেতে থাকে।' *(আল-ক্বাওলুস সাদীদ ৪০পৃঃ)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী

সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫০ আয়াত)*

{وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (٢٦) سورة ص

অর্থাৎ, খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে। *(সূরা স্বা-দ ২৬ আয়াত)*

(৫) এই কালেমা ও তার নির্দেশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা থাকতে হবে এবং তা নিয়ে আনন্দিত হতে হবে।

আল্লাহর প্রতি তা'যীম ও দ্বীনের প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। মহান আল্লাহকে ভালবাসার সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমনঃ-

(ক) তিনি যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তা ভালবাসতে ও পছন্দ করতে হবে।

(খ) তিনি যা ঘৃণা ও অপছন্দ করেন, তা ঘৃণা ও অপছন্দ করতে হবে।

(গ) তাঁর বন্ধুদেরকে ভালবাসতে হবে এবং শত্রুদেরকে ঘৃণা ও বর্জন করতে হবে।

(ঘ) তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেন, তা পালন করতে হবে।

(ঙ) তাঁর দ্বীনের সাহায্য করতে হবে এবং তার বিজয়ে আনন্দিত ও পরাজয়ে দুঃখিত হতে হবে।

এ ছাড়া যে ভালবাসার দাবী করে, সে আসলে ঝুটা ও কপট। যে আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালবাসে, তাঁর বন্ধু তথা দ্বীনদার মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে, সে কলেমা পড়লেও সে ঝুটা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ}

অর্থাৎ, কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৫ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না। *(মাইদাহ ৫৪)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। এবং কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৬) প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

এই কলেমার দাবী মেনে নিতে হবে। তা সাদরে গ্রহণ করতে হবে। উন্নাসিকতা বা অহংকারের সাথে তা বর্জন করলে হবে না। যেমন মেহমানরূপে কোন ব্যক্তিকে আপনার বাড়ির দরজায় পেয়ে পরিচয় হওয়ার পর তাকে ভিতরে বরণ করতে হয়। বরণ না করলে মেহমানের অপমান হয়। যারা

কলেমাকে বরণ করে না, তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ} (٢٤)

অর্থাৎ, (প্রত্যেক সতর্ককারী) বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' (প্রত্যুত্তরে) তারা বলত, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' *(সূরা যুখরুফ ২৪ আয়াত)*

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ} (٣٦)

অর্থাৎ, ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ৩৫-৩৬ আয়াত)*

(৭) তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হতে হবে।

মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তিনি বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}

অর্থাৎ, তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? *(সূরা নিসা ১২৫ আয়াত)*

{وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (٢٢)

অর্থাৎ, যে কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর অধীনে। *(সূরা লুক্বমান ২২ আয়াত)*

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *নিসা ৬৫)*

৮। তাগূত অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সকলের ইবাদত ও আনুগত্যকে অস্বীকার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬)*

উক্ত শর্তাবলী পালনে উৎসাহী মুসলিমই আসল ও খাঁটি মুসলিম। সেই মুসলিমের কলেমা পাঠ করার সার্থকতা আছে। মহান আল্লাহ সকল মুসলিমকে কলেমার শর্তাবলী পালন সহ তা পাঠ করার তওফীক দিন। আমীন।

ইসলাম-বিধ্বংসী বিষয়াবলী

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! কাফের তো কাফেরই, নাস্তিক তো অমুসলিমই; কিন্তু মুসলিম হয়ে কারা কাফের হয়ে যায়, তা জানা দরকার আমাদের। যাতে অজান্তে আমরা তাদের একজন হয়ে বসে না থাকি।

১। যে মুসলিম আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেহেতু শির্ক সবচেয়ে বড় অন্যায়। শির্ক করলে যাবতীয় নেক আমল পন্ড হয়ে যায়। শির্ক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম ঠিকানা হয়।

মহান আল্লাহ কর্মে শির্ক; যেমন এই বিশ্বাস যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ রুযী দেয়, সুখ দেয়, সন্তান দেয়।

তাঁর গুণে শির্ক; যেমন এই বিশ্বাস যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ গায়বের খবর জানেন।

তাঁর ইবাদতে শির্ক; যেমন তিনি ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা, অন্যের কাছে প্রার্থনা করা, অন্যের নামে নযর মানা, কুরবানী করা ইত্যাদি।

২। যে মুসলিম এ বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান। চোখে যা দেখি, সবই আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। অথবা যারা মনে করে যে, 'যিনি গুরু, তিনিই খুদা।' 'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর, নামে মোবারক মোহাম্মদ.....।'

৩। ঈমান ও ইসলামের কোন রুক্নকে অস্বীকার করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, 'তকদীর বলে কিছু নেই, নামায একটি বাড়তি বা ফালতু কাজ, সে যুগের লোকেরা খেতে পেত না বলে রোযা রাখত' ইত্যাদি।

৪। সর্ববাদিসম্মত কোন হারাম জিনিসকে হালাল অথবা হালাল জিনিসকে হারাম করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

৫। ইসলামের কোন বিষয়কে ঘৃণা করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি একাধিক বিবাহকে অথবা তালাককে বিধান হিসাবে ঘৃণা করে, দ্বীনী শিক্ষাকে 'ফকীরী-বিদ্যা' বলে ঘৃণা করে, তাহলে তার ঈমান আছে কি না সন্দেহ। মহান আল্লাহ বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (٩) سورة محمد

অর্থাৎ,এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল ক'রে দেবেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৯ আয়াত)*

৬। ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ, নবী, সাহাবী, শরীয়ত, দাড়ি, পর্দা বা অন্য কোন দ্বীনদারী নিয়ে মুসলিমকে ঠাট্টা করা।

তবুকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে আলোচনা করতে করতে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে বলতে লাগল, 'আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।' কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মনের কথা খুলে দিয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (٦٦) التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে

পড়ে যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেবে। তুমি বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দেবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী। *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬ আয়াত)*

৭। কুরআনের কোন অংশ অথবা সহীহ হাদীসকে যে অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

৮। যে কোনভাবেই আল্লাহ, রসূল অথবা দ্বীনকে গালি দিলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে সালমান রুশদী ও তসলীমা নাসরীন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৯। মহান আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

১০। ইসলামী আইন-কানূন অচল মনে ক'রে মানুষের মনগড়া আইন-কানূন দিয়ে বিচার ও রাষ্ট্রপরিচালনা করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

১১। ইসলামী সংবিধান ছাড়া অন্য কোন সংবিধানের কাছে বিচার-প্রার্থী হলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(ঐ ৬৫ আয়াত)*

১২। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকেও সঠিক মনে করলে, সব ধর্ম সমান মনে করলে, যে কোন একটি ধর্ম মেনে বেহেশ্ত পাওয়া যাবে মনে করলে, ইসলাম-ধর্ম ছেড়ে মানবতা-বাদী ধর্মে বিশ্বাসী হলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(আলে ইমরান ৮৫)*

১৩। অমুসলিমদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা মাইদাহ ৫১ আয়াত)*

১৪। ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, তার শিক্ষা থেকে বিমুখ হলে, কুরআন থেকে পিঠ ঘুরালে, মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى } (١٢٧)

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' *(সূরা ত্বা-হা ১২৪-১২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً } (١٠١)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কুরআন) দান করেছি। যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। *(ঐ ৯৯-১০১ আয়াত)*

১৫। নিজেকে ইসলামী শরীয়তের উর্ধ্বে ভাবলে, কোন মানুষের জন্য ইসলামী শরীয়ত থেকে বাইরে থাকার অবকাশ আছে মনে করলে, মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যারা ইসলামকে শরীয়ত-হকীকত-তরীকত ও মারেফতের মাঝে ভাগ ক'রে রেখেছে এবং মারেফতিতে গিয়ে ফুর্তি মারে, তারা নিজেদের মতানুসারেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

আল্লাহর নবী ﷺ অপেক্ষা বেশী মারেফত কেউ কি লাভ করেছে? তা সত্ত্বেও তিনি কি কোনদিন শরীয়তের উর্ধ্বে ছিলেন? আবূ বাক্র, উমার, উসমান, আলী ؓ মারেফত পেয়েও কি শরীয়তের গন্ডির বাইরে ছিলেন? কোনও আল্লাহর ওলী কি নামায-রোযা ছেড়ে ফুর্তি মেরে মারফতির দাবী করতে পারেন?

১৬। নিজের ও আল্লাহর মাঝে কোন কিছুকে মাধ্যম (অসীলা) নির্ধারণ করলে; তাকে আহবান করলে, তার নিকট সুপারিশ কামনা করলে এবং তার উপর ভরসা রাখলে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

'উকীল ধর, নচেৎ পার পাবে না।' অথচ আল্লাহই আমাদের উকীল। 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।' আল্লাহর বিচারে উকীল তো দূরের কথা কোন দোভাষীও লাগবে না। তিনি সরাসরি আবেদন শুনে থাকেন, মঞ্জুর ক'রে থাকেন, বিচার করবেন। তাঁর বিচারকে দুনিয়ার অদৃশ্য বিষয়ে অজ্ঞ বিচারকদের বিচারের সাথে তুলনা করা যায় না। কারো শাজারা নামা, টুপী, পাগড়ী, চিঠি কোন কাজে লাগবে না কবরে। কবরে যা কাজে দেবে, তা হল ঈমানের সাথে নেক আমল। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মাইদাহ ৩৫ আয়াত)*

নেক আমলের অসীলা ছাড়া কাউকে অসীলারূপে ভরসা করা চলে না। মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন করে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান বাঁচাবার তওফীক দিন। আমীন।

তওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব

অপরাধী ও পাপী মানুষ সুখী হতে পারে না। কোন কোন পাপে সাময়িক সুখ উপভোগ করা গেলেও পরক্ষণে পাপের পীড়া কামড় দেয়, ফলে মানসিক বিষাদ অনুভূত হতে থাকে পাপীর মনে। পক্ষান্তরে তওবা করলে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে জীবন নবায়িত হয়। জীবনের নতুন খাতা ও নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর তাতে মানুষ সুখী হয়। বেঁচে যায় বহু অশান্তি থেকে। বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

তওবার পর কোন কোন পাপ সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আঘাত খাওয়ার পর মানুষের চেতনা ফেরে। পাপের মাঝে মানুষ শিক্ষা পায় এবং অনেক সময় শাস্তিও পায়। ফলে পরের জীবনকে সে সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর তাতেই আছে মানুষের পরম শান্তি।

নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকলে আল্লাহর তরফ থেকে রুযী আসে। মহান আল্লাহ হযরত নূহ ؑ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "(নূহ বলল,) আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি

তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা।” *(সূরা নূহ ১০-১২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) কর, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। (সূরা হূদ ৩ আয়াত)

আল্লাহর নিকট তওবা, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা সাফল্যের একটি শিরোনাম। আল্লাহ পাক বলেন,

{فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ } (٦٧) سورة القصص

“তবে যে ব্যক্তি তওবাহ করে ও সৎকাজ করে, সে তো অচিরে সফল কাম হবে।” *(সূরা ক্বাস্বাস ৬৭ আয়াত)*

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (٣١) سورة النـــــور

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

পাপ থেকে ফিরার পর তওবার পরশমণির স্পর্শে পাপরাশি পুণ্যরাশিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَاناً (٦٩) إلاَّ مَــنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً } (٧٠)

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি এ সব (মহাপাপ) করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে (জাহান্নামে) তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করবে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। *(সূরা ফুরক্বান ৬৮-৭০ আয়াত)*

বান্দা তওবা করলে আল্লাহ খুশী হন। হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দাস যদি ফিরে আসে তাহলে খুশীর কথাই বটে। আল্লাহর তাতে যদিও কোন লাভ বা উপকার নেই, তবুও তিনি তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে খুশী হন। তওবার ফলে তিনি এত খুশী হন, এত খুশী হন যে, তার উদাহরণ বর্ণনা ক'রে মহানবী ﷺ বলেন, এক মুসাফির তার উঁট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উঁট গায়েব হয়ে গেল। উঁটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পড়ে জেগে উঠে দেখল তার উঁট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উঁট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উঁটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, 'আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!' মহানবী ﷺ বলেন, “(হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) তওবা করলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশী হন!” *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

আল্লাহ চান যে, বান্দা তওবা করুক। আর এ জন্যই দিনে-রাতে হাত বাড়িয়ে রাখেন। তিনি

আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোমরা তওবা কর। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেয়ো না। তিনি সমস্ত গোনাহকে মাফ করে দেবেন। এমন কি ১০০টি খুন করলেও বিশুদ্ধ তওবার ফলে তা মাফ হয়ে যাবে। তিনি বান্দার জন্য তার মায়ের থেকেও বেশী দয়াশীল।

নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব। *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ-এর কোন পাপ ছিল না। তবুও তিনি প্রত্যহ ১০০ বার তওবা করতেন। উম্মতকে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বান্দা পাপ করলে তার হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর তওবা করলে সে দাগ মুছে যায়। নতুবা কালো হতে হতে হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়। আর তখন তার শান্তি থাকে না, স্বস্তি থাকে না।

মুসলিমের জন্য ওয়াজেব; যখন সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে তখন শীঘ্রতার সহিত তওবার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং এ কাজে গয়ংগচ্ছ অথবা ঢিলেমি না করা। কারণ, প্রথমতঃ সে জানে না যে, তাকে কোন ঘড়িতে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ; এক পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে। তাই সত্বর তওবা না করলে হয়তো বা পাপের বোঝা নিয়েই মরতে হয় অথবা পাপের বোঝা আরো ভারি হতে থাকে।

কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম তওবা। তওবা হল- অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি ফিরে আসার নাম।

এই তওবার রয়েছে কয়েকটি শর্ত; সে শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হয় না ঃ-

(১) তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ।

(২) সাথে সাথে পাপ বর্জন করতে হবে।

(৩) বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে।

(৪) পুনরপি মরণ পর্যন্ত তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে।

(৫) কোন মানুষের অধিকার হরণ ক'রে পাপ করলে সে অধিকার আদায় ক'রে তবে তওবা করতে হবে।

(৬) তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } (١٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। পক্ষান্তরে তাদের জন্য তওবা নয়, যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।' আর যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছি। *(সূরা নিসা ১৭-১৮ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! তওবা কেবল মুখে নিয়মিত দুআ পড়ার নাম নয়। তওবা হল পাপ করার মনের অনুশোচনা, লাঞ্ছনা ও দ্বিতীয়বার না করার সঙ্কল্প করার নাম। তওবা সৃষ্টি হয় মনের অনুতাপে মনের ভিতর থেকে আল্লাহর মহাশাস্তির ভয়ে।

তওবা হল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উদ্ভূত অনুশোচনার নাম, যার অন্তর্দাহে মানুষ ততক্ষণ জ্বলতে থাকে, যতক্ষণ না তার প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয়েছে।

যার এমন মন ও সাধনা আছে, সে অবশ্যই সুখী মানুষ। ভুল ক'রে যে তা স্বীকার করে, সে হল শান্তিপ্রিয় মানুষ। অন্যায় ক'রে যে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়, সে নিশ্চয় মহৎ মানুষ।

রুযী ও বর্কতের চাবিকাঠি

ব্রাদারানে ইসলাম! আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই আমাদের রুযীদাতা। যে রুযী পাই সেই রুযীতে বর্কতদাতা তিনি। অনেকের রুযী আছে, রুযী কামায়ের পথ আছে। কিন্তু তবুও যেন, 'নাই নাই, চাই চাই, খাই খাই।' 'হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।' আর তার মানেই হল তার রুযীতে বর্কত নেই। কারণ, রুযীতে বর্কত থাকলে অল্পতে কাজ হয়। অভাব থাকে না। পক্ষান্তরে বর্কত না থাকলে বেশীতেও কাজ হয় না। অভাব ঘোচে না।

বর্কত শুধু রুযীতেই নয়; বরং বর্কত হয়, সংসারের সকল জিনিসের মধ্যে। বাড়ি, গাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, স্বজন, ধন-সম্পদ, শিল্প, ব্যবসা, চাষ, কামাই, ইল্ম, জ্ঞান, দাওয়াতী কর্ম প্রভৃতিতে। আর এ সব কিছুতে বর্কত চাইলে শরয়ী উপদেশ ও পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করুন। ইন শাআল্লাহ বর্কত পাবেন। অবশ্য সেই সাথে কাজ করে যাওয়া আপনার দায়িত্ব।

১। আল্লাহর তাকওয়া মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখুন। এটি এমন একটি ধনভান্ডার যার বর্কতে আপনার জীবনের সব কিছু প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } (٩٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, তাহলে তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বর্কতসমূহের দরজা খুলে দিতাম। *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (٣) الطلاق

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উদ্ধারের পথ সহজ ক'রে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রুযী দান করেন, যে জায়গা থেকে রুযী আসার কথা সে কল্পনাও

করতে পারত না।" *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

২। আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখুন। "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন।" *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)* মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে।" *(আহমাদ)*

৩। অভাব পড়লে মাথা উঁচু রাখুন এবং আল্লাহর কাছে আপনার অভাবের কথা জানান; কোন মানুষের কাছে নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যার অভাব আসে, সে যদি তা মানুষের কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তার অভাব দূর হয় না। কিন্তু যার অভাব আসে, সে যদি তা আল্লাহর কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তিনি বিলম্বে অথবা অবিলম্বে তার অভাব দূর ক'রে দেন।" *(তিরমিযী)*

৪। নিয়মিত কুরআন তিলাঅত করুন। কুরআন হল বর্কতময় জিনিস।

৫। নিয়মিত দুআতে বর্কত প্রার্থনা করুন, অপরকে রুযী দান ক'রে তার কাছে বর্কতের দুআ নিন।

৬। নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকেন। কারণ, তাতে রুযী আসে। মহান আল্লাহ নূহ عليه السلام-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً } (١٢)

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত ক'রে দেবেন নদী-নালা।' *(সূরা নূহ ১০-১২ আয়াত)*

৭। যতটাই রুযী আপনি পান, যে হালেই আপনি থাকেন, সর্বহালেই আপনি রুযীদাতার শুক্‌রিয়া আদায় করুন। কারণ, শুক্‌রে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ } (١٤٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" *(সূরা আলে ইমরান ১৪৪)*

তিনি আরো বলেন,

{لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ } (٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে, আমি অবশ্যই তোমাদের ধন আরো বৃদ্ধি করব। আর কৃতঘ্ন হলে আমার আযাব নিশ্চয়ই কঠিন।" *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুক্‌র আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুক্‌র আদায়ের নিয়ম হল, প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত। দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুক্‌র আদায় করা। তৃতীয়তঃ কাজেও শুক্‌র প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তাঁরই সন্তুষ্টির পথে; গরীব-মিসকীনদের অভাব মোচনের পথে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার

পথে এবং তাঁর শরীয়তকে বাঁচিয়ে রাখার পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুকরী বা কৃতঘ্নতা হয়।

৮। মন থেকে লোভ দূর করুন। কারণ, লোভে বর্কত বিনাশ হয়। মহানবী ﷺ হাকীম বিন হিযাম ﵁-কে বলেন, "হে হাকীম! এ মাল হল (লোভনীয়) তরতাজা ও সুমিষ্ট জিনিস। সুতরাং যে তা মনের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে তা মনের লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।" *(মুসলিম)*

৯। ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য কথা বলুন। মিথ্যা বিলকুল বর্জন করুন। মহানবী ﷺ বলেন, ব্যবসায়ী (ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে) যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

১০। সূদ খাওয়া তথা সর্ব প্রকার হারাম উপার্জন বর্জন করুন। ব্যাংকের সূদও সূদ। অতএব তাও ত্যাগ করুন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৬)* মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

সূদখোর সূদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন, পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বর্কত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ থেকে।

১১। সকাল সকাল কাজ সারুন। ফজরের পর সকালের মাঝে বর্কত আছে। নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।" আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সাহাবী সখ্র ﵁ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ২২৭০নং)*

১২। খাবারে বর্কত পেতে সুন্নাহ অনুযায়ী খান। মহানবী ﷺ বলেন, "খাবারের মধ্যভাগে বর্কত নামে। অতএব তোমরা মাঝখান থেকে খেয়ো না।" *(বুখারী)*

১৩। আপনার কাছে যেটুকুই মাল আছে, তা থেকে কিছু করে দান করুন। আর মোটেই বখীলী (কার্পণ্য) করবেন না। কারণ, দানে মাল বর্কত লাভ করে এবং কার্পণ্যে মাল ধ্বংস হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা (আল্লাহর পথে) খরচ কর, আল্লাহ তার স্থলে আরো প্রদান করে থাকেন।" *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তান! 'তুমি (অভাবীকে) দান কর, আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে)

অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

"যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে--আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না--সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে তখন বলবে, 'অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।" *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ১০৩২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

১৪। (দ্বীন-শিক্ষার্থী) তালেবে ইল্মকে ইল্ম তলবে সহায়তা করুন। ইল্ম অনুসন্ধানে তাকে অর্থ দিয়ে যথার্থ সহযোগিতা করুন। তাতেও আপনার শিল্প, বাণিজ্য ও জীবিকায় বর্কত আসবে। আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাদীস ও ইল্ম শিক্ষা করত। অপরজন কোন হাতের কাজ ক'রে অর্থ উপার্জন করত। একদা এই শিল্পী ভাই নবী ﷺ এর নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, 'তার ঐ (তালেবে ইল্ম) ভাই তার শিল্পকাজে কোন প্রকার সহায়তা করে না।' তা শুনে তিনি তাকে উত্তরে বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি ওরই (ইল্ম শিক্ষার বর্কতে) রুযী পাচ্ছ!" *(তিরমিযী ২৩৪৬, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৯নং)*

ব্রাদারানে ইসলাম! আপনি যদি বর্কত ও প্রাচুর্যের অধিকারী হতে চান, তাহলে শরয়ী এই সকল পদ্ধতি পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাদের রুযী-রোযগারে বর্কত দিন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

ফিরিশ্তা যাদের জন্য দুআ করেন

মানুষ আল্লাহর কাছে নিজে দুআ করে এবং অপরের কাছে দুআ পাওয়ারও আশা করে। আবার

সেই ব্যক্তিত্বের কাছে দুআর বেশী আশা করা হয়, যাঁর দুআ মকবূল, যিনি অধিক পরহেযগার, যাঁর আমল অতি সুন্দর। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে পূত-পবিত্র চরিত্রের সৃষ্টি হল ফিরিশ্তা। ফিরিশ্তার কেবল পুণ্য আছে, পাপ নেই। নেক আমল আছে, কোন প্রকারের বদ আমল নেই। অতএব তাঁদের দুআ কত পবিত্র, কত গ্রহণযোগ্য তা অনুমান করা যায়।

এ সংসারে কিছু ভালো মানুষ আছে, যারা আল্লাহর ফিরিশ্তার দুআ পেয়ে থাকে। তারা হল নিম্নরূপ ঃ-

(১) যে ঈমান রাখে ও আল্লাহর কাছে তওবা করে তাঁর পথের অনুসরণ করে ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শে ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আপনি তাদেরকে (পাপ থেকে দূরে রাখুন) শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, তার প্রতি আপনি তো দয়াই করবেন। আর সেটা হবে মহাসাফল্য।" *(সূরা মু'মিন ৭-৯ আয়াত)*

(২) যে ওযূ অবস্থায় রাত্রে শয়ন করে ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশ্তাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশ্তা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা ক'রে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

(৩) যে নামাযের অপেক্ষা করে ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।" *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ৬৪৯নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে, যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশতাবর্গ বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।' (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।"

(৪) যে নামাযের জামাআতে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য দুআ ক'রে থাকেন।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৪৮৯নং)*

(৫) যে নামাযের কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশতাবর্গ তাদের জন্য দুআ ক'রে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।" *(ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

(৬) যে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর 'আমীন' বলে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায য়া-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলে থাকেন। আর ইমামও 'আমীন' বলে।

(অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়- (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা একই সাথে হয়---তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাঊদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

(৭) যে নামাযের পর নামাযের জায়গায় বসে থাকে ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৮) যে এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং দিনের ফিরিশ্তা থেকে যান। অনুরূপ আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং রাতের ফিরিশ্তা থেকে যান। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা নামায পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম তখনও তারা নামায পড়ছিল, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ ক'রে দিন।" *(আহমাদ ৯১৪০নং, ইবনে খুযাইমা ১/ ১৬৫, ইবনে হিব্বান)*

(৯) যে আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পাঠ করে ঃ

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবী!) পৃথিবীর বুকে যে কোন মুসলিম তোমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করব এবং আমার ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য ১০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৬২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফিরিশ্তা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৬৬৯নং)*

(১০) যার জন্য তার কোন ভাই তার পিছনে দুআ করে এবং যে তার কোন ভায়ের জন্য তার পিছনে দুআ করে ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও মুসলিম বান্দা যখন তার অনুপস্থিত কোন ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই ফিরিশ্তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "অনুপস্থিত ভায়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফিরিশ্তা থাকেন। যখনই সে তার ভায়ের জন্য কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩২নং)*

(১১) যে সৎপথে নিজের অর্থ-সম্পদ দান করে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে)

অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

(১২) যে রোযাদার সেহরী খায় ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেহরী খাওয়াতে বর্কত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩৬৮৩নং)*

(১৩) যে কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেয় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহ্বানকারী আহ্বান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায় তখনই তার সহিত ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সহিতও ৭০ হাজার ফিরিশতা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" *(আহমদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৭১৭ নং)*

(১৪) যে কোন মরণোন্মুখ রোগীর সামনে ভালো কথা বলে ঃ মহানবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা কোন রোগী বা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন ভালো কথাই বলো। কেন না, তোমরা যা বলবে তার উপর ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন-আমীন' বলবেন।" *(মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ)*

(১৫) যে মানুষকে ভালো জিনিস শিক্ষা দেয় ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, "আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপীলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ ক'রে থাকে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

নারী-শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামের আগে জাহেলী যুগে মেয়েদের কোন কদর ছিল না, তাদের তেমন কোন অধিকার ছিল না, মীরাসে তাদের কোন অংশ ছিল না। সে যুগে শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ঘরে মেয়ে জন্ম নিলে ঘর-ওয়ালা লজ্জাবোধ করত। লোকের সামনে মুখ দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করত। শরমে মনে হতো যেন সে মাটির তলায় তলিয়ে যায়। দুঃখে, রাগে ও ক্ষোভে তার চেহারা কালো হয়ে যেত!

ইসলাম এল এবং রমণীর মান ফিরিয়ে দিল। নারীকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করল। যত বড়ই মহাপুরুষ হোক, তার জন্মদাত্রী হল একজন নারী, আর সে হল তাঁর মা। সেই মায়ের পায়ের তলায় তাঁর বেহেশ্ত নির্ধারিত করা হল।

দুনিয়াতে এমন কোন মহাপুরুষ নেই, যার পিছনে কোন নারীর কৃতিত্ব নেই। নারী হল পুরুষের সহোদরা। নারীর যথার্থ ও ন্যায় সংগত অধিকার আছে ইসলামে। এই পৃথিবীর সুখের

সংসার উদ্যানে নারী হল সুশোভিত পুষ্পমালার সৌন্দর্য ও সৌরভ। এ চলমান সংসার গাড়ির দুই চাকার একটি চাকা হল নারী। এ আলোময় উজ্জ্বল পৃথিবীর আলো দানে দুটি বৈদ্যুতিক তারের একটি হল নারী।

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।--
এ জগতে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।--
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।"

নারীর কদর করেছে ইসলাম। নারীর মর্যাদা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। পূর্ণ কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি সূরার নামই হল 'নিসা' (রমণীগণ)। আরো একটি সূরার নামকরণ হয়েছে নারীরই নাম দ্বারা, যাকে সূরা মারয়্যাম বলা হয়। নারীকে কেন্দ্র ক'রে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা মুজাদালাহ, মুমতাহিনাহ, ত্বালাক্ব, তাহরীম প্রভৃতি। সাত আসমানের উপর থেকে খাওলা নামক মহিলার বাদানুবাদ ও ফরিয়াদ শুনে মহান আল্লাহ তাঁর শানে সূরা অবতীর্ণ করেছেন।

ইসলামী ইতিহাসে মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কত নারী ছিলেন ফকীহা, মুহাদ্দিসাহ, আলেমাহ, আবেদাহ, কবি ও লেখিকা। কে না জানে বিবি আসিয়া ও মরিয়মের কথা? কে না মানে মা খাদীজা, আয়েশা ও অন্যান্য মহিয়সীদের কৃতিত্ব?

একটি নারী হল পুরুষের বোন, পুরুষের কন্যা। নারীকে আল্লাহ পুরুষের জন্য শান্তিদাত্রী ক'রে সৃষ্টি করেছেন। নারীর সৃষ্টি-বৈচিত্রে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

নারীর প্রতি যত্ন নিতে ইসলাম পুরুষকে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে। শিশুকন্যাকে প্রতিপালন করার বিরাট সওয়াব ঘোষণা করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমাদ ৩/ ১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দু'টি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে

দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ ক'রে তার দু'টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।" *(বুখারী ১৪১৮নং, মুসলিম ২৬২৯নং)*

ইসলামের পূর্ব যুগে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ } (٥٩) سورة النحل

অর্থাৎ, তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। *(সূরা নাহল ৫৮-৫৯ আয়াত)*

জাহেলী যুগের মতো আজও অনেক মানুষের কাছে কন্যাসন্তান অবহেলিতা, বঞ্চিতা ও অবাঞ্ছিতা। যেহেতু নারী মেরুদন্ডহীন প্রাণী, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং অধিকাংশ সময়ে সে কোন না কোন পুরুষের মুখাপেক্ষিণী, সেহেতু ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতি সুনজর দিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তার প্রতি যত্ন নেওয়াতে বৃহৎ প্রতিদান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইসলাম নারীর প্রতি সদয় ও মঙ্গলকামী হতে পুরুষকে আদেশ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (١٩)

অর্থাৎ, আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সহিত সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*

তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। ---তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮নং)*

বিদায়ী হজ্জের ভাষণেও তিনি নারী সম্পর্কে সতর্ক করে পুরুষকে বিশেষ অসিয়ত করে যান।

সুন্দর সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা কোন উদ্ধত ছাড়া অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। নারী হল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। নারী হল সন্তানের পালয়িত্রী। নারী পুরুষ দরজার চৌকাঠ। নারী হল সমাজের অর্ধাংশ। অন্য অর্ধাংশের জন্মদাত্রী হল নারীই। সুতরাং নারীই হল পূর্ণ সমাজ। নারী হল শিশুদের প্রথম মাদ্রাসা ও স্কুল এবং মহা বিশ্ববিদ্যালয়।

মায়ের হাতেই গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

'আমাকে একটি শিক্ষিতা মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব।' আমাকে একটি দ্বীনী-শিক্ষিতা মা দিন, আমি আপনাকে একটি সুসভ্য সমাজ দেব। আসলে মায়ের শিক্ষার সাথে সন্তানের শিক্ষার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ট, অনেক নিবিড়।

নারীর হাতে তা'লীম ও তারবিয়াতের প্রথম ভূমিকা রয়েছে। আর আমাদের মহানবী ﷺ প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) জন্য জ্ঞান শিক্ষাকে ফরয ঘোষণা করেছেন। আর সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ করার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের উপর, যাঁদেরকে আল্লাহ তওফীক দান করেছেন।

আসুন আমরা যে যেভাবেই পারি, নারী শিক্ষার দায়িত্ব পালন করি, নারীর প্রতিপালনের ভূমিকা পালন করি, পর্দা ও আবরু বজায় রেখে যাতে তারা উচ্চ-শিক্ষিতা হতে পারে, তার প্রচেষ্টা চালাই, যাঁরা এ কাজে নেমেছেন তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অসৎকাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না।" *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

জানার সাথে মানার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } (٣) سورة العصر

অর্থাৎ,মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।*(সূরা আস্র)*

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ }

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(মুল্ক ২ আয়াত)*

আহলে সুন্নাহ অল-জামাআর নিকট ঈমান হল তিনটি বস্তুর সমষ্টির নাম; প্রথমতঃ অন্তরে বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ মুখে স্বীকার এবং তৃতীয়তঃ কাজে পরিণত করার নাম। কাজে পরিণত না করলে ঈমান অসম্পূর্ণ। সুতরাং কেউ যদি অন্তরে না রেখে মুখে স্বীকার করে এবং আমলেও কোন কোন সময় প্রদর্শন করে, তাহলে সে মুনাফিক। আর কেউ অন্তর ও মুখে ঈমান এনে কাজে পরিণত না করে, ফরয বা ওয়াজেব অস্বীকার করে, সে কাফের। অবশ্য অস্বীকার না ক'রে যদি অবহেলায় আমল ত্যাগ করে, তাহলে সে ফাসেক।

শরীয়ত এসেছে, তার উপর আমল করার জন্য। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য। হাদীস রয়েছে মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু তা যদি মনে ও মুখে থাকে এবং কাজে না থাকে, তাহলে তার মূল্য কি? ফুল-ফলহীন গাছের মূল্য আর কতটুকু? আয়নার পারা খসে পড়লে তার দাম কি?

আমলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রে মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; (১) তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? (২) তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? (৩) তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং (৪) কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর (৫) যে ইল্‌ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

আমল ছাড়া আল্লাহর কাছে বংশ, সম্মান বা অন্য কিছুর কোন মর্যাদা নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষের আমল নেই বলেই ইসলামের পূর্ণ রূপ মলিন হয়ে আছে। আমল নেই দেখেই আফশোস করে কবি বলেছেন, 'ইসলাম দার কিতাব অ মুসলিম দার গোর।' অর্থাৎ, ইসলাম আছে কিতাবের মাঝে মুসলিম আছে গোরে। আর কবি নজরুলের ভাষায়, 'ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান।' তার মানে আসল ইসলাম কুরআন-হাদীসে সীমাবদ্ধ আছে এবং খাঁটি মুসলিম সাহাবা-তাবেঈনগণ গোরস্থানে সমাধিস্থ আছেন। বর্তমান সমাজে তাঁদের নজীর মেলা ভার।

পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আমল করে, কিন্তু সেই আমলে ইখলাস থাকে না, বরং রিয়া বা লোকপ্রদর্শন থাকে অথবা সে আমল তরীকায়ে মুহাম্মাদী অনুযায়ী হয় না। ফলে সে আমলও কোন কাজে লাগে না। অনেক সময় আখেরাতের সেই আমল দ্বারা দুনিয়া কামানো উদ্দেশ্য হয়। আর তাতে লাভ কি?

হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!' তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(মুস্বান্নাফ আব্দুর রায্যাক, সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

কিছু মানুষ আছে, যারা ইল্‌ম শিক্ষা করে অথচ সেই অনুযায়ী আমল করে না। বরং অপরকে শিক্ষা দেয় এবং অপরকে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু নিজে তাতে উদ্বুদ্ধ হয় না। যে সরষেয় ভূত ছাড়বে, সেই সরষেয় ভূত পেয়ে বসে আছে। যে বেড়া ক্ষেতের হিফাযতের জন্য দেওয়া হয়েছে সেই বেড়াই ক্ষেত খায়। অনেক বারুই অন্যের চাল ছুইয়ে বেড়ায় কিন্তু বারুয়ের নিজের চালই ফুটো, তার খেয়াল নেই। অনেকে অপরকে আলো দেখাবার জন্য চেরাগ জ্বেলে রেখেছে কিন্তু তার সেই চেরাগ তলে অন্ধকার। অনেক চিকিৎসক অপরের চিকিৎসা করে, কিন্তু সে নিজের চিকিৎসা নিজে করে না। এই শ্রেণীর লোকও বড় ক্ষতিগ্রস্ত। এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না?" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪)* "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা নিজে কর না তা তোমরা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা নিজে কর না, তা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ্ ২-৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না, তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।" *(আহমাদ ৩/ ১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!" *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

অতএব ব্রাদারানে ইসলাম! এমন কোন সদাচরণের জন্য লোককে আদেশ দেবেন না, যা আপনি নিজে করেন না। কারণ, তা করা বড় লজ্জাকর ব্যাপার। উপদেশ করলে নিজেকে সর্বাগ্রে করুন। নিজে নমুনা ও আদর্শ হয়ে আদেশ করলে তবেই আপনি হবেন অনুসরণীয়।

আলী ﷺ বলেন, 'তুমি তার মত হয়ো না যে বিনা আমলে পরকালের সুখ আশা করে এবং দীর্ঘ কামনার জন্য তওবায় দেরী করে। দুনিয়া সম্বন্ধে বৈরাগীর মত কথা বলে, অথচ কাজ করে দুনিয়াদারের মত। পার্থিব সম্পদ পেলে তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। মানুষকে সেই কথার উপদেশ দেয় যা সে নিজে পালন করে না। নেক লোকদের ভলোবাসে, কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণা করে, অথচ সে তাদেরই একজন। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করে এবং যার জন্য মরণকে ভয় করে, তাতেই সে অবিচল থাকে!'

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে জনসাধারণের ইমাম বা নেতা মনে করে তার উচিত, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া এবং মুখের দ্বারা আদব দেওয়ার পূর্বে কর্ম, আচরণ ও চরিত্র দ্বারা আদব দান করা।'

সত্যই তো বীরের মত প্রতিজ্ঞা আর ভীরুর মত কাজ দেখালে নিজের মূল্য থাকে কোথায়?

জানেন তো ভাইজান! আদর্শচ্যুত আমলহীন আলেমের উপমা হল সেই দৃষ্টিহীন লোকের ন্যায়, যে অন্ধকার রাত্রিতে হাতে চেরাগ নিয়ে পথ চলে। কিন্তু একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলে সে কি বলতে পারে? একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি অপর একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কি জাগ্রত করতে পারে? অতএব কখন আপনার ঘুম ভাঙ্গবে ভাইজান?

'এখনো ঘুমাও তুমি শতরূপা এই কুসুমের মাসে নির্মুকুল!'

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

ঈসালে সওয়াব

মরণের পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষণে সকল ফসল বোনার সময় শেষ, এবারে বোনা ফসল কাটার সময়। যারা বোনার সময় গড়িমসি ক'রে কাটিয়েছে তারা এখানে এসে দেখবে, তাদের জমিতে ফসল নেই। রয়েছে জমিভরা আগাছা অথবা আগছা মিশ্রিত ফসল। তাদের জন্য রয়েছে বড় আক্ষেপ, কবরের ফিতনা ও আযাব।

আগুনের মাঝে অথবা বন্যা স্রোতের মাঝে পড়ে যেমন কোন মানুষ বাঁচার জন্য আকুল ফরিয়াদ করে, তেমনি কবরে গিয়ে পাপী মানুষও যেন সাহায্যের আশায় চেয়ে থাকে। জীবিত আত্মীয়-স্বজনরা তাদের যথার্থ সাহায্য সামগ্রী নিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারে।

অবশ্য সেই সাহায্য পাঠাতে হবে সরকারী ডাকে এবং সরকারী নিয়মে। নচেৎ বেসরকারী ডাক ও নিয়মে সাহায্য পাঠালে তা সঠিক ঠিকানায় না পৌঁছে 'মেহনত বরবাদ ও গোনাহ লাযেম' হয়ে যাবে। আবার যেখানে 'দই'এর প্রয়োজন সেখানে 'খই' অথবা 'চুন' পাঠালে সাহায্যপ্রার্থী কোন উপকার পাবে না।

মৃত ব্যক্তি যে সব আমল দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মুসলিম তার সেই মধ্যজগৎ হতে আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভায়ের দুআয় উপকৃত হয়ে থাকে। দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে দুআ তার কাজে দেবে। কুরআন মাজীদে মৃতের জন্য দুআর কথা উল্লেখ হয়েছে ; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٠) سورة الحشر

অর্থাৎ,---যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী (বিগত) আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। *(সূরা হাশর ১০ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানাযার নামায ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ এ কথার সাক্ষী। যার প্রায় সবটাই মাইয়্যেতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরন্তু মহানবী ﷺ এ কথাও বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির কোন ভায়ের জন্য তার অদৃশ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফিরিশ্তা নিয়োজিত থাকেন। যখনই দুআকারী তার (অদৃশ্য বা অনুপস্থিত) ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন। আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪নং প্রমুখ)*

২। মাইয়্যেতের নযর-মানা রোযা যদি তার অভিভাবক কাযা রেখে দেয়, তবে তার সওয়াব তার উপকারে আসবে।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় সে ব্যক্তির তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।" *(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭নং, প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ

তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আবু দাউদ ৩৩০৮-নং, আহমাদ ২/২ ১৬ প্রমুখ)*

তদনুরূপ রমযানের রোযা কাযা করে মারা গেলে তার বিনিময়ে তার অভিভাবক ফিদ্য়্যাহ (প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি মিসকীনকে একদিনের খাদ্য অথবা ১ কিলো ২৫০ গ্রাম করে চাল) দিলে তার সওয়াবও মাইয়্যেতের জন্য উপকারী।

আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা করে দেব কি?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ করে দাও।' *(ত্বাহাবী ৩/ ১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।' *(আবু দাউদ ২৪০১নং প্রমুখ)*

৩। মাইয়্যেতের তরফ থেকে আত্মীয় বা যে কেউ তার ছেড়ে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করলে সে কবরে উপকৃত হয়।

৪। মাইয়্যেত হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেলে, অথবা হজ্জ ফরয হওয়ার পর কোন ওযরে না করে মারা গেলে যদি তার ওয়ারেসীনদের কেউ (যে নিজের ফরয হজ্জ আগে পালন করে থাকবে) তার তরফ থেকে তা পালন করে তবে এর সওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ ক'রে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

অনুরূপ এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা বড় বৃদ্ধ। তার ফরয হজ্জ বাকী আছে। এখন সওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার তরফ থেকে হজ্জ ক'রে দেব?' নবী ﷺ বললেন, " 'হ্যাঁ।' ক'রে দাও।" *(মুসলিম ১৩৩৪-১৩৩৫নং প্রমুখ)*

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ্জ না করে মারা গেছে তার তরফ থেকে হজ্জ আদায় কোন কাজে দেবে না। *(আহকামুল জানাইয ১৭১পৃঃ, টীকা)*

৫। মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সওয়াবও মোটেই কম হয় না। কারণ, সন্তান হল পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত ধনের ন্যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায়; যা সে করে। *(সূরা নাজ্ম ৩৯ আয়াত)*

আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ সবচেয়ে হালাল বস্তু যেটা ভক্ষণ করে তা হল তার নিজ উপার্জিত খাদ্য। আর তার সন্তান হল তার নিজ উপার্জিত ধন স্বরূপ।" *(আবু দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী*

১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪, ইবনে মাজাহ ২১৩৭নং প্রমুখ)

তাই সন্তান যদি তার পিতা-মাতার নামে দান করে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করে অথবা হজ্জ করে, তাহলে এসবের সওয়াবে তারা উপকৃত হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সা'দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?' নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।' (বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ)

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" (আবূ দাউদ ২৮৮৩নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)

৬। মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া স্বকৃত প্রবাহমান ইষ্টাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সাদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, কল-কুঁয়া প্রভৃতি তৈরী, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে--সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যজগতেও ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ}

অর্থাৎ, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম আর যে কীর্তিসমূহ পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন ১২আয়াত)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকাহ জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্‌ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিলম ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩নং প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন, "মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হল; এমন ইল্‌ম যা সে শিক্ষা করেছে এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তানও মুসহাফ (কুরআন শরীফ), তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফির খানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকাহ যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।" (ইবনে মাজাহ ২৪২নং)

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে ক'রে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ঈসালে সওয়াব করবে---তার ভরসা কোথায়?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সওয়াব করলে তা বেসকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভড্‌' হবে না। (আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, ঈসালে সওয়াবের জন্য দান খয়রাত বা দুআর জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ বা মজলিস

নেই। নির্দিষ্ট দিনে অথবা জুমআহ, ঈদ বা তথাকথিত শবেবরাতের দিন বা রাতে বিশেষ করে সাদ্‌কা বা দুআ করা অথবা এর জন্য লোক জমায়েত করে মজলিস করা বিদআত। অনুরূপভাবে মাইয়্যেত জীবিতকালে যে জিনিস খেতে অধিক পছন্দ করত সেই জিনিসই বিশেষ করে সদকা করা বিদআত।

অনেকে ফাতেহাখানী, কুলখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি ক'রে তার সওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আম্বিয়াদের নামে) বখ্‌শে দেয়---যাঁরা সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও ফালতু বৈ কি?

অভিশপ্ত মানুষ

ব্রাদারানে ইসলাম! এ দুনিয়ায় বহু মানুষ আছে, যারা আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা, রসূল ﷺ ও মানুষের কাছে অভিশপ্ত। তাদের বিবরণ এই রূপঃ-

১। শয়তান আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত ঃ মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছিলেন, "তুমি এখান (জান্নাত) হতে বের হয়ে যাও নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার চিরস্থায়ীভাবে লানত কিয়ামত পর্যন্ত।" (সূরা স্বাদ ৭৭-৭৮ আয়াত)

২। যারা কাফের, তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিশাপ করেছেন। আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব ৬৪ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন, "যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মরেছে নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশ্তাগণের ও মানবসমূহের অভিসম্পাত।" (সূরা বাকারাহ ১৬১ আয়াত)

৩। যারা মুনাফিক (কপট) মুসলমান, তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটিই ওদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ ওদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্য আছে চিরস্থায়ী শাস্তি।" (সূরা তাওবাহ ৬৮- আয়াত)

৪। ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গ অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "এ পৃথিবীতে ওদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও ওরা অভিশাপগ্রস্ত হবে।" (সূরা হূদ ৯৯ আয়াত)

৫। যারা আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) অস্বীকার করে, রাসূলকে অমান্য করে এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করে, তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত। (সূরা হূদ ৫৯-৬০ আয়াত)

৬। যারা হিলা-বাহানা ক'রে আল্লাহর বিধান লংঘন করে, চালাকি করে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তারা অভিশপ্ত। (সূরা নিসা ৪৭ আয়াত)

৭। খুনী লোক অভিশপ্ত ঃ মহান আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হল জাহান্নাম। তাতে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন ও তাকে অভিসম্পাত করবেন। আর তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন।" (সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)

৮। আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গকারী অভিশপ্ত ঃ

৯। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদনকারী অভিশপ্ত ঃ

১০। সন্ত্রাসী ও শান্ত পরিবেশে ফাসাদ সৃষ্টিকারী অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অভিসম্পাত। আর তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।" *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশাপ, আর করেন বধির ও অন্ধ।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত)*

১১। যারা কথায় বা কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।" *(সূরা আহযাব ৫৭ আয়াত)*

১২। ইল্‌ম ও শরীয়তের জ্ঞান গোপনকারী অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলে, "আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐসবগুলোকে সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।" *(সূরা বক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

১৩। যারা অপরের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ দেয়, তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" *(সূরা নূর ২৩ আয়াত)*

১৪। যারা রসূলের পথ অপেক্ষা অন্য পথকে উত্তম মনে করে, তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত করা হয়েছে তারা তাগূত ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলে যে, বিশ্বাসী স্থাপনকারীগণ থেকে তারাই (কাফেররা) অধিকতর সুপথগামী। এদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।" *(সূরা নিসা ৫১-৫২ আয়াত)*

১৫। যারা অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। যারা গর্হিত কাজ করা দেখেও একে অন্যকে বারণ করে না, তারা অভিশপ্ত। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯আয়াত)*

১৬। সূদখোর, সূদদাতা ও তার যে কোন প্রকারে সহায়ক ব্যক্তি অভিশপ্ত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন, "ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৭ নং)*

১৭। যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টাল-বাহানাকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত ঃ

আব্দুল্লাহ বিন মসউদ ؓ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে অভিশপ্ত।" *(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

১৮। পরের মাল চুরি করে যে, সে চোর অভিশপ্ত। *(মুসলিম ১০৪৫ নং)*

১৯। যে ব্যক্তি কবরের কাফন চুরি করে, সে অভিশপ্ত। *(বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫১০৩নং)*

২০। মাতাল ও মদ প্রস্তুতকারক তথা তার যে কোন প্রকারে সহায়ক ব্যক্তি অভিশপ্ত ঃ ইবনে উমার ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে,

তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

২১। যে ব্যক্তি জমি-জায়গার চিহ্ন সরিয়ে নিজের অংশ বেশী করে, সে অভিশপ্ত ঃ

২২। যে ব্যক্তি নিজের মা-বাপকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত ঃ

২৩। যে ব্যক্তি কোন মূর্তি বা মাজারের উদ্দেশ্যে মুরগী-খাসী বা অন্য কিছু যবাই করে, সে অভিশপ্ত ঃ

২৪। যে ব্যক্তি কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন, যে তার মা-বাপকে অভিশাপ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন, যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন, যে জমির চিহ্ন বদলে দেয়।" *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহুল জামে ৫১১২নং)*

২৫। যে অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টি করে, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টি করে অথবা কোন অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টিকারীকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সকল মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে কোন ফরয-নফল নামায ও ইবাদতই (অথবা তওবা ও মুক্তিপণ কিয়ামতে) কবুল করা হবে না।" *(বুখারী, মুসলিম ১৩৭০ নং)*

২৬। যে ব্যক্তি কোন জ্যান্ত প্রাণীকে নিশানা বানিয়ে তীর বা বন্দুক চালানো শিখে ঃ

ইবনে উমার বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮ নং)*

২৭। পুরুষের বেশধারিণী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষ অভিশপ্ত ঃ

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষ বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫নং, আসহাবে সুনান)*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫০৯৫নং)*

২৮। যে মহিলা মাথায় পরচুলা (টেসেল) বাঁধে, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বললেন, "পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেওয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আসমা (রাঃ) বলেন, 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

২৯। যে সকল মহিলা (হাত বা চেহারায়) দেগে নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে, সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলা অভিশপ্ত। *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

৩০। বিপদের সময় অধৈর্য প্রকাশ ক'রে যে অস্বাভাবিক আচরণ করে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী (কান্নার সময়) মুখমন্ডল খামচায়, বুকের কাপড় ফাড়ে এবং ধ্বংস

ও সর্বনাশ ডাকে তার উপর আল্লাহ অভিশাপ করেন।" *(সহীহুল জামে' ৪৯৬৮)*

৩১। বিপদের সময় যে উচ্চ স্বরে কান্না করে, কাপড় ছেঁড়ে বা মাথা নেড়া করে, সে অভিশপ্ত ঃ *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

৩২। অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলা অভিশপ্ত। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে ৫১০৯নং)*

৩৩। যারা সমকাম (পুরুষে-পুরুষে বা মহিলায়-মহিলায় যৌন-মিলন) করে, তারা অভিশপ্ত ঃ

৩৪। যে পশু-সঙ্গম করে, সে অভিশপ্ত ঃ

৩৫। যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করে, সে অভিশপ্ত ঃ *(আহমাদ, আবু দাউদ, সহীহুল জামে ৫৮৮৯নং)*

৩৬। যে স্ত্রী স্বামীর যৌন-আহবানে সাড়া না দিয়ে স্বামীকে রাগান্বিত ক'রে রাত্রিযাপন করে, সে অভিশপ্ত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামী যখন নিজ স্ত্রীকে (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) তার বিছানার দিকে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে, আর এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফিরিশ্তামন্ডলী সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকেন।" *(বুখারী ৫১৯৩, মুসলিম ১৪৩৬, আবু দাউদ ২১৪১নং, নাসাঈ)*

৩৭। মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারী অভিশপ্ত। *(বুখারী ২২৩৮, আবু দাউদ ৩৪৮৩নং)*

৩৮। যে অন্ধকে ভুল পথ নির্দেশ করে, সে অভিশপ্ত ঃ *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৫৮৯১নং)*

৩৯। যে ব্যক্তি পশুর চেহারা দাগে, সে অভিশপ্ত ঃ

একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ বেয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন, যে একে দেগেছে।" *(মুসলিম ২১১৬নং)*

৪০। যে ব্যক্তি কবরকে সিজদাগাহে পরিণত করে, সে অভিশপ্ত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন যে, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

৪১। যে পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে এবং নিজের বংশ অস্বীকার করে, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবু দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, "এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

৪২। যে কোন সাহাবীকে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৪০নং)*

৪৩। যে ঘুষ দেয় ও ঘুষ নেয়, সে অভিশপ্ত। *(আবু দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবু দাউদ ৩০৫৫নং)*

৪৪। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত। *(ত্বাবারানী, বাযযার, সহীহ তারগীব ২৫৫৮নং)*

৪৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে পার্থিব কিছু চায় এবং যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বৈধ কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা দেয় না, সে অভিশপ্ত।

মহানবী ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে কিছু দান করে না; যদি সে অবৈধ কিছু না চেয়ে থাকে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৪১নং)*

৪৬। যে ব্যক্তি নিজের ৩ তালাক দেওয়া বিবিকে হালাল করবার উদ্দেশ্যে এক রাতের জন্য অপরের সাথে তার বিয়ে দেয় এবং যে বিয়ে ক'রে (হালালাহ বা হিল্লে করে), সে অভিশপ্ত ঃ *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে ৫১০১নং)*

৪৭। যে ব্যক্তি জনসাধারণের ঘাটে, মাঝ রাস্তায় বা ছায়ায় পায়খানা করে, সে অভিশপ্ত ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১নং)*

৪৮। যে রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩নং)*

৪৯। যে ব্যক্তি অস্ত্র উঠিয়ে মুসলিম ভাইকে সন্ত্রস্ত করে, সে অভিশপ্ত ঃ

আবুল ক্বাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত ক'রে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

৫০। প্রত্যেক যালেম ও অত্যাচারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। *(সূরা হূদ ১৮ আয়াত)*

৫১। মহানবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ব্রাদারানে ইসলাম! উদ্দেশ্য বিহীন কাজ পাগলের, নিয়তবিহীন কাজ পন্ড।

কলম কি জন্য সৃষ্টি হয়েছে? কাগজ কি জন্য সৃষ্টি হয়েছে? জুতা কি জন্য তৈরী করা হয়েছে? আপনি কি জন্য সৃষ্টি হয়েছেন?

'এসেছি, তবে জানি না আমি এসেছি কোথা হতে,
চোখের সামনে পথ দেখেছি চলিতেছি সেই পথে।
এমনি ভাবে চলতে র'ব ইচ্ছে আমার যত,
কোথায় যাব তাও জানিনে পথই বা আর কত?'

ট্রাফিক পুলিশ একজন গাড়ি-চালককে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' সে উত্তরে বলল, 'জানি না।' পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?' সে বলল, 'জানি না।' পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন এসেছেন বা এদিকে কি জন্য যাবেন?' সে বলল, 'কি জানি?' পুলিশ বলল, 'কেন জানেন না?' সে বলল, 'তাও জানি না!'

নিশ্চয় পুলিশ তাকে পাগল ভাববে এবং তাকে আটক ক'রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মানুষ একটি সম্মানিত জীব। মহান আল্লাহ তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও মর্যাদা দিয়েছেন। তাকে তার প্রয়োজনীয় ঈমান, জান, জ্ঞান, মান ও ধন দান ক'রে তার হিফাযতের ব্যবস্থা করেছেন

এবং তার জন্য জীবন-ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন।

কিন্তু যারা যে সে জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, তাদেরকে আপনি কি মনে করেন? কোন্ জীবের সাথে তাদেরকে তুলনা করবেন? আপনি-আমি যাই বলি আর না-ই বলি না কেন, অথবা বলতে ভয় ও দ্বিধা করি না কেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বলেই দিয়েছেন, 'তারা হল পশুর ন্যায়।' মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} (١٢) سورة محمد

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। আর তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। *(সূরা মুহাম্মাদ ১২ আয়াত)*

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (١٧٩)

অর্থাৎ, আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন। *(সূরা আ'রাফ ১৭৯ আয়াত)*

তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের ঈমান নেই, বিশ্বাস নেই। তাই তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর তাই তারা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} (٢٤) سورة الجاثية

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল ধারণা করে মাত্র। *(সূরা জাসিয়াহ ২৪ আয়াত)*

কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যিই কি মানুষ এমনিই সৃষ্টি হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই? মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} (٣٦) سورة القيامة

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? *(সূরা ক্বিয়ামাহ ৩৬ আয়াত)*

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} (١١٥) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? *(সূরা মু'মিনূন ১১৫ আয়াত)*

না, মানুষকে আল্লাহ এমনি সৃষ্টি করেননি। এ আকাশ-বাতাস, এ মাটি-পানি, এ বৃক্ষ-প্রাণী মহান সৃষ্টিকর্তা ফালতু সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}

অর্থাৎ, আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। *(স্বাদ ২৭)*

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} (٣٨) سورة الدخان

অর্থাৎ, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি

করিনি। *(সূরা দুখান ৩৮ আয়াত)*

মানুষদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী মানুষ, কেবল তাঁরাই সে উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً} (١٩١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি।....' *(সূরা আলে ইমরান ১৯১ আয়াত)*

আরবী কবি বলেন,

ولو أنَّا إذا متنا تركنا   لكان الموت غاية كل حي

ولكنا إذا متنا بعثنا   ونسأل عن كل شيء.

অর্থাৎ, যদি মরণের পর আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে মরণই প্রত্যেক জীবের জন্য আরামদায়ক হত। কিন্তু মরণের পর আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইলম্ সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

তাহলে উদ্দেশ্য কি? আমরা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছি? মহান আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} (٧) سورة هود

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা ক'রে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে? *(সূরা হূদ ৭ আয়াত)*

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (٧) سورة الكهف

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। *(সূরা কাহফ ৭ আয়াত)*

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) سورة الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(সূরা মুলক ২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতের ব্যাপারে।" *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ জ্বিন-ইনসান সৃষ্টির কারণ আরো স্পষ্ট ক'রে বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (٥٨) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৮ আয়াত)*

এখানে একটি প্রচলিত ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। আর তা হল এই যে, ভক্তির অতিরঞ্জনে অনেকে ধারণা ক'রে থাকেন যে, মহানবীর জন্য সারা জাহান পয়দা হয়েছে। কবি বলেছেন,

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল---
সে ফুল যদি না ফুটিত কিছুই পয়দা না হইত
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল-রব্বুল।'

কিন্তু এ কথা বড় ভুল। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁকে চিনিয়ে তাঁর ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল তথা শেষনবীকেও প্রেরণ করেছেন।

হ্যাঁ, মহান আল্লাহ কেবল নিজের ইবাদতের জন্য মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শির্কহীন ইবাদত না করার জন্যই বহু মানুষকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে বান্দার জন্য ইবাদত জানা ও পালন করাই সবচেয়ে বড় ফরয। শির্কহীন ইবাদতই হল দ্বীনের শুরু ও শেষ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয়। তওহীদই হল সকল নবী-রসূলগণের প্রথম দাওয়াত। এর জন্যই কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এর জন্যই বাতিলপন্থীদের সাথে নবী-রসূলদের যুদ্ধ বেধেছে। এর জন্যই মানুষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়েছে; এক শ্রেণী কাফের-মুশরিক এবং অন্য শ্রেণী তওহীদবাদী মু'মিন। এক শ্রেণী জাহান্নামী এবং অন্য শ্রেণী জান্নাতী।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দাস। তার প্রকৃতিতে দাসত্ব আছে। তার জানতে অথবা অজান্তে সে কিছু না কিছুর দাসত্ব ও আনুগত্য করে। বরং সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করে। তিনি বলেছেন,

{أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ } (٨٣)

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। *(সূরা আলে ইমরান ৮৩ আয়াত)*

{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ } (١٥)

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়। *(সূরা রা'দ ১৫ আয়াত)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ } (٤١) سورة النـــــور

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও

মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। *(সূরা নূর ৪১)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَـــالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّـــهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } (١٨) سورة الحـــج

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে; আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা হাজ্জ ১৮ আয়াত)*

বহু মানুষ আছে, যাদের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই অথবা তাঁর রসূল ও কিতাবে বিশ্বাস নেই, তারাও আসলে তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। মহান আল্লাহ তাদের কথা বলেন,

{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا } (٤٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে। *(সূরা ফুরক্বান ৪৩ আয়াত)*

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَـــى بَـــصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ } (٢٣) سورة الجاثية

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)*

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـــهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫০ আয়াত)*

বহু মানুষ আছে, যারা আল্লাহকে চেনে; কিন্তু তাকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে। তাঁর খায়-পরে, কিন্তু অন্যের ইবাদত করে। তারা সেই স্ত্রীর মত, যে স্বামীর খায়-পরে; কিন্তু দেহ সমর্পণ করে অন্যকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ }

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে, তারা তাদের জন্য আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি রাখে না এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। *(সূরা নাহল ৭৩ আয়াত)*

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُـــونَ

اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } (١٨) سورة يونس

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।' *(সূরা ইউনুস ১৮ আয়াত)*

অনেকে আল্লাহকে চেনে, তাঁর ইবাদতও করে, কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে! তাঁর জন্য নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ আদায় করে; কিন্তু তার সাথে সাথে মাযারেও সিজদা করে। তারা সেই স্ত্রীর মত, যে স্বামীর খায়-পরে; কিন্তু স্বামীর সাথে অন্যকেও দেহ সমর্পণ করে! সে স্ত্রী কি স্ত্রী থাকার যোগ্য, না তিন তালাক পাওয়ার যোগ্য?

মহান আল্লাহ আদেশ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার। *(সূরা বাক্বারাহ ২১ আয়াত)*

আর এ হল কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম আদেশ। মহান আল্লাহর নিষেধ হল,

{فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } (٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না। *(ঐ ২২ আয়াত)*

এ হল কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম নিষেধ।

ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত হল প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন। মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কথা বলা ও পছন্দনীয় কাজ করার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, কুরবানী, নযর, দুআ, তাদরীস, তাবলীগ ইত্যাদি সবই আল্লাহর ইবাদত, এ সবই কেবল আল্লাহর জন্য। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِــرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(সূরা আনআম ১৬২-১৬৩ আয়াত)*

কিন্তু যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যদি সে কাজ না করে, তাহলে নিশ্চয় তা আদরণীয় হবে না। যে ঘড়ি টাইম দেয় না, তা কেউ রাখবে না। যে গাড়ি চলে না, তা কেউ রাখবে না। যে বলদ গাড়ি টানে না, যে গাই দুধ দেয় না, তা কেউ পুষবে না। যে গাছ ফল দেয় না বা কোন উপকার দেয় না, সে গাছ চুলোয় যায়।

বলাই বাহুল্য যে, আমরা মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি, সুতরাং আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি। তাঁর আহবানে সাড়া দিলে, তবেই তিনি আমাদেরকে পুরস্কার দানে ধন্য করবেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي } (٣٠) سورة الفجر

অর্থাৎ, হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। *(সূরা ফাজর ২৭-৩০ আয়াত)*

আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন।

ঋণের বোঝা নয়কো সোজা

ব্রাদারানে ইসলাম! মানুষের প্রয়োজনে অনেক সময় পরস্পর ঋণ লেন-দেন ক'রে থাকে। কিন্তু সেই ঋণ অনেকে পরিশোধ করতে অবহেলা করে। অথচ ঋণ হল একটি বড় আমানত। আর আমানত আদায় করতে আদিষ্ট আমরা। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } (٢٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, ---অনন্তর যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত, অন্যের আমানত (প্রাপ্য) প্রত্যর্পণ করা এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষী গোপন না করা। আর যে কেউ তা (সাক্ষ্য) গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্যের) খেয়ানত করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

একজন মুসলিমের অর্থ অপর মুসলিমের জন্য ঠিক সেই রকম হারাম, যে রকম হারাম তার রক্ত। *(সহীহুল জামে' ৩১৪০ নং)* সুতরাং ঋণ করার মাধ্যমে অপরের মাল খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করা সমীচীন হতে পারে না কোন মুসলিমের জন্য।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লোকের মাল-ধন ছিনিয়ে নেয়, সে হল ডাকাত, যে গোপনে চুরি করে সে হল চোর, আর যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের সুরে কোন ভাল মানুষের কাছে ঋণ ক'রে পরিশোধ করতে চায় না, এমন ব্যক্তিও সাধু ডাকাত অথবা ভদ্র চোর!

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০ নং)*

এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদিও অন্যান্য দিকে ভাল লোক হয়, তবুও মরণের পর ঐ ঋণের

কারণে তার আত্মা লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে কেউ তার সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।” *(ইবনে মাজাহ ২৪১৩ নং)*

সাহাবী সা’দ বিন আত্বওয়াল বলেন, আমার ভাই মারা গেল। মরার সময় সে ৩০০ দিরহাম ছেড়ে গেল। আর ছেড়ে গেল তার ছেলে-মেয়ে। আমি স্থির করলাম যে, ঐ ৩০০ দিরহাম তার ছেলে-মেয়েদের পিছনে খরচ করব। কিন্তু ভাই ছিল ঋণগ্রস্ত। নবী ﷺ-এর কাছে এ খবর জানালে তিনি আমাকে বললেন, “তোমার ভাই ঋণের ফলে আটকে আছে। তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ১৫৫০ নং)*

বলা বাহুল্য, অন্যান্য নেক আমলের ফলে যদিও মুসলিম ব্যক্তি বেহেশ্তের অধিকারী হয়, তবুও ঐ ঋণ তার বেহেশ্তের পথে বাধা ও কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কাল আখেরাতে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এমন লোক বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না।

শুধু সাধারণ মুসলিমই নয়; বরং যদি সে আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত শহীদও হয়, তবুও ঋণ তাকে বেহেশ্ত্ যেতে বাধা দেবে। মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, “সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কি কঠিনতাই না অবতীর্ণ হয়েছে! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর জীবিত হয়ে পুনরায় জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবারও শহীদ হয়, আর সে ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে না।” *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৩৬০০ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, “ঋণ পরিশোধ না করার পাপ ছাড়া শহীদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে।” *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১২ নং)*

এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যের সাথে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদ্পদ না হয়ে খুন হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ কি আমার পাপসমূহকে মাফ ক’রে দেবেন?’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “হ্যাঁ।” অতঃপর সে যখন কিছু দূর চলে গেল, তখন তাকে ডেকে বললেন, “হ্যাঁ, তবে ঋণ পরিশোধ না করার পাপ মাফ করবেন না। জিবরীল আমাকে এরকমই বললেন।” *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১১ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, “যে ব্যক্তি ৩টি জিনিস থেকে পবিত্র থেকে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে। আর তা হল, অহংকার, গনীমতের মালে খেয়ানত ও ঋণ।” *(ইবনে মাজাহ ২৪১২ নং)*

ঋণ ভাল জিনিস নয়, ঋণ করে পরিশোধ না করা ভাল লোকের নিদর্শন নয়। এ কথা উম্মতকে বুঝাবার জন্য মহানবী ﷺ ঋণগ্রস্ত লাশের জানাযা পড়েননি!

সালামাহ বিন আক্ওয়া’ বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?” সকলে বলল, ‘না।’ তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, “ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?” সকলে বলল, ‘না।’ অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, “ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?” বলা হল, ‘হ্যাঁ।’ বললেন, “ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?” সকলে বলল, ‘তিন দীনার।’ তা শুনে তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ

নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, “ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?” বলল, “তিন দীনার।” বললেন, “ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?” সকলে বলল, ‘না।’ এ কথা শুনে বললেন, “তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।” তখন আবু কাতাদাহ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।’ *(বুখারী, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত ২৯০৯ নং)*

পরকালের প্রতি ক্ষীণ ঈমানের বহু মুসলিমই ঋণ ক’রে কোন এক ওজরে তা পরিশোধ না ক’রে বগল বাজিয়ে থাকে। অথচ সে মনের গহীন কোণে এ কথা কল্পনাও করে না যে, ঋণদাতা ও পার্থিব বিচারালয় বা কারাগার থেকে সে বেঁচে গেলেও আর এক এমন বিচারালয় ও শেষ বিচার আছে, যেখানে সে কোনক্রমেই ফাঁকি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এ জগতে টাকা ঋণ নিয়ে সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করলেই সে বাঁচতে পারত। কিন্তু সে জগতে আর হাতে টাকা থাকবে না। টাকা কামাই করার কোন পথ থাকবে না। ফলে তাকে এমন জিনিস দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যে জিনিসের মুখাপেক্ষী হবে সে নিজে। তখন বাধ্য হয়েই এর চাইতে বহু মূল্যবান বস্তু দিয়ে ঐ ভুলের খেসারত কড়ায়-গন্ডায় আদায় করতে হবে।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, “তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?” সাহাবাগণ বললেন, ‘আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন দিরহাম নেই, যার কোন আসবাব-পত্র নেই।’ মহানবী ﷺ বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে দেখবে যে, সে একে গালি দিয়েছে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এর মাল আত্মসাৎ করেছে, ওকে খুন করেছে, একে মেরেছে--- ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিশোধ স্বরূপ একে নিজের নেকী দান করবে, ওকেও নিজের নেকী দান করবে। পরিশেষে যখন নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ তার প্রতিশোধ শেষ হবে না, তখন ওদের গোনাহ নিয়ে এর ঘাড়ে চাপানো হবে এবং সবশেষে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে!” *(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৪৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি একটি দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতে) নিজের নেকী থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সেখানে কোন দীনার নেই, কোন দিরহামও নেই।” *(ইবনে মাজাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে’ ৩৪১৮, ৬৫৪৬ নং)*

পরকালে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমকে পরপারের ৪টি লুট থেকে সাবধান হওয়া উচিত; মালাকুল মওতের আত্মা লুট, ওয়ারেসীনদের ধন-সম্পত্তি লুট, পোকা-মাকড়ের দেহ লুট এবং (পরিশোধ না করা ঋণের) ঋণদাতাদের নেকীর লুট।

কিয়ামতের আদালতে নেকীর প্রয়োজন পড়বে এত বেশী যে, তারই উপর নির্ভর করে পরকালের জীবন ও তার মান নির্ণয় করা হবে। সেদিন নেকী-বদী ওজন করা হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে পাবে সন্তোষজনক (আনন্দময়) জীবন। আর যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া দোযখে; উত্তপ্ত আগুনে। *(সূরা ক্বারিআহ)*

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

পিতামাতার মর্যাদা

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

প্রত্যেক সন্তানের কাছে পিতা-মাতা সবচেয়ে বড় মূল্যবান ধন। সবচেয়ে নিকটতম আপন। কিন্তু সংসারে ভুল বুঝাবুঝির ফলে নানা চক্রে তারা পর হয়ে যায়। তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়। তাই মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ ও আদেশ দিয়েছেন যুগে যুগে।

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالْمَـسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ} (٨٣)

অর্থাৎ, আর যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গে (সদ্ব্যবহার করবে)। আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; তৎপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে। যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে। *(সূরা বাক্বারাহ ৮৩ আয়াত)*

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে ভালোবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَـلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُـل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (٢٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু (উঃ) বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। আর অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' *(সূরা বনী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

ইসলাম পিতামাতার খিদমতকে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি বর্ণনা করে তাদেরকে বিরাট মর্যাদা দান করেছে। এমন কি কঠিন ইবাদত পালনের উপরও তাদের খিদমত অগ্রাধিকার পেয়েছে।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, "তোমার মা-বাপ জীবিত আছেন কি?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তাদের মাঝে জিহাদ কর।" *(বুখারী, মুসলিম ২৫৪৯নং)*

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি হিজরত ও জিহাদের উপর আপনার নিকট বায়াত করতে চাই। আর এতে আমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করি।' তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে?" লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।' তিনি বললেন, "আর তুমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা কর?" লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর।" *(মুসলিম ২৫৪৯ নং)*

জাহেমাহ ؓ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ؓ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, "যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

এখানে নফল জিহাদের কথা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরয হলে মা-বাপের অনুমতির অপেক্ষা থাকবে না।

পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করলে সন্তানের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এক গোনাহ ক'রে ফেলেছি। আমার কি কোন তওবাহ (প্রায়শ্চিত্ত) আছে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছে কি?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমার খালা আছে কি?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার সেবাযত্ন কর।" *(তিরমিযী ১৯০৪নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

পিতা-মাতা যদি সন্তানের প্রতি খোশ থাকে, তাহলে মহান আল্লাহও প্রসন্ন থাকেন। মহানবী ﷺ বলেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযী, হাকেম, বাযযার, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৬নং)*

অবশ্য পিতার তুলনায় মাতার রয়েছে বেশী অধিকার। কারণ, সন্তান লালন-পালনে মায়ের কষ্টটাই বেশী। বিশেষ ক'রে গর্ভধারণ, জন্মদান এবং দুগ্ধদান বড় বড় এই ৩ কষ্টের কারণে মায়ের হক বাপের তুলনায় ৩ গুণ বেশী।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কাছে সৎসংসর্গ পাওয়ার অধিক হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি আবারও বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' এবারে তিনি বললেন, "তোমার বাপ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

পিতা-মাতার খিদমত বেহেশ্তে যাওয়ার একটি অসীলা। যে এই অসীলা থাকতেও বেহেশ্তে

যেতে পারে না, সেই প্রকৃত হতভাগ্য।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপেই চড়ে বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন।" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত ক'রে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! --- যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি 'আ-মীন' বললাম। ---" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পিতা হল বেহেশ্তের মধ্যম দরজা। সুতরাং তোমার ইচ্ছা হলে তার যত্ন নাও, না হলে তা নষ্ট ক'রে দাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

পিতামাতার খিদমত দুআ কবুল হওয়ারও অন্যতম অসীলা। প্রসিদ্ধ গুহাবন্দীদের মধ্যে একজন তার দুআতে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার খুব বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও নৈশ দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের জন্য নৈশ দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে নিজ কোন পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর তাঁদের শিয়রে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইভাবে ফজর হয়ে গেল। (কতক বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন) আর আমার পদতলে আমার শিশু ছেলেমেয়েরা (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। অতঃপর তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাদের সেই নৈশ দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজ তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে এই পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।'

পিতামাতার সেবার অসীলায় এই দুআর ফলে পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গিয়েছিল।

পিতামাতার জীবনে এবং বিশেষ করে তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার মক্কার পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'আপনি কি অমুকের পুত্র অমুক?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি লোকটিকে নিজের গাধা ও পাগড়ী দান করে দিলেন। তা দেখে লোকেরা অবাক হল। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হল তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের প্রিয়জনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।" আর ঐ লোক ছিলেন আমার পিতা উমারের বন্ধু।' *(মুসলিম ২৫৫২নং, প্রমুখ)*

মা-বাপের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কার না নেই? কিন্তু মা-বাপ যদি আপনার বিপরীতগামী হয়, কাফের বা বিধর্মী হয়, তাহলে আপনি কি করবেন তখন?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (١٥) سورة لقمان

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছে। তার জননী তাকে (সন্তানকে) কষ্টের পর কষ্ট করণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। *(লোকমান ১৪-১৫ আয়াত)*

পিতা-মাতার আনুগত্য ফরয। কিন্তু তা বলে কোন অবৈধ বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

(لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ).

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই। *(আহমাদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

পিতামাতা যদি শির্ক, বিদআত বা কোন পাপ কাজে আদেশ করে, তাহলে পিতৃমাতৃ-ভক্তির পরিচয় দিয়ে তা করা যাবে না।

যেমন স্ত্রী-সন্তানকে প্রাধান্য দিয়ে পিতামাতার অপমান করাও কোন সন্তানের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ সকল সন্তানকে নিজ নিজ পিতামাতার বাধ্য থাকার তওফীক দান করুন। আমীন।

সন্তান-প্রতিপালন

সন্তান পিতা-মাতার ঘাড়ে আমানত স্বরূপ। আর মহান আল্লাহ আমানতকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে আদেশ করেছেন। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)* এবং তাতে খেয়ানত করতে নিষেধ করেছেন। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)* তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর সন্তানের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সন্তান বন্ধ করা গোনাহর কাজই ঠিকই, অনুরূপ জন্মদানের পর অমানুষ ক'রে ছেড়ে দেওয়াও কম গোনাহর কাজ নয়। সন্তান নিয়ে সুখ চাইলে সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর আদেশক্রমে সন্তান-সন্ততিকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

সন্তান আজকের শিশু, কালকের পিতা, ভবিষ্যতের নাগরিক। জাতির ভাবী আশা।

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।'

মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জারী থাকে নেক সন্তানের দুআ। নেক সন্তান তৈরী করতে পারলে সুখ আছে পিতার ইহকালে এবং পরকালে। আর সেই সন্তানের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবেন আমাদের নবী ﷺ।

উপস্থিত ভ্রাতৃমন্ডলী! যদি সুসন্তান পাওয়ার যারা আশা করেন, তাহলে নিম্নের উপদেশ ও নির্দেশাবলী পালন করুন ঃ-

১। দ্বীনদার গুণবতী স্ত্রী নির্বাচন করুন। নচেৎ নিম গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করা যায় না। মহিলার রূপ, ধন ও বংশ না হলেও দ্বীনদার গ্রহণ করুন। যেহেতু---

মায়ের হাতে গড়বে মানুষ, মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

২। মিলনের সময় দুআ পড়ুন। দুআ পাঠ ক'রে মিলন করলে উক্ত মিলনের ফলে সৃষ্টি সন্তানের কোন ক্ষতি শয়তান করতে পারে না। *(বুখারী, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

৩। আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চেয়ে দুআ করুন।

৪। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার কানে আযান দিন।

৫। ছেলে হোক অথবা মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলে তাতে খোশ হন। যেহেতু সবই তো আল্লাহর দান। কন্যা ঠিকমত মানুষ করলে সে আপনার দোযখের পর্দা হবে। আর কন্যা বলে অপছন্দ করবেন না। কারণ হতে পারে তাতেই আপনার সার্বিক কল্যাণ আছে। আল্লাহ জানেন, আমরা জানি না। যেহেতু বেটা না হয়ে ল্যাঠা বা ব্যথাও তো হতে পারে?

আর খবরদার কোন ভয়ে তাদেরকে হত্যা করবেন না। কেননা বিশেষ ক'রে খেতে দেওয়ার ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। *(সূরা ইসরা ৩১ আয়াত)*

৬। সন্তানের জন্য কথায় কথায়; খুশী অথবা রাগের সময় হিদায়াতের দুআ দিন। আর কোন সময়ই বদ্দুআ দেবেন না। কারণ সন্তানের হকে মা-বাপের দুআ কবুল হয়। আর তাতে আপনার নিজেরই ক্ষতি।

৭। সন্তানের সুন্দর দেখে নাম রাখুন। অসুন্দর নাম রেখে ছেলে-মেয়েকে লজ্জায় ফেলবেন না।

৮। যথাসময়ে ছেলের তরফ থেকে ২টি এবং মেয়ের তরফ থেকে ১টি পশু আকীকা করুন।

৯। যথাসময়ে ছেলের খতনা করান।

১০। উর্ধ্বপক্ষে পূর্ণ ২ বছর তাকে মায়ের দুধ পান করান।

১১। কথা বলতে শিখলে সর্বপ্রথম তাকে কালেমা শিখিয়ে দিন এবং ঈমানী বীজ বপন করুন তার হৃদয়-মনে।

১২। সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাযের আদেশ করুন। দশ বছরে নামাযের জন্য প্রহার

করুন এবং ছেলে-মেয়ের বিছানা পৃথক ক'রে দিন।

১৩। সুন্দর চরিত্র শিক্ষা দিন। শিশুর প্রকৃতি বড় স্বচ্ছ। অতএব সে বাপ-মায়ের পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী গড়ে উঠবে---সে খেয়াল রাখবেন।

১৪। সকল প্রকার অসচ্চরিত্রতা থেকে তাকে দূরে রাখুন।

১৫। ছেলেদের সামনে মার্জিত কথাবার্তা বলুন। কারণ, তারা তো আপনার ভাষা শুনেই কথা বলতে শিখবে। নোংরা কথা বলবেন না। তাদের সামনে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াও করবেন না খারাপ কথা বলে। তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলবেন না।

১৬। সন্তানের জন্য নিজে নমুনা হন। আর জেনে রাখুন যে, 'দুধ গুণে ঘি, মা গুণে ঝি। আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি। যেই মত কোদাল হবে সেই মত চাপ, সেই মত বেটা হবে যেই মত বাপ।' সাধারণতঃ এরূপই হয়ে থাকে।

১৭। ছেলেদের সামনে স্ববিরোধিতা থেকে দূরে থাকুন। আপনি যেটা করেন, তা করতে সন্তানকে নিষেধ করলে ফলপ্রসূ হবে না।

১৮। তাদের সাথে ওয়াদা করলে ওয়াদা পূরণ করুন। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না।

১৯। ঘর থেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা দূর করুন। অশ্লীল ছবি, ভিডিও, টিভি ইত্যাদি ঘরে রাখবেন না। বাইরেও দেখতে দেবেন না। নচেৎ, তাতে তাদের পড়াশোনা যাবে, চরিত্রও যাবে।

২০। পারলে শ্লীলতাপূর্ণ ক্যাসেট এনে রাখতে পারেন। গান-বাজনা ও অশ্লীলতা-বর্জিত ক্যাসেট হল বর্তমানে মুসলিমদের বিকল্প বস্তু।

২১। যৌন-চেতনার সাথে সাথে যৌন অপরাধ থেকে দূরে রাখার শতভাবে চেষ্টা করুন। খেয়াল রাখুন, যাতে তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার না হয়ে বসে।

২২। তাদেরকে স্বনির্ভরশীল, মেহনতী ও কর্মঠ হতে অভ্যাসী বানান। সকল প্রকার বিলাসিতা থেকে দূরে রাখুন।

২৩। তাদের বয়স অনুযায়ী ব্যবহার পরিবর্তন করুন। ছেলে বড় হলে ভায়ের সাথে যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি তার সাথেও করুন।

২৪। তাদের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না। তাদের খোঁজ-খবর নিন। কোথায় যায়-আসে, কোথায় রাত্রিবাস করে, তাদের বন্ধু কে ইত্যাদি তদন্ত করে দেখুন। তবে হ্যাঁ, তাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন না এবং বেশী বিশ্বাসও করে বসবেন না।

২৫। সন্তানের ছোট ভুলকে বড় ক'রে দেখবেন না। যথাসম্ভব ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

২৬। যেমন ভুল, ঠিক তেমনি শাস্তি প্রয়োগ করুন। 'লঘু পাপে গুরু দন্ড' ব্যবহার করবেন না। মশা মারতে কামান দাগবেন না। নচেৎ, 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো' হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যেমন দুনিয়ার কাজের জন্য তাদেরকে মারধর করেন, তেমনি দ্বীনের কাজের জন্যও সমান খেয়াল রাখবেন।

২৭। খবরদার শাসনের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার স্ত্রীরও উচিত নয়, তুমি শাসন করলে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অথবা ছেলে-মেয়ের কোন পাপ গোপন করা।

২৮। তাদের পড়াশোনার জন্য ভালো বিদ্যালয় বেছে নিন। খবরদার এমন বিদ্যালয়ে দেবেন না, যেখানে তার আকীদা বেদ্বীনের আকীদা হয়ে যায়।

২৯। যথাসম্ভব দূরে না থেকে ছেলে-মেয়ের সাথে বাস করুন।

৩০। মসজিদ, জালসা ও ইল্‌মী মজলিসে তাদেরকে সহ উপস্থিত হন।

৩১। বিয়ের বয়স হলে ছেলে-মেয়ের যথাসময়ে বিয়ে দিন। নচেৎ তারা কোন পাপ ক'রে বসলে আপনারও পাপ হবে।

৩২। ভরণ-পোষণ, স্নেহ-প্রীতি, উপহার ও দানে সন্তানদের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখুন। সন্তান এক স্ত্রীর হোক অথবা একাধিক স্ত্রীর, পিতার কাছে সকলেই সমান।

৩৩। তাদের প্রতি স্নেহশীল হন। মমতা প্রদর্শন করুন।

তরবিয়তের এই মৌলনীতি গ্রহণ করে চললে - ইন শাআল্লাহ - ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার সুখের সংসার হবে। অবশ্য বাইরের কোন পরিবেশ যদি তাকে পরিবর্তন ক'রে দেয়, তবে সে কথা ভিন্ন। যেহেতু পরিবেশ ও পরিস্থিতিও কম বড় শিক্ষক নয়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সুসন্তান দান করুন।

{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} (٧٤) سورة الفرقان

নামাযে বিনয়-নম্রতা

আল্লাহর নিকট তাঁরই জন্য অন্তর থেকে কাকুতি-মিনতি, স্বস্তি ও প্রশান্তি প্রকাশ এবং তাঁর নিকটে ভগ্নহৃদয়ভাব প্রদর্শন করাকে বিনয়-নম্রতা বলা হয়।

বিনয়-নম্রতার স্থান হলো অন্তর, হৃদয়-মন।

বিনয়-নম্রতার সুফল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ হয়। সুতরাং যখন অন্তর নম্র হয়, তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনত হয়ে যায়।

হৃদয় হলো দেহের রাজা। তাই হৃদয় ভালো থাকলে সমস্ত দেহ ভালো থাকে। আর হৃদয় নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত দেহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "সাবধান! যেনে রাখ, দেহের মধ্যে একটা মাংসপিন্ড আছে। যখন সেটা ঠিক থাকবে, তখন সমস্ত দেহ ঠিক থাকবে এবং যখন সেটা ঠিক থাকবে না, তখন সমস্ত দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। হাঁ! আর সেটা হলো হৃদয়।" *(বুখারী)*

বিনয় নম্রতা হলো সমস্ত কর্মের প্রাণ ও তার ভিত্তি। যার দ্বারা হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকৃত ইবাদত সম্পন্ন হয়। সুতরাং ইবাদতকারী যা বলে তা অনুধাবন করে, যা আমল করে ও মুখে উচ্চারণ করে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ক'রে থাকে এবং আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ পালন করার মাধ্যমে তাঁর তা'যীম ক'রে থাকে। ফলে সেই সময় তার হৃদয় জীবনের আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়। আর সেই সাথে আল্লাহ তার অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি অবতীর্ণ করেন।

বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়, বিনয়পূর্ণ আনুগত্যের আবে-হায়াত দ্বারা হৃদয় উজ্জীবিত হয়। বিনয়-নম্রতা মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল করে, হৃদয়ে প্রফুল্লতা প্রবিষ্ট করে এবং আল্লাহর সাথে মুনাজাতের নিয়ামত, যিকরের স্বাদ এবং ঈমানের মিষ্টতায় আত্মাকে আনন্দে মাতোয়ারা ক'রে তোলে। যে মিষ্টতা আল্লাহর নিকট দুআ ক'রে, সকলকে ছেড়ে কেবল তাঁর নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা ক'রে, তাঁর দরজায় নিজেকে ফেলে রেখে, তাঁর কাছে নিজের হীনতা, মুখাপেক্ষিতা ও অক্ষমতা প্রকাশ ক'রে লাভ হয়। আর এটাই হল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর অলীর নিকট থেকে আল্লাহর দাবী যে, সে শান্ত হবে, বিনয়-নম্র ও অবনত হবে, নিজের অপরাধ এবং নিজ মওলার প্রতি একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করবে। আর এটাই হল ঈমানী বিনয়-নম্রতা; মুনাফিকী

(কপট) বিনয়-নম্রতা নয়, যা কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। এ বিনয়-নম্রতা তাদের নয়, যারা শোরগোল, হৈ-হুল্লোড় করে, নেচে ও হাততালি দিয়ে বেড়ায়। বিনয়-নম্রতার সর্দার ও আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন তার বুক থেকে আটাচাকির ও ফুটন্ত পানির ন্যায় ক্রন্দনের শব্দ প্রকাশিত হত। তিনি ﷺ গভীর রাত্রির নামায এমনভাবে পড়তেন যে, তাঁর পা দুটি ফুলে যেত এবং বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"

আবুবাকর ﷺ অত্যন্ত বিনম্র মানুষ ছিলেন। তিনি নামায অথবা কুরআন পাঠ করার সময় কেঁদে ফেলতেন। *(মুসলিম)*

উমার বিন খাত্তাব ﷺ একবার কুরআন পাঠ শুনে রোগাক্রান্ত হয়ে যান, লোকে তাঁর যিয়ারত করতে আসে, কিন্তু কেও বুঝতে পারেনি যে, তিনি কি কারণে অসুস্থ হয়েছিলেন।

এইভাবে আল্লাহর প্রিয়জনেরা তাঁদের নামাযে বিনয়ী হন। আর তাঁরা সাফল্য লাভ করেন; পরকালের মহাসাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)} سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। *(সূরা মু'মিনূন ১-২ আয়াত)*

কিভাবে বিনয়-নম্রতা অর্জন করতে পারবেন আপনি?

১। নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশীমত কর্ম না করে, আল্লাহ্ ও রসূল ﷺ-এর নির্দেশাবলীকে নতশিরে মেনে নিন।

২। তাঁর সন্তুষ্টি তলব (সন্ধান) করার জন্য খাঁটি ইখলাস (আন্তরিকতা) ব্যবহার এবং তা অর্জনের পথে নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

৩। আমল যাতে প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য না হয়ে যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

৪। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ সর্বদা স্মরণে রাখুন এবং তাঁকে লজ্জা করুন। যেহেতু তিনি বিস্তারিতভাবে আপনার হৃদয়ের সবকিছু জ্ঞাত আছেন।

৫। আল্লাহর নিকট নাছোড় বান্দা হয়ে হিদায়াত, তাওফীক, সাহায্য, (আমল) কবুল এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রার্থনা করুন।

৬। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করুন।

৭। আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) পাঠ করুন ও তা (বুঝে) চিন্তা ভাবনা করুন, তা মুখস্থ করার এবং তার উপর আমল করার জন্য সচেষ্ট হন।

নামাযের মধ্যে বিনয়-নম্রতা

বিনয়-নম্রতা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে নামাযের সঙ্গে বেশি জড়িত, কেননা নামায দ্বীনের স্তম্ভ এবং যিক্র, দুআ, কুরআন তেলাঅত, রুকু, সিজদা প্রভৃতি ইবাদতের জায়গা। নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে মুনাজাত হয়, তাঁর নৈকট্য লাভ হয়। নামাযে রয়েছে কাকুতি-মিনতি, ভয় ও কান্না। নামাযী ব্যক্তির জন্য নামায তার ঈমানের আয়না স্বরূপ। সুতরাং নামাযের আভ্যন্তরিক বিনয়-নম্রতা অন্তরের আয়না এবং তার বাহ্যিক কাকুতি-মিনতি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আয়না। যে ব্যক্তির মধ্যে নামায ব্যতীত অন্য কোন কাজে বিনয়-নম্রতা থাকে না, যার আচারে-ব্যবহারে, সত্যবাদিতায়, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনয়-নম্রতা থাকে না, হারাম ও

ঘৃণিত বস্তু থেকে দূরে থাকতে বিনয়-নম্রতা থাকে না, অধিকাধিক যিক্র এবং কল্যাণ-কামিতায় বিনয়-নম্রতা থাকে না, যার নামাযের বাইরে ঐ সকল কাজে বিনয়-নম্রতা নেই, সে কোন প্রকারে নামাযের মধ্যেও বিনয়-নম্রতা আনতে পারে না। কেননা বিনয়-নম্রতাপূর্ণ নামাযের সাথে মুসলিমের আচরণের সম্পর্ক আছে। বিনয়-নম্রতার সাথে পড়া নামায নামাযীকে প্রত্যেক অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট কর্ম থেকে বিরত রাখে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

((إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ))

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

নামাযে কিভাবে বিনয়-নম্রতা আনবেন?

এই মহান সফলতা অর্জন করার জন্য আল্লাহর নিকট নাছোড় বান্দা হয়ে তওফীক প্রার্থনা করুন। আর বিনয়-নম্রতা অর্জন করার উপায় অবলম্বন করুন ঃ-

১। নামাযের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। আর এ কথা সত্য যে, যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে, সে অন্য ইবাদতের হিফাযত বেশি করবে। আর যে নামায নষ্ট করবে, সে অন্য ইবাদত বেশী নষ্ট করবে।

২। উলামাগণ এ কথায় একমত যে, নামাযীকে তার নামাযের ততটুকু নেকী দেওয়া হবে, যতটুকু সে তাতে কি বলছে, তা বুঝতে পারবে।

৩। নামাযের বাহ্যিক আদবগুলি সুসম্পন্ন করার প্রতি লক্ষ্য রাখুন; যেমন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করুন, দেহ-লেবাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় থাকুন, নামাযের জন্য মসজিদে আগে আগে আসুন। নামাযের সুন্নতের প্রতি যত্নবান হন; যেমন ঃ যখন যেখানে হাত রাখা দরকার তখন সেখানে হাত রাখুন, যেখানে যেভাবে পা রাখা দরকার সেখানে সেভাবে পা রাখুন, আঙ্গুলগুলিকে যেভাবে ফাঁক করে রাখা দরকার ঠিক সেইভাবে ফাঁক ক'রে রাখুন এবং দৃষ্টি যে সময় যেমন রাখা দরকার, ঠিক সেখানে তেমন নিবদ্ধ রাখুন ইত্যাদি।

৪। নামাযে যে সূরা ও দুআগুলি পাঠ করা হয়, তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। সুতরাং আপনি এমন হবেন না যে, যে কথা আবৃত্তি করছেন, তার মানেই বুঝেন না।

৫। হৃদয়ের বিনয়-নম্রতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন এবং তা লোকপ্রদর্শন হতে খালি করুন। যেহেতু ইখলাস ও বিশুদ্ধতা ছাড়া বিনয়-নম্রতার কোনই মূল্য নেই।

৬। নামাযে প্রবেশ করার পূর্বে সর্বপ্রকার চিন্তা, ব্যস্ততা ও কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত করুন এবং প্রবেশ করার পর এসব যাতে না হয়, তার জন্য নিজেকে সুরক্ষিত করুন। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন আছে ধৈর্য ও সাধনার। আর মহান আল্লাহ বলেন,

((وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا))

অর্থাৎ, যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ-প্রদর্শন ক'রে থাকি। *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

৭। নামায পড়ার সময় অন্তরে এই ধারণা রাখুন যে, আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর আল্লাহ আপনার সামনে আছেন। যেন আপনি তাঁকে দেখছেন অথবা তিনি আপনাকে অবশ্যই দেখছেন। তিনি আপনার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না আপনি মুখ (সালাম) ফিরিয়েছেন। আর এই অবস্থা এই দাবী রাখে যে, আপনি আপনার প্রতিপালককে লজ্জা করবেন এবং তাঁর ধ্যান থেকে ছিন্নকারী ব্যস্ততা নিয়ে তাঁর নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেবেন না।

৮। নামায পড়ার সময় এই ধারণা রাখুন যে, এটাই আপনার (দুনিয়া থেকে) বিদায়ীর মতো শেষ নামায, যে জানে না যে, সে এরপর আর কোন নামায পড়তে পাবে কি না ?

৯। মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে যত্নবান হন। কেননা মসজিদ হল রহমতের জায়গা।

১০। বিনয়-নম্র মানুষদের জীবন-চরিত পাঠ করুন।

১১। রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। কেননা ভোর রাতের কুরআন পাঠ, দুআ ও মুনাজাতের প্রভাব আছে হৃদয়ের উপর, আকর্ষণ আছে আত্মার প্রতি। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামায দুআ কবুল ও আশা পূরণ হওয়ার অন্যতম কারণ, এ নামায নেক লোকেদের অভ্যাস, এর দ্বারা গুনাহ্ মিটে যায় এবং শরীরের ব্যাধি নিবারণ হয়।

১২। নফল নামাযের প্রতি যত্নবান হন এবং বেশি-বেশি ক'রে তা পড়ুন। কারণ এর দ্বারা ফরয নামাযের কমতি পূরণ হয়ে যায়। এর দ্বারা বান্দার হৃদয়ের সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন, হিফাযত করেন, সংশোধন করেন এবং তার দুআ কবুল করেন। আর যে ব্যক্তি অধিকাধিক নফল নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে একজন আল্লাহর অলী হয়ে যায়।

যখন আমরা বিনয়-নম্রতা হারিয়ে ফেলব

ব্রাদারানে ইসলাম! যখন আমাদের মধ্য থেকে বিনয়-নম্রতা চলে যাবে, তখন ইবাদতের বাহ্যিক রূপ অবশিষ্ট থাকবে এবং তার প্রকৃতত্ত্ব ও আসল উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে। হৃদয় ও চরিত্র থেকে ইবাদতের প্রভাব উঠে যাবে। ফল স্বরূপ হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে, আর তার ফলে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসবে না, আনুগত্যের সুস্বাদ, যিক্রের মিষ্টতা এবং মুনাজাতের তৃপ্তি হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা, হৃদয়ের আলো, সুরেলা কণ্ঠে কুরআন কারীম পাঠ করার সুস্বাদ উপভোগ এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা। হারিয়ে যাবে সুদীর্ঘ কিয়াম, রুকূ ও সিজদার নামায। অধিকাংশ নামাযীদের আচার-ব্যবহার নিকৃষ্ট হয়ে যাবে।

(বিষয়টি শায়খ আব্দুল্লাহ সাল্লুমের প্রচারপত্র থেকে গৃহীত।)

শবে-মি'রাজ

প্রতি বৎসর ২৭শে রজব বিভিন্ন দেশে বহু মুসলমান ভক্তি ও উদ্দীপনার সাথে 'শবে-মিরাজ' পালন করে থাকেন। তাঁরা এই রাত্রে ইবাদত করেন (বিশেষ পদ্ধতিতে ১২ রাকআত নামায পড়েন, নামায শেষে ১০১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে দুআ ও মুনাজাত করেন) এবং পরদিন রোযা রাখেন। কেউ কেউ ভাড়াটিয়া হুজুর দিয়ে মীলাদ পড়ান, ভাড়াটিয়া হাফেয দিয়ে কুরআনখানী বা শবীনা পাঠ করান। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সকল ইবাদত করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন কারীমের শিক্ষা ও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁদের এ সকল কর্ম অযৌক্তিক ও অবশ্য-বর্জনীয়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে মহান আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং এক রাতে তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে বোরাকে ক'রে জেরুজালেমের মসজিদে আকসায় এবং সেখান থেকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আম্বিয়াগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন করেন। মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি তাঁর কথোপকথন হয়। পাঁচ অক্ত নামায ফরয করা হয়। আম্বিয়াগণকে নিয়ে ইমামতি ক'রে নামায পড়েন।

মিরাজের এই ঘটনা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও মি'রাজের তারীখ বলা হয়নি। মি'রাজ কোন তারীখে সংঘটিত হয়েছিল এ কথা পবিত্র কুরআনে বা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তা পালন করা তো দূরের কথা; রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মি'রাজের তারীখ জানা বা জানানোর ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী যামানার ঐতিহাসিকগণ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, মিরাজ রবিউল আউওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কেউ বলেছেন, মুহার্রাম মাসে। কেউ বলেছেন, রমযান মাসে। আবার কেউ বলেছেন রজব মাসে। তারীখের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। আর কোন মতটাই সঠিকরূপে প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় ২৭শে রজবেই মি'রাজ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা এবং এই দিন বা রাতকে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

ব্রাদারানে ইসলাম! মি'রাজের তারীখ যদি নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব হতো, তাহলেও তা পালন করা আমাদের জন্য জায়েয হতো না। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বা তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ কেউ কখনো শবে মি'রাজ পালন করেননি। আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁদের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (١٠٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রথম যুগের সেই মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যারা তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার পাদদেশে বয়ে গেছে নদীসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা। *(সূরা তাওবাহ ১০০ আয়াত)* কাজেই আমরা যদি "সবচেয়ে বড় সফলতা" অর্জন করতে চাই, তাহলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরা যা করেছেন তা করতে হবে এবং তাঁরা যা করেননি তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যে কাজ রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি, সে কাজ ধর্মীয় কাজ হিসাবে বা সওয়াব লাভের কামনায় করলে তাকে "বিদআত" বলা হয়। আর বিদআত জঘন্য অন্যায়। কারণ, বিদআতী মূলতঃ এ কথা বলতে চায় যে, শবে মিরাজ পালন করা একটি ভাল কাজ। অথচ রাসূল ﷺ তা আমাদেরকে বলে যাননি। উপরন্তু যদি সবাই ইচ্ছামত মনগড়া ইবাদত করতে থাকে, তাহলে বিধেয়র সাথে অবিধেয় একাকার হয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যাবে। এ জন্য রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিদআত করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের এ বিষয়ে (দ্বীনে) যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হল মুহাম্মাদের শিক্ষা ও তরীকা। আর সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল নব-উদ্ভাবিত কর্ম। সকল প্রকার নতুন কাজই বিদআত। আর সর্বপ্রকার বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম)* কাজেই কোন বিদআতকে (বিদআতে হাসানাহ) ভাল বলার অবকাশ নেই।

পরিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাহ ও শিক্ষার অনুসরণ করে চলা। তাঁর শিক্ষার বিপরীত সকল প্রকার বিদআতকে বর্জন করা এবং অপরকে এ পথে চলতে আহবান করা। (বিদআতী পরবের কোন দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা।) এ কথাই মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মহাকালের শপথ! সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *(সূরা আসর)* মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, "ন্যায়, সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অপরের সহায়তা করো না।" *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

হাদীস শরীফে মহানবী ﷺ বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল আন্তরিকতা, হিতাকাঙ্ক্ষা ও সৎ পরামর্শ দান করা।" সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কাদের জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিম জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম)*

বলাই বাহুল্য যে, শ্বশুর-বাড়ি হলেও এই শ্রেণীর পরবে অংশগ্রহণ করা কোন সহীহ হাদীস মাননে-ওয়ালা মুসলিমের উচিত নয়। না দ্বীন মনে ক'রে, আর না সামাজিক খাতিরে। বরং প্রত্যেকের উচিত, বিদআতকর্মকে উৎখাত ক'রে সহীহ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা।

যেমন উচিত নয়, পেটের স্বার্থে অথবা কিছু অর্থের লোভে কোন আলেম-উলামার উক্ত শ্রেণীর পরবে অংশগ্রহণ করা। যেহেতু তাতে বিদআতী উৎসাহিত হয় এবং বিদআত বেড়ে চলে। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের ছিদ্রপথ। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দিন। আমীন।

দুআর মাহাত্ম্য

যে কোন প্রয়োজন ও আপদে-বিপদে মহান প্রতিপালক মানুষের কাছে, মানুষের সাথে। সেই সময় সে তাকে আহবান করলে সত্বর সুফল পায়। মানুষের আহবানে তিনি সাড়া দেন। তার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكَمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন তুমি বল,) 'আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।' *(সূরা বাকারাহ ১৮৬)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ}

অর্থাৎ, অথবা তিনি যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে আহবান করে, যিনি বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা নামল ৬২ আয়াত)*

কেউ নয়। একমাত্র তিনিই বিপদে সাড়া দেন, তিনিই বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর কাছে চাইলে, তিনি না দিতে লজ্জা করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দাকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাঊদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

সুখ ও সমৃদ্ধির ভান্ডার ভরপুর আছে মহান প্রতিপালকের কাছে। চাইলে এবং মানুষ তা পাওয়ার যোগ্য হলেই তো পাওয়া যাবে। দয়া ও ক্ষমার দরিয়া তিনি। প্রার্থনা করলেই তো অর্জন করা যাবে। সুতরাং তাতে তো আমার আপনার দ্বিধা, সংকোচ বা অবজ্ঞা হওয়া উচিত নয়।

আপনি যদি গোনাহগার হন, যদি ভুল ক'রে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা পেতে চান, তাহলে আদম ও হাওয়ার মত দুআ ক'রে বলুন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(সূরা আ'রাফ ২৩ আয়াত)*

সন্তানহীন হয়ে বসে না থেকে সবল মনে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে যাকারিয়া নবীর মত দুআ ক'রে বলুন,

{رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} (٨٩) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না। তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৯ আয়াত)*

{رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء} (٣٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। *(সূরা আলে ইমরান ৩৮ আয়াত)*

রোগ-পীড়ায় জর্জরিত হয়ে নিদারুন ব্যথা সহ্য করতে করতে কাকুতি-মিনতির সাথে আরোগ্য প্রার্থনার সাথে আয়্যুব নবীর মত দুআ ক'রে বলুন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٨٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া ৮৩ আয়াত)*

মহাবিপদে পতিত হয়ে সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ দেখে নিরাশ মনের গভীর আবেগে আশার আলো জ্বেলে ইউনুস নবীর মত দুআ ক'রে বলুন,

{لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (٨٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

দেশের সরকার ও অধিকাংশ মানুষ যদি আপনার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে আপনার ধ্বংস কামনা করে, তাহলে তাওহীদের ইমাম ইব্রাহীম নবী ও আমাদের সর্বশেষ নবীর মত দুআ ক'রে বলুন,

{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩ আয়াত)*

কোন দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায় যদি আপনার বিরুদ্ধে একজোট হয়, তাহলে লূত নবীর মত দুআ করে বলুন, {رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ}

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। *(সূরা আনকাবূত ৩০ আয়াত)*

নানা মসীবতের জমাট বাঁধা পাথর এসে জীবনের পর্বতগুহার দরজা যদি বন্ধ ক'রে দেয়, তাহলে নেক আমলের অসীলায় ব্যথা ভরা করুণ মন নিয়ে সকাতর প্রার্থনা করুন।

দুআ হল মুমিনের হার্দিক ও দৈহিক ব্যাধির ঔষধ। অতএব যদি আপনি কোন রোগ-বালায় পড়ে অশান্তি ভোগ করতে থাকেন, তাহলে দুই হাত তুলে আসমানের দরজায় করাঘাত করুন।

দুআ হল মুমিনের অস্ত্র। অতএব আপনি যদি দুর্বল অথবা সবল, অস্ত্রহীন অথবা সশস্ত্র মুজাহিদ হন, অথবা কোন শত্রু-নিধন করতে চান, তাহলে দুই হাত তুলে এই আসমানী ক্ষেপণাস্ত্র (রকেট) ব্যবহার করুন। আপনার শত্রুর উপর বিজয়-কেতন হবে এই দুআ।

দুআ বালা-মসীবতে সান্ত্বনার সাথী, সংকীর্ণতায় প্রশস্ততার প্রবেশদ্বার, ব্যথা-বেদনার উপশমকারী মলম। দুই হাত তুলে সেই মলম ব্যবহার করুন, সকল ব্যথা দূর হয়ে যাবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প ও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে আল্লাহর নিকট থেকে। এই সময়ে আপনি তাঁর দরবারে দরখাস্ত দিয়ে নিজের গত্যন্তরহীনতার কথা নির্জনে জানান। তিনিই আপনার এ দুর্দশা ও দুরবস্থা দূর করবেন।

ঋণের বোঝা যদি আপনার কোমর ভেঙ্গে থাকে, দিনের বেলায় লাঞ্ছনায় লোককে মুখ দেখাতে ইচ্ছা না হয় এবং রাতের বেলায় দুশ্চিন্তায় আপনার ঘুম না আসে, অথবা হিংসুকের হিংসা এবং দুশমনের দুশমনি যদি আপনার মনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়, তাহলে হৃদয়ের দ্বার খুলে মনের ব্যথা জানিয়ে মনের সৃষ্টিকর্তাকে বলুন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী)*

হে শোষিত-বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষ! নিরাশ না হয়ে প্রাণ খুলে মহান প্রভুর কোর্টে আপনার এ মামলা তুলে দিন। আর জেনে রাখুন যে, আপনার দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রকার অন্তরাল নেই।

দারিদ্রের জ্বালা ও ক্ষুধার তাড়নায় উত্যক্ত সন্তান-লালনকারী ভাই মুসলিম! মহান খাদ্যদাতার কাছে উপস্থিত হৃদয় নিয়ে এবং মঞ্জুর হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুই হাত তুলে

আপনার দরখাস্ত পেশ করুন। তিনি আপনার ও আপনার স্ত্রী-সন্তানের অন্ন যোগাবেন।

হে শিক্ষিত রুযী-সন্ধানী মুসলিম যুবক! চাকুরীর জন্য বহু দরখাস্ত দিয়েছেন, বহু সার্টিফিকেট জমা করেছেন, বহু ব্যাকিং লাগিয়েছেন; এমন কি হয়তো অবৈধ ঘুসও দিতে কসুর করেননি, তবুও চাকুরী হয়নি। কিন্তু গভীর রাতের অন্ধকারে গোপনে রুযীদাতা মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে একবার গভীর বেদনার সাথে দরখাস্ত পেশ করেছেন কি? নামাযে দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে প্রাণ খুলে বলেছেন কি, 'আল্লাহুম্মাগফির লী অরহামনী অহদিনী অআ-ফিনী অরযুক্বনী'?

ফজরের ফরয নামাযের সালাম ফিরার পর মন থেকে বলেন কি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআঁউ অরিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অআমালাম মুতাক্বাব্বালা'?

সুখের আশাধারী ভাই আমার! দুআ করুন আপনার দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার জন্য ঃ-

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (٢٠١) سورة البقرة

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। *(সূরা বাক্বারাহ ২০১ আয়াত)*

মহান আল্লাহ নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চেয়ে বলুন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনয়্যা অলআ-খিরাহ।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

চান আল্লাহর কাছে। মানুষের কাছে চাইলে মানুষ রাগে, কিন্তু আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন! নবী ﷺ বলেন, "যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২/১২৫৮)*

দুআ অন্যান্য ইবাদতের মত এক ইবাদত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। তাই গায়রুল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকলে তা অবশ্যই শির্ক হয়। তাই যাবতীয় দুআ ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহরই নিকট করতে হয় এবং যত কিছু চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হয়। সর্বপ্রকার, সর্বভাষায় এবং একই সময় অসংখ্য ডাক কেবল তিনিই শুনতে ও বুঝতে পারেন এবং সর্বপ্রকার দান কেবল তিনিই করতে পারেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটই চাও, যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

আল্লাহর কাছে দুআ করুন, কবুল হবে দৃঢ় আশা নিয়ে, চাওয়া বিষয়ে নিশ্চয়তা নিয়ে, রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে দয়া কর।' বরং দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু আল্লাহকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধ্য করতে পারে না।" *(বুখারী ১১/১৩৯, মুসলিম ৪/২০৬৩)*

রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, দুআ করলাম কিন্তু কবুল হল না।" *(বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫)*

"বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন? বললেন, এই বলা যে, 'দুআ করলাম, আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ করাই ত্যাগ করে বসে।" *(মুসলিম ৪/২০৯৬)*

"তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।" *(তিরমিযী ৫/৫১৭)*

মোট কথা দুআ করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দুআ কবুল হবে এই একীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।

চাইলে না পেলেও চাওয়া বৃথা যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ধরার বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দুআ করে (তা ব্যর্থ যায় না); হয় আল্লাহ তা তাকে দেন অথবা অনুরূপ কোন মন্দ তার উপর থেকে অপসারণ করেন অথবা তার সম পরিমাণ পুণ্য তার জন্য সঞ্চিত রাখা হয় (যা তার পরকালে কাজে আসবে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে (দুআকারী) গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করবে।" *(তিরমিযী, হাকেম)*

স্বার্থপর হবেন না, কেবল দুঃখের সময় চাইবেন, আর সুখের সময় ভুলে যাবেন---তা করবেন না। এমন মতলববাজ হলে আপনার দুআ কবুল হবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দুআ করা।" *(তিরমিযী)*

আল্লাহ বলেন, "যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়েও আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট ওর নিকট হতে দূর করে দিই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে; যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তা মোচন করার জন্য আমাকে ডাকেইনি।" *(সূরা ইউনুস ১২ আয়াত)*

দুআ কবুল হওয়ার জন্য হালাল পানাহার করা এবং হালাল পরিধান করা জরুরী। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন যে আদেশ রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"*(কুঃ ২৩/৫১)* মহান আল্লাহ আরো বলেন, যার অর্থ, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।"*(সূরা বাকারাহ ১৭২)* অতঃপর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দুআ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে? *(মুসলিম ৪/৭০৩)*

পরিশেষে বলি, ঠিক সেই পদ্ধতি মতে দুআ করুন, যেখানে যে পদ্ধতি মতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। দুআর সময়ও ভুলে যাবেন না, দুআ একটি ইবাদত; বরং দুআই আসল ইবাদত। অতএব তাতে তওহীদ চাই, ইখলাস চাই এবং তরীকায়ে মুহাম্মাদীও চাই।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই পদ্ধতিতে দুআ করার তওফীক দিন। আমীন।

শবেবরাত

শা'বান মাসের পনেরো তারীখে প্রচলিত একটি উৎসব 'শবেবরাত'। দেওয়ালীর ধুমধাম দেখেশুনে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা আর লোভ সামলাতে না পেরে 'শবেবরাত' বড় ধুমধামের সাথে পালন ক'রে থাকে। কিন্তু এ পরবটি আসলে কিছু অমূলক ধারণার ফলে সৃষ্টি হয়েছে শুধু তাতে আনন্দ ও মজা আছে বলে। সংক্ষেপে সেই ধারণা ও বাস্তব আলোচনা করব।

প্রথম অমূলক ধারণা ও এর নামকরণ ঃ-

এ রাতটিকে ভাগ্যরজনী বলা হয়ে থাকে। এই রাতে নাকি মানুষের ভাগ্য রচনা করা হয়। তাই অনেকে নিজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার জন্য এই দিন ও রাতকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন ক'রে থাকে। এই ধারণার প্রমাণে কিছু দলীলও পেশ করা হয় যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ } (٥) سورة الدخان

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি; আমি তো সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়---আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ ক'রে থাকি। *(সূরা দুখান ৩-৫ আয়াত)*

তাবেয়ী ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, 'ঐ রাতটি হল শা'বানের ১৫ তারীখের রাত।'

কিন্তু আগে-পিছা না ভেবে চোখ বন্ধ করে তাঁর কথা মতে ঐ রাতকে ভাগ্যরজনী বলে ধারণা করা সচেতন মানুষদের উচিত নয়। যেহেতু তাঁর উক্তির প্রতিকূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ তথা আরো অন্যান্য উলামার উক্তি।

ইবনে কাসীর বলেন, তাঁর এ ধারণা সুদূরবর্তী। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/ ১৭৬)*

আসলে বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বা শবেকদর। আর শবেকদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে ক'রে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফূয থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তার অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ))

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

আর তিনি বলেন,

((إنا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা ক্বাদ্‌র ১-৩)*

আর হাদীস থেকে এ কথা বিদিত যে, শবেকদর হল রমযান মাসে; শা'বান মাসে নয়।

পক্ষান্তরে তকদীর লিখার ব্যাপারে যে সব হাদীস পেশ করা হয়, তার একটিও সহীহ নয়।

দ্বিতীয় অমূলক ধারণা ঃ এই রাতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।

এ বিষয়ের হাদীসগুলিও যয়ীফ। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নামার কথা; কেবল ১৫ শা'বানের রাত্রের কথাই নয়।

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

সুতরাং অর্ধ শা'বানের রাত্রের কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকছে না। যেমন ঐ দিনে মাগরেবের পর থেকে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নেমে আসার কথাও প্রমাণ হচ্ছে না। যেহেতু তা মিথ্যা

ও বানাওয়াটি কথা।

তৃতীয় অমূলক ধারণা ঃ

শবেবরাতে নাকি মৃত মানুষের রূহগুলো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পৃথিবীতে নেমে আসে। বিধবাদের স্বামীদের রূহও নাকি এই রাতে ঘরে ফেরে। তাই বিধবারা সাজ-সজ্জা করে নানা খাবার তৈরী রেখে ঘরে আলো জ্বেলে সারারাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে!

এ ব্যাপারে তাদের দলীল হল, সূরা লায়লাতুল ক্বাদরের নিম্নের আয়াত ঃ-

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ } (٤) سورة القدر

অর্থাৎ, উক্ত রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল এবং রূহ তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। *(সূরা ক্বাদর ৪ আয়াত)*

কিন্তু যাঁরা কুরআনের বাংলা তরজমাও পড়তে পারেন, তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ঐ রাত হল রমযান মাসের শবেকদরের রাত। যে রাতের নামে সূরাটির নামকরণ হয়েছে 'সূরা লায়লাতুল ক্বাদ্‌র।' তাহলে শবেকদরের ঘটনাকে শবেবরাতে জুড়ে দেওয়া কি মূর্খামি নয়?

তাছাড়া 'রূহ' বলতে মৃত ব্যক্তির আত্মা উদ্দেশ্য নয়। তা হলে তো বহুবচন শব্দ 'আরওয়াহ' ব্যবহার হত। এখানে 'রূহ' বলতে ফিরিশ্তা-সর্দার জিবরীল অথবা এক শ্রেণীর ফিরিশ্তাকে বুঝানো হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/৫৬৮)*

পক্ষান্তরে বিদিত যে, মানুষ মরণের পর মধ্য জগৎ 'বারযাখ' এ ভালো হলে ইল্লিয়্যীনে এবং মন্দ হলে সিজ্জীনে অবস্থান করে। সেখান হতে পুনরায় দুনিয়ার বুকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। তবে বৃথা কেন এই আয়োজন ও প্রতীক্ষা?

রূহ ঘরে ফিরার অলীক ধারণা রেখেই ঘর ও কবরগুলোকে ধূপ-ধুনো ও মোমবাতি তথা বিদ্যুৎবাতি দিয়ে সুরভিত ও আলোকিত করা হয়। আর এ কাজে হিন্দুদের দেওয়ালীর অনুকরণ ক'রে আমোদ-স্ফূর্তি করা হয়।

অথবা অনুকরণ হয় অগ্নিপূজকদের; যারা আগুনের তা'যীম ও পূজা করে। বলা বাহুল্য এটি হল, খলীফা হারুন রশীদের যুগে অগ্নিপূজক নও মুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত বিদআত। এরাই বাদশা হারুন রশীদকে পরামর্শ দিয়েছিল, কা'বা-গৃহে সুগন্ধী (চন্দন কাঠ) জ্বালানোর জন্য। যাতে সেই সুবাদে মুসলিমদের মসজিদ-সমূহে তাদের প্রিয় মা'বূদ আগুন প্রবেশ করে যায়। *(দেখুন ঃ আল-ইবদা' ফী মাযা-রিল ইবতিদা' ২৮৯পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩০০পৃঃ)*

সম্ভবতঃ রূহদেরকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে পটকা-বাজির ধুম ও সেই সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করা হয়!

অথচ আতশ বা পটকাবাজী বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া লক্ষ-লক্ষ টাকা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টা লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে।

এ খেলা কোন সময়ই বৈধ নয়। বৈধ নয় বিবাহ বা ঈদেও।

আগত রূহদেরকে খাওয়াবার জন্য হালোয়া-রুটির বিরাট আয়োজন করা হয়। আদায় করা হয়, খাওয়া হয়, দান করা হয়। মওতাদের নামে অর্থ অথবা খাদ্য দান করা ভালো জিনিস। কিন্তু নির্দিষ্ট করে ঐ রাতে কেন? শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট আমলকে অনির্দিষ্ট অথবা কোন অনির্দিষ্ট আমলকে স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করাও তো এক শ্রেণীর বিদআত। তাছাড়া

মুর্দার নামে নিজেদের উদরপূর্তি তথা আনন্দমেলাই হয় উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অমূলক ধারণাঃ কবর যিয়ারত

শা'বানের ১৫ তারীখের রাতে বা দিনে আত্মীয়রা দলেদলে কবর যিয়ারতে ছুটে যায়, এমনকি মেয়েরাও বিভিন্ন রঙে-ঢঙে কবর যিয়ারতে বের হয়। অথচ বিদিত যে, নির্দিষ্ট করে ঈদের দিন বা শবেবরাতের দিন কবর যিয়ারত করা বিদআত। তাছাড়া কবরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সেখানে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো হয়। আর এগুলিও বিদআত।

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়। কারণ, তাদের এমনিতেই ধৈর্য ও সহ্য শক্তি কম। তাছাড়া তারা শরীয়ত-বিরোধী কাজ অধিক করতে পারে যিয়ারতে গিয়ে। যেমন; চেঁচামেচি ও উচ্চস্বরে কান্না করবে, পর্দাহীনতার সাথে যিয়ারতে যাবে, অভ্যাসগতভাবে কবরস্থান বেড়াতে যাবে। (পার্ক মনে করে নেবে।) সেখানে বসে ফালতু আড্ডা দিয়ে বাজে কথাবার্তা বলবে। তাই তো পিয়ারা নবী ﷺ অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। *(তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৪নং)*

এই রাতে কবর যিয়ারত প্রমাণ করার জন্য যয়ীফ হাদীস পেশ করা হয়; বলা হয়, মহানবী ﷺ ঐ রাতে কবর যিয়ারত করতেন। অথচ তিনি বিশেষ করে কেবল অর্ধ শা'বানের রাতেই যিয়ারতে যেতেন না। বরং তিনি আয়েশার পালার প্রত্যেক রাতেই বাক্বীউল গারক্বাদের কবর যিয়ারতে যেতেন।

পঞ্চম অমূলক ধারণাঃ অস্বাভাবিক নামায

শবেবরাত আসলে শবেকদরের ভ্রান্ত রূপ। শবেকদরের আসল ছেড়ে শবেবরাতের নকল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি ক'রে ভাল বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত 'স্বালাতুল আলফিয়া' নামক নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামায মনগড়া বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪১-৩৪২পৃঃ)* শবেবরাতের নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারীখে রোযা রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাৎ ২ বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব কথা মিথ্যা ও খেয়ালী।

সুয়ূত্বী বলেন, 'এ নামাযের কোন ভিত্তি নেই।' *(আল-আম্র বিল-ইত্তিবা' ১৭৬পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসলও করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমল-নামায় লিখা হয়ে থাকে!!!

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত বিদআতী নামায পড়া হয়। পড়া হয় সূরা ইয়াসীন সহ আরো মনগড়া দুআ। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজারী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ দলীল নেই।

বিদআতীদের কাছে ঐ নামাযের গুরুত্ব খুব বেশী। বেনামাযীরাও ঐ রাতে নামায পড়ে। অনেকে ফজরের আগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরের ফরয নামায গুল করে থাকে!

আতর-সুরমা লাগিয়ে ঐ রাত জেগে জামাতী যিক্র ইত্যাদি শুরু হয় শামের সূফীদের দ্বারা। বিশেষ করে মকহুল, খালেদ বিন মা'দান ও লুকমান বিন আমের প্রমুখ তাবেয়ীগণ ঐ রাত জেগে ইবাদত করলে, তাঁদের দেখাদেখি ঐ নামায পড়ার ধুম শুরু হয়ে যায়। মদীনার

আলেমগণ এর প্রতিবাদ করেন। *(দেখুনঃ লাতায়েফুল মাআরিফ, ইবনে রজব)*

আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামাযের বিদআত চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাক্বদেসে। মূর্খ ইমামরা মাতব্বরি ও উদরপূর্তি করার জন্য এই ঘটা চালু করে। মনগড়া হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে বেশী লোক জমা করে বাদশার কাছে নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। অতঃপর এই বিদআতী নামায সেখানে ৩৫২ বছর চলতে থাকে। পরে ৮০০ হিজরীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। *(মিরকাত ২/১৭৮ মুল্লা আলী আল-ক্বারী)* কিন্তু ইরান-তুরান পার হয়ে সেই অগ্নিপূজকদের অগ্নিময় পরব ভারতের দেওয়ালী-মার্কা মুসলিমদের মাঝে চলে এল। সুতরাং তাতে সহীহ হাদীস মাননে-ওয়ালা সচেতন মুসলিমদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অমূলক ধারণাঃ রোযা

১৫ শা'বানের দিনে রোযা রাখা হয়। তাদের দলীল হল, হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মধ্য শা'বান এলে তোমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ।---" অথচ এই হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুনঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল জামে' ৬৫২নং)* সহীহ নয় ঐ দিনে রোযা সংক্রান্ত কোন হাদীসই।

হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল ﷺ শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখতে দেখি নি। আর শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোযা রাখতে দেখি নি।' *(আহমাদ, বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

উসামাহ বিন যায়দ ﷺ বলেন, 'একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা'বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)?' উত্তরে তিনি বললেন, "এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ১০০৮নং, তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ)*

অতএব সঠিক জিনিস পালন করুন, তাতে ফল পাবেন। আপনার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে বিশ্ব-রচনার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। তারপর আপনার কপালে ভাগ্য লিখা হয়েছে মায়ের পেটে। আর প্রত্যেক বছর লিখা হয় রমযান মাসের শেষ দশকে শবেকদরের রাতে। সেই রাতে বিধেয় ইবাদত করুন এবং বিদআত থেকে বাঁচুন। আর জেনে রাখুন যে, সাজ-সজ্জা ক'রে ক্ষণেকের আনুগত্য দেখিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায়, সৃষ্টিকর্তাকে তো ক্ষণেকের আনুগত্য দেখিয়ে খোশ ক'রে ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে যাওয়া বোকামি বৈ কিছু নয়। তিনি তো সার্বক্ষণিক আনুগত্য চান।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই---তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।'

ইসলামের চতুর্থ রুক্‌নঃ রমযানের রোযা

রমযান মাসের রোযা ইসলামের চার নম্বর রুক্‌ন। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর উপর রোযা ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াত)*

যে রমযান মাসে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য রোযা ফরয করেছেন, সে মাসটিকে তিনি নানা মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দিয়ে মন্ডিত করেছেন। যেমনঃ-

১। এই মাসে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الــشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। *(ঐ ১৮৫ আয়াত)*

২। কুরআন কারীমে কেবল এই মাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

৩। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। তিনি বলেন,

{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } (٣) سورة القدر

৪। এই মাসে শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

৫। এই মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

৬। এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

৭। এক আহবানকারী আহবান করতে থাকে, 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)।'

নবী ﷺ বলেন, "রমযান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয় তখন সকল শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। পরন্ত জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এই বলে আহ্বান করে, 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।' এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৪ নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

৮। এই মাসে উমরাহ করলে নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার সমান সওয়াব লাভ হয়।

রোযা রাখার বড় ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ-

১। 'যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ (বা ১০০) বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।" *(বুখারী ২৮৪০ নং, মুসলিম ১১৫৩ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

২। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা পালন করে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত ক'রে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

৩। "পাঁচ অক্তের নামায,এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান, এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। যদি বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তবে।" *(মুসলিম)*

এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে, তবেই অন্যান্য গুনাহ মাফ করা হবে। আর যারা নামায পড়ে না অথবা কেবল রমযান মাসে অথবা জুমআর নামায পড়ে, তাদের গুনাহ মাফ তো দূরের কথা, রোযা কবুলও হবে না।

৪। "আদম সন্তানের সকল আমলকে তার দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ শুধু রোযা ব্যতীত। কারণ রোযা হচ্ছে আমার জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই জন্য তার পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করে।"

৫। রোযাদারের জন্য দুটি খুশি, এক তার ইফতার করার সময় দ্বিতীয় তার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের সময়।

৬। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকে আম্বারের চেয়ে উত্তম।

৭। রোযা রোযাদারের জন্য ঢাল স্বরূপ। *(বুখারী-মুসলিম)*

৮। "কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী ﷺ বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৬৯ নং)*

আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা রাখার নানা উপকার আছে। সে উপকার দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ হবে। যেমনঃ-

১। রোযা রাখলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য হয়।

২। রোযা রাখলে আল্লাহ রোযাদারের প্রতি সন্তুষ্ট হন; এমনকি তিনি তার মুখের দুর্গন্ধকেও কস্তুরীর সুগন্ধের মত পছন্দ করেন।

৩। রোযাদার বিশেষ ক'রে রমযান মাসে ইফতারীর সময় বড় আনন্দ উপভোগ করে।

৪। কাল কিয়ামতেও রোযা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় আনন্দিত হবে।

৫। রোযা মানুষকে সংযমশীল করে। আর রোযার মহান উদ্দেশ্য সেটাই।

৬। রোযাদারের দুআ কবুল হয়। কেবল ইফতারীর সময় নয়, যে কোন সময়। ইফতারীর সময়

দুআর হাদীস সহীহ নয়।

৭। রোযাদারের গুনাহ-খাত্বা মাফ হয়ে যায়।

৮। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে।

৯। 'রাইয়ান' নামক বেহেশ্ত লাভ করে।

১০। রোযা রাখলে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১১। রোযা রেখে যৌন-জ্বালা প্রশমিত হয়। নবী ﷺ বলেন, "হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।" *(বুঃ, মুঃ, মিশকাত ৩০৮০নং)*

১২। রমযানের রোযা মানুষকে পাপ বর্জন করতে ও পুণ্য অর্জন করতে তথা সুন্দর চরিত্র গঠন করতে অভ্যস্ত করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ রোযা অবস্থায় থাকবে, তখন সে যেন অশ্লীল কথা ও উচ্চবাক্য (চেঁচামেচি) না করে। তাকে যদি কেউ গালি দেয় কিংবা ঝগড়া করে, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।" *(বুখারী -মুসলিম)*

নবী ﷺ বলেন, "যে (রোযাদার) মিথ্যা কথা এবং অসার কর্ম ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুখারী ১৯০৩নং, আসহাবে সুনান)*

১৩। রমযানের রোযায় রয়েছে সামাজিক উপকারিতা। একই সময়ে ইফতার, একই সঙ্গে তারাবীহর নামায, গরীবদের মাঝে দান বিতরণ প্রভৃতি সমাজকে উজ্জীবিত ক'রে তোলে। এমন সহানুভূতিপূর্ণ জামাআতী পরিবেশে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নবায়িত হয়। ইসলামী হারানো ঐক্য যেন প্রত্যাবৃত্ত হয়।

যে সকল আমল রমযান মাসে করণীয় হয়ঃ-

১। রোযা।

২। সাদকাহ, দান-খয়রাত।

৩। অন্নদান ঃ অপরকে ইফতারী করালে ডবল রোযার সওয়াব লাভ হয়। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৬৫ নং)*

৪। কুরআন তেলাঅত। যেহেতু এ মাস কুরআনের মাস। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৫। ই'তিকাফ। (শেষ দশকে)

৬। উমরাহ ঃ এতে রয়েছে নবী ﷺ-এর সাথে কৃত হজ্জের সওয়াব।

৭। শেষ দশকের রাতে ইবাদত ও শবেকদর অনুসন্ধান। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (রমযানের) শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং রাতে জাগতেন এবং পরিবার-পরিজনদেরকেও জাগাতেন। আর (ইবাদতের জন্য) কোমর বেঁধে নিতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৮। তওবা-ইস্তিগফার। যেহেতু এই মাসে হৃদয় ভিজে থাকে। এই মাসে বিভিন্ন পাপকাজ বর্জন করার সুযোগ হতে পারে।

৯। তারাবীহর নামায ঃ নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাস রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের (রাত্রে তারাবীহর) নামায পড়ে তার পূর্বেকার গোনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়।" *(বুখারী ২০০৯ নং, মুসলিম ৭৫৯ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

ব্রাদারানে ইসলাম! রোযা হল ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পানাহার ও যৌনাচার হতে বিরত থাকার নাম।

সুতরাং রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস হারাম। যদি কেউ ক'রে ফেলে, তাহলে তাকে তওবা-সহ কাযা ও যথারীতি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। গোলাম আযাদ করতে হবে। না পারলে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে। তাতেও সক্ষম না হলে ৬০জন মসিকীন খাওয়াতে হবে।

ইচ্ছাকৃত যে কোন প্রকারে বীর্যপাত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তওবা ও কাযা জরুরী। আর স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না।

যে কোন প্রকার পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়; এমনকি অখাদ্য বা হারাম খাদ্য খেলেও। অবশ্য কেউ ভুলে গিয়ে পান অথবা আহার করলে রোযা নষ্ট হবে না।

পানাহারের মত খাবার ইঞ্জেকশন (সেলাইন) নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

মহিলাদের মাসিক অথবা প্রসবোত্তর রক্ত দেখা দিলে রোযা হবে না। পরে তা কাযা করতে হবে।

ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়।

রোযা কার ওপর ফরয?

১। প্রত্যেক সাবালক জ্ঞানসম্পন্ন সামর্থ্যবান স্বগৃহে অবস্থানকারী মুসলিমের উপর রোযা ফরয।

২। কাফের মুসলমান হওয়ার পর থেকে রোযা রাখবে। পূর্বের রোযা কাযা করতে হবে না।

৩। নাবালক কিশোর-কিশোরীকে রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ ক'রে অভ্যাসী বানাতে হবে।

৪। পাগলের উপর রোযা ফরয নয়, তার তরফ থেকে মিসকীনও খাওয়াতে হবে না।

৫। অসমর্থ ব্যক্তি; যেমন চিররোগা, বৃদ্ধ ইত্যাদি রোযা রাখতে অক্ষম হলে তাদের তরফ থেকে প্রতি রোযার পরিবর্তে একটি ক'রে মিসকীন খাওয়াতে হবে। অথবা প্রতি রোযার পরিবর্তে সওয়া এক কিলো ক'রে চাল দান করতে হবে।

৬। সাময়িক রোগী রোযা না রাখতে পারলে সুস্থ হওয়ার পর তা কাযা করতে হবে।

৭। গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী কাযা করতে পারে।

৮। কেউ রোযা ছাড়তে বাধ্য হলে, কাযা করতে পারে।

৯। মুসাফির রোযা কাযা করতে পারে।

বাকী বিনা ওযরে যে রোযা রাখবে না, তার শাস্তির ব্যাপারে হাদীস শুনুনঃ-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর উর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ ক'রে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের

কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার ক'রে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯১নং)*

রোযা রেখে ইফতারীর সময় হওয়ার পূর্বেই ইফতার ক'রে নেওয়ার শাস্তি যদি এই হয়, তাহলে যারা বিলকুল রোযাই রাখে না, তাদের শাস্তি কি হতে পারে----তা একবার ভেবে দেখুন।

আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনের এই রুকন পালন করার তওফীক দিন আমীন।

রমযানের শেষ দশকের মাহাত্ম্য

রমযানের শেষ দশক, রমযানের সারাংশ, রমযানের মগজ। ব্রাদারানে ইসলাম! এই দশকে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে ইবাদত ক'রে নিন। হয়তো আপনার এই রমযানই শেষ রমযান।

সুতরাং সেইভাবে প্রস্তুতি নিন, যেভাবে আমাদের মহানবী ﷺ নিতেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যখন (রমযানের শেষ) দশক শুরু হত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*

'কোমর বেঁধে নিতেন' অর্থাৎ, ভালরূপে প্রস্তুতি নিতেন, মনকে সবল করতেন এবং ইবাদত করার জন্য তৈরী হতেন।

অথবা তিনি কোমরে কাপড় বেঁধে নিতেন, অর্থাৎ স্ত্রীদের নিকট যেতেন না। বরং সারা দিন রোযা রেখে সারাটি রাত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

শুধু শবেকদর নয়, বরং জোড়-বেজোড় প্রত্যেকটি রাতই জেগে ইবাদত করতেন। নামায পড়তেন, কুরআন তেলাঅত করতেন ইত্যাদি। আর এর ফলে শবেকদরও পেয়ে যেতেন।

পক্ষান্তরে যারা শবেকদর লাভের আশায় মাত্র বেজোড় রাত্রিগুলো জাগরণ করেন, তাদের তা লাভ করার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু যদি আপনি সব রাতগুলি জাগতে সক্ষম না-ই হন, তাহলে কমসে-কম বেজোড় রাতগুলি জেগে ইবাদত ক'রে শবেকদর অনুসন্ধান করুন। হয়তো বা আল্লাহ আপনাকে আপনার চাওয়া জিনিস দান করবেন।

শবেকদরকে আরবীতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বলা হয়। এর অর্থ হয় ঃ-

১। ভাগ্য-রজনী। এ রাতে এক বছরের রুযী, মরণ, ঘটন-অঘটন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। অথবা কদর-ওয়ালা রাত। অর্থাৎ, মহিয়সী রজনী। এ রাতের বড় মর্যাদা রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে।

৩। অথবা এ রাতের আমলের বড় কদর ও মর্যাদা রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে।

৪। অথবা এ রাতে আমলকারীর বড় কদর ও মর্যাদা রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে।

৫। অথবা 'ক্বাদ্‌র' মানে সংকীর্ণতা। অর্থাৎ, এ রাতে ফিরিশ্‌তামন্ডলীর আগমনে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়।

এ সর্বশ্রেষ্ঠ রাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

শবেকদর হাজার মাস, অর্থাৎ প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ, এ রাতে

ইবাদত করলে তার থেকেও বেশী সময় ইবাদত করার সওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই রাতে এক রাকআত নামায পড়লে প্রায় ৩০ হাজার রাকআত থেকে বেশী নামায পড়ার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

এই রাতে জিব্রাঈল সহ বহু ফিরিশ্‌তা পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

এই রাত সালামের রাত। ফিরিশ্‌তারা রাত জেগে ইবাদতকারীদেরকে সালাম দেন। অথবা এ রাত শান্তির রাত, এ রাতে শয়তান থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর কিসে তোমাকে জানাল, মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি কি? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফেরেশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। *(সূরা ক্বাদ্‌র)*

এ রাত মুবারক রাত, এ রাতে বর্কত অবতীর্ণ হয়।

এ রাতে বড় বড় বিষয়ে ফায়সালা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ ক'রে থাকি। এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা দুখান ৩-৬ আয়াত)*

এ রাত ইবাদতের রাত, গোনাহ-খাতা মাফ করাবার রাত।

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে শবেকদরে নামায পড়বে তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখবে, তারও পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।" *(বুখারী ১৯০১ নং মুসলিম ৭৬০ নং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

নবী ﷺ বলতেন, "এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েই গেল। এই মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ঐ রাত্রের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থেকে গেল। আর একান্ত চিরবঞ্চিত ছাড়া ঐ রাত্রের কল্যাণ থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হয় না।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৯৮৬)*

এ রাত রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলিতে আসে বলে বেশী আশা করা যায়। এর মধ্যে বেশী সম্ভাবনাময় রাত্রি হল ২৭শের রাত্রি।

রাতটিকে গোপন রাখা হয়েছে, যাতে আগ্রহশীল মানুষ তার অনুসন্ধানে বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদত করে।

এ রাতের সওয়াব পাওয়ার জন্য এ শর্ত নয় যে, ইবাদতকারী সে রাতের কথা জানতে পারবে। বরং অজান্তেও ঐ রাতে ইবাদত করলে ঐ সওয়াব লাভ হবে।

ঐ রাত জানার উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ঐ রাতে আকাশে এক প্রকার আলো উদ্ভাসিত হবে।

এ রাতে ইবাদতে খুব বেশী মন বসবে। নামায পড়ে মনে তৃপ্তি অনুভব হবে।

এ রাতে বাতাস ক্ষান্ত থাকবে।

এ রাতে তারা বা উল্কা ছুটবে না।

এ রাতে বৃষ্টি হতে পারে।

এ রাতের সকালে সূর্যের আলোতে তেজি থাকবে না।

পক্ষান্তরে এই ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন যে, এ রাতে গাছ-পালা সিজদা করে, কুকুর ভেকায় না, সমুদ্রের নোনা পানি মিঠা হয়ে যায়, ফিরিশ্তার সালাম শুনতে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ রাতে আপনি বেশী বেশী ক'রে দুআ করুন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নী।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।

এ রাত্রি জেগে নফল নামায পড়ুন। নচেৎ তারাবীর নামায ১১ রাকআতই পড়তে চাইলে ক্বিরাআত লম্বা ক'রে পড়ুন। অন্য সময় কুরআন তেলাঅত করুন, তাসবীহ-তাহলীল করুন এবং দুআ করুন।

এ রাত ইবাদতের রাত, এ রাত আনন্দ-ফুর্তি করার রাত নয়। খানপান করার রাত অবশ্যই নয়।

এ রাত কোন অনুষ্ঠান বা উৎসবের রাত নয়। সুতরাং সে রাতে অধিকরূপে আলো-সজ্জা করা, মিষ্টি-মিঠাই বিতরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ইসলামের ইবাদতকে আনন্দময় অনুষ্ঠানে যারা পরিবর্তন করে, তারা নিশ্চয় স্বার্থপর মুসলমান। সময়ে আনন্দ করা নিষেধ নয়, কিন্তু অসময়ে আনন্দ নিশ্চয় ভাল জিনিস নয়।

জীবন তো কয়টা দিনের নাম, কয় দিনই বা আনন্দ হবে? তাহলে যে কষ্ট ক'রে চিরদিনের জন্য আনন্দ লাভ করা যায়, তাই করা কি জ্ঞানীর কাজ নয়?

যুল-হজ্জের তেরো দিন

পরম করুণাময় আল্লাহ মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নিত্য-নৈমিত্তিক ইবাদত ছাড়াও তিনি ইবাদতের বিশেষ মৌসম নির্ধারিত করেছেন। বছরের কিছু দিনকে কিছু দিনের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাতে কিছু ইবাদত নির্দিষ্ট ক'রে বড় সওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন। আর তা শুধু আমাদের স্বার্থে।

এমনই একটি ইবাদতের মৌসম ঃ যুল-হজ্জের প্রথম তেরো দিন। এগুলির মধ্যে প্রথম দশ দিনের রয়েছে বড় ফযীলত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এই (যুলহজ্জ মাসের) দশটি দিন ছাড়া এমন কোন অন্য দিন নেই, যেদিনের নেক আমল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (অন্যান্য দিনে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। তবে (হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির

আমল ঐ দিনগুলিতে আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হবে), যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে যায়, অতঃপর তার কিছুই নিয়ে সে আর ফিরে আসে না।" *(বুখারী ৯৬৯নং, প্রমুখ)*

আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলির শপথ করেছেন। আর কোন জিনিসের নামে শপথ করা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। আল্লাহ পাক বলেন,

{وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ } (٢) سورة الفجر

অর্থাৎ, শপথ ঊষার, শপথ দশ রজনীর.....।" *(সূরা ফাজর ১-২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ এই দিনগুলিতে সৎকর্ম করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেহেতু এই দিনগুলি সকলের জন্য পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ এবং হাজীদের জন্য পবিত্রস্থানে (মক্কায়) আরো গুরুত্বপূর্ণ।

এই দিনগুলিতে অধিকাধিক তসবীহ, তহমীদ ও তকবীর পড়তে আদেশ রয়েছে।

এই দিনগুলির মধ্যে আরাফাহ ও কুরবানীর দিন রয়েছে।

এগুলির মধ্যেই কুরবানী ও হজ্জ করার মত বড় আমল রয়েছে।

ঐ দিনগুলির আমল জিহাদ থেকেও উত্তম বলা হয়েছে। অথচ আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সর্বোত্তম?' তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে; যেমন, নামায, রোযা, সদ্কাহ এবং হজ্জ। যা অন্যান্য দিনগুলিতে এইভাবে জমা হয় না। আর তার জন্যই ঐ দশদিন সারা বছরের সর্বোত্তম দিন।

অবশ্য জিহাদ ফরয হলে ভিন্ন কথা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোন শ্রেষ্ঠ আমল থেকেও অন্য আমল শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। যেমন কুরআন তেলাঅত তসবীহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল। কিন্তু রুকূ ও সিজদাতে তসবীহই শ্রেষ্ঠ। বরং সেখানে কুরআন তেলাঅত বৈধই নয়।

অবশ্য রমযানের শেষ দশকের ফযীলতও কম নয়। উলামাগণ বলেন, যুলহজ্জের প্রথম দশদিন বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আর রমযানের শেষ দশকের রাতগুলি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। যেহেতু তাতে রয়েছে শবেকদর, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্রাদারানে ইসলাম! সেই বর্কতময় দিনগুলি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। অতএব সেই দিনগুলির বর্কত হাসিল করার জন্য প্রস্তুতি নিন।

১। বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করুন এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন।

২। এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দৃঢ়-সংকল্প হন।

৩। যুল-হজ্জের চাঁদ দেখা গেলে এবং কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলে নখ, চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত হন।

নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা যুলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে তখন সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ (কাটা) হতে বিরত থাকে।" অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।" *(মুসলিম ১৯৭৭নং)*

অবশ্য প্রয়োজনে (যেমন নখ ফেটে বা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকলে বা মাথায় জখমের উপর চুল থাকলে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হলে) কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই। কারণ, সে মুহরিম (যে

হজ্জ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে সে) অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্য অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করাও বৈধ করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের তরফ থেকে অথবা জীবিত-মৃত কারো তরফ থেকে দানস্বরূপ কুরবানী করার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে, কেবল সেই এ নিষেধের আওতায় পড়বে। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী-সন্তানের তরফ থেকে কুরবানী করা হবে তারা এ নিষেধের আওতায় পড়বে না। অর্থাৎ, তাদের জন্য নখ-চুল ইত্যাদি কাটা হারাম হবে না।

এই নিষেধের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, কুরবানীদাতা কিছু আমলে হজ্জে ইহরাম বাঁধার মুহরিমের মতই। যেমন, কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা ইত্যাদি। তাই কুরবানীদাতাও মুহরিমের পালনীয় কিঞ্চিৎ কর্তব্য পালন করতে আদিষ্ট হয়েছে।

৪। বেশী বেশী যিক্র করুন।

এই দিনগুলিতে যিক্র করা অন্যান্য দিনের তুলনায় উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) (الحج: ٢٨)

অর্থাৎ, যাতে ওরা নির্দিষ্ট জানা দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে---। *(সূরা হজ্জ ২৮ আয়াত)*

অধিকাংশ উলামার মতে উক্ত আয়াতে 'নির্দিষ্ট জানা দিনগুলি' বলতে উদ্দেশ্য হল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন। বলা বাহুল্য, এ দশ দিনে আল্লাহর দ্বীনের একটি প্রতীক হল অধিকাধিক তাঁর যিক্র করা; 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও 'সুবহানাল্লাহ' পড়া এবং অধিক তাকীদরূপে 'আল্লাহু আকবার' পড়া।

সুতরাং এই মহান দিনগুলিতে বেশী বেশী করে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা উচিত। পাঠ করা উচিত বর্কতময় দিনগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে, সকালে-বিকালে, রাত্রে-ভোরে, মসজিদে-বাড়িতে, পথে-গাড়িতে, কর্মস্থলে এবং আল্লাহর যিক্র বৈধ এমন সকল জায়গাতে।

পক্ষান্তরে এই দিনগুলিতে তকবীর পাঠ হবে দুই ধরনের ঃ-

(ক) সময়-সীমাহীন অনির্দিষ্টভাবে তকবীর পাঠ। যা এ দশকের প্রথম দিনের মাগরেব থেকে তাশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ তারীখের) শেষ দিনের মাগরেব পর্যন্ত হাজী-অহাজী সকলের জন্য যে কোন সময়ে সর্বদা পাঠ করা বিধেয়। ইবনে উমার ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চ স্বরে) তকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। *(বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৫৩১)*

(খ) সময়-সীমাবদ্ধ তকবীর। আর তা হল প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তকবীর পাঠ করা। এ তকবীর আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত পাঠ করা বিধেয়। এ তকবীরের এত গুরুত্ব রয়েছে যে, কিছু উলামা বলেছেন, তা পড়তে ভুলে গেলে কাযা করতে হবে। অর্থাৎ নামাযের পর তা বলতে ভুলে গেলে মনে পড়া মাত্র তা পড়ে নিতে হবে; যদিও তার ওযূ নষ্ট হয়ে যায় অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য সময় লম্বা হয়ে গেলে সে কথা ভিন্ন।

৫। নফল রোযা রাখুন।

রোযা সমষ্টিগতভাবে এক শ্রেণীর নেক কাজ; বরং তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক কাজ। বলা বাহুল্য এ মাসের প্রথম ন' দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা মহানবী ﷺ এ দিনগুলিতে নেক আমল করতে উৎসাহিত করেছেন। আর রোযা হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। তাছাড়া মহানবী ﷺ খোদ এ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। তাঁর পত্নী (হাফসাহ রাঃ) বলেন, "নবী ﷺ যুল হজ্জের নয়

দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" *(সহীহ আবূ দাঊদ ২ ১২৯নং, নাসাঈ)*

অবশ্য যদি কেউ পূর্ণ নয় দিন রোযা রাখতে অপারগ হয়, তাহলে সে একদিন ছেড়ে পরদিন রাখতে পারে অথবা এর মধ্যে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে পারে।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ এ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। রোযা রাখতেন মুজাহিদ প্রমুখ উলামাগণ। এ দিনগুলিতে রোযা রাখলে মক্কার চাঁদ দেখা হিসাবেও আরাফাতের দিন রোযা রাখা হয়ে যাবে।

আরাফার দিনের ফযীলত

(ক) এই দিন আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ হওয়ার দিন।

উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁকে ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইয়াহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম" (এই আয়াত)। উমার ﷺ বললেন, 'ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫, মুসলিম ৩০১৭নং)*

উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত করা হয় যে, তিনি উক্ত জবাবে বলেছিলেন, 'ঐ আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দু'টি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ।'

(খ) এ দিন হল মুসলিম (হাজী)দের ঈদ।

মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ। আর তা হল পান-ভোজনের দিন।" *(আবূ দাঊদ২৪১৯, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪নং)*

(গ) আল্লাহ এ দিনের কসম খেয়েছেন।

মহান সত্তা মহা কিছুরই কসম খান। 'মাশহূদ' সেই দিনকে বলা হয়, যেদিন লোকেরা (কোন এক স্থানে) উপস্থিত ও জমায়েত হয়। অনেক তফসীরকারদের মতে তা হল আরাফার দিন। এই দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ কুরআনে (সূরা বুরূজের ৩নং আয়াতে) তার কসম খেয়েছেন।

এই দিনকে বিজোড় দিন বলে উল্লেখ করে তার কসম খেয়েছেন (সূরা ফাজরের ৩নং আয়াতে)। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আশ্-শাফ্উ' হল কুরবানীর দিন এবং 'আল-অত্র' হল আরাফার দিন।

(ঘ) এ হল সেই দিন, যে দিনে মহান স্রষ্টা আদম-সন্তানের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

(ঙ) এ দিন হল পাপরাশি মাফ হওয়ার দিন। দোযখ থেকে মুক্তি লাভের দিন।

(চ) এ দিনে মহান প্রতিপালক আরাফায় অবস্থানরত হাজীদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক অধিক দোযখ থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কি চায় ওরা?" *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকালে আরাফাত-ওয়ালাদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার নিকট ধূলিমলিন ও আলুথালু রুক্ষ কেশে উপস্থিত হয়েছে!" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা ৪/২৬৩)*

এই দিনকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করুন।

(ক) এই দিনটির সকল সময়ে ইবাদতে মশগূল থাকুন। অন্যান্য রাতের মত এর রাতে নামায পড়ুন এবং দিনে নানা প্রকার ইবাদত করুন। সাংসারিক কর্ম-ব্যস্ততা অন্য দিনের জন্য পিছিয়ে দিন।

(খ) এ দিনে রোযা রাখুন। যেহেতু মহানবী ﷺ এ দিনের প্রতি অধিক যত্নবান হতে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করেছেন। এ দিনে রোযা রাখার বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তিনি। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, "এ দিনের রোযা গত ও আগামী বছরের গোনাহ মোচন ক'রে দেয়।" *(মুসলিম ১১৬২নং)*

(ঙ) এই দিনে বেশী বেশী দুআ করুন। এই দিনের শ্রেষ্ঠ দুআ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।' *(তিরমিযী ২৫৮৫নং)*

দান-খয়রাত প্রভৃতি অন্যান্য নেক আমল করতে প্রয়াসী হন। আর কুরবানীর দিন কুরবানী করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তওফীক দিন। আমীন

ইসলামের পঞ্চম রুক্ন ঃ হজ্জ

ব্রাদারানে ইসলাম! হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুক্ন। হজ্জ সামর্থ্যবান মুসলিম (পুরুষ বা নারী) এর উপর মহান আল্লাহর তরফ হতে এক ফরযকৃত আমল। তিনি বলেন,

{وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে যার (মক্কায় যাবার) সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (কা'বা) গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য (ফরয)। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে,) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী।" (তিনি জগতের উপর নির্ভরশীল নন।) *(কুঃ ৩/৯৭)*

কুরআনের এই আয়াতের বাচনভঙ্গি আরবী ভাষায় অত্যাবশ্যকতার (ফরয বা ওয়াজেব হওয়ার) উপর বড় তাকীদ বহন করে; যে গুরুত্বপূর্ণ তাকীদ দ্বারা হজ্জকে ফরয করা হয়েছে এবং তার মর্যাদাকে সুউন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তার সাথে 'কুফ্র' শব্দ যুক্ত হয়ে ফরযকে

অধিক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। আর এই ফরযকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারকারীর প্রতি তিরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। *(ফতহুল কাদীর ১/৩৬৩)*

আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ইসলাম পাঁচটি (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত; আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর দূত (রসূল) এই সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর (মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত কা'বা শরীফের) হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা পালন করা।" *(বুখারী ৮নং,মুসলিম)*

হজ্জ জীবনে একবার ফরয। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "হজ্জ একবার, যে ব্যক্তি অধিকবার করবে তা (তার জন্য) নফল হবে।" *(আবূদাউদ ১৭২১নং)*

অনুরূপ উমরাও জীবনে অন্ততঃ একবার পালন করা কর্তব্য।

রসূল ﷺ এই দুই ইবাদত করার উপর উম্মতকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যেহেতু এই ইবাদতের মাঝে রয়েছে আত্মশুদ্ধি, গোনাহর ময়লা ও দাগ হতে চিত্ত-প্রক্ষালন। যাতে মুসলিম পরকালে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সমাদর পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং (সেই হজ্জে) যৌনাচার ও কোন পাপ (বা অন্যায় কাজ) না করে, তবে সে সেই দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে, যেদিন তার জননী তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ১৪৪৯, মুসলিম ১৩৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, "এক উমরা হতে অপর এক উমরা, উভয়ের অন্তর্বর্তীকালীন পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছু নয়।" *(বুখারী ১৬৮৩, মুসলিম ১৩৪৯নং)*

গৃহীত হজ্জ সেই হজ্জকে বলা যেতে পারে, যে হজ্জ বিশুদ্ধচিত্তে করা হয়, যার সমূদয় রীতি-নিয়ম যথার্থরূপে পালন করা হয়, যা সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়, মঙ্গল ও সদাচার দ্বারা পূর্ণ হয় এবং যৌনাচার কলুষ ও তর্ক-বিবাদ হতে বিশুদ্ধ হয়।

হজ্জের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। আল্লাহর পথে জিহাদের পর মর্যাদায় এই হজ্জেরই স্থান রয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

ঐ হজ্জের একটি প্রধান অঙ্গ আরাফাত ময়দানে অবস্থান। সকল হাজীকে নবম যুলহজ্জে ঐ ময়দানে কিছুকালও অবস্থান করতেই হয়। যেদিনের মর্যাদা প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, "আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক অধিক জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কি চায় ওরা?" *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

হজ্জের অধিকাংশ কার্যাবলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে, তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি করে পাপ মোচন করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'আমার ঐ বান্দাগণ আলুথালু কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসে আমার রহমতের আশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কি করত? সুতরাং তোমার যদি বালির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা

আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত ক'রে দেবেন।

পাথর মারার সওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে।

মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লেখা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)*

হজ্জের সমস্ত শর্তাবলী পূর্ণ হলে (ভারপ্রাপ্ত) মুসলিমের উপর ওয়াজেব, সে যেন বিলম্ব না করে সত্বর হজ্জের ফরয আদায় করে। যেহেতু বিনা ওযরে হজ্জ পালনে বিলম্ব বা গয়ংগচ্ছ করলে সে গোনাহগার হবে। *(আল ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ ১১৫ পৃঃ)*

অনেক যুবক হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও ভাবে, এখন হজ্জ করলে ফিরার পর মরণ পর্যন্ত বহু সময় বাকী থাকবে, তাতে পাপও হবে বেশী। তাই মরণের পূর্বকাল বার্ধক্যের অপেক্ষা করে। অথচ মিসকীন জানে না যে, তার মৃত্যু কখন আসবে। ফলে এইভাবে ফরয আদায়ে অবহেলা করে। অনেকে পিতা-মাতার বর্তমানে হজ্জ হয় না মনে করে। ফলে এই সব খোঁড়া ওজুহাত ও ছল-বাহানা ক'রে যখন মরে, তখন সে মহাপাপী হয়ে মরে।

সামর্থ্যবান পিতা অথবা অভিভাবকের কর্তব্য তার অধীনে সকল পরিজনের জন্য হজ্জের সুবন্দবস্ত ক'রে দেওয়া, যাতে তারাও নিজের ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে।" *(বুখারী ৮৫৩, মুসলিম ১৮২৯, তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/ ১০৮)*

আল্লাহর আদেশ পালনে বা কোন সৎকাজে শীঘ্রতা করা ও ফরয আদায়ে প্রতিযোগিতা ও তড়িঘড়ি করা ওয়াজেব। হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিনা ওজরে ও বাধায় ফরয আদায়ে বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে। যেমন, "(ফরয) হজ্জ পালনের জন্য শীঘ্রতা কর। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না যে, তার কি অসুবিধা উপস্থিত হতে পারে।" *(মুসনাদে আহমাদ ১/৩১৪, ইরওয়াউল গালীল ৪/ ১৬৮)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য; যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান; যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(কুঃ ৩/ ১৩৩)*

তিনি অন্যত্র বলেন, (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)

অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(কুঃ ২/ ১৪৮)*

হজ্জের শর্তাবলীর মধ্যে সাবালকত্ব ও সামর্থ্য অন্যতম। তবে ছোট নাবালক-বালিকা যদি পিতা-মাতা বা অপর কারো সাথে হজ্জ করে, তাহলে সে হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং পিতা-মাতা সওয়াবের অধিকারীও হবে। কিন্তু ঐ হজ্জ করে তাদের ফরয আদায় হবে না। বলা বাহুল্য, সাবালক হওয়ার পর যদি হজ্জের অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়, তবে তাদের উপর আবার হজ্জ আদায় ফরয হবে।

সামর্থ্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।" *(কুঃ ৩/৯৭)* আর সামর্থ্যবান সেই

ব্যক্তি, যে সশরীরে নিজের উত্তম (হালাল) সম্পদ দ্বারা হজ্জ করার ক্ষমতা রাখে। ধনবল না থাকলে ঋণ করে হজ্জ করা জরুরী নয়। যেমন ঋণগ্রস্ত থাকলে হজ্জ ফরয নয়। *(আল মুমতে' ৭/৩০)*

যদি কেউ শারীরিক অক্ষম হয় কিন্তু আর্থিক সক্ষম থাকে, তবে দেখতে হবে যে, তার ঐ দৈহিক অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা আছে কি না? যদি বার্ধক্য অথবা চিররোগের কারণে হজ্জে অসমর্থ হয়, তবে সে তার সম্পদ দিয়ে অপরকে নায়েব করে হজ্জ করাবে। আর যদি ঐ অক্ষমতা দূর হওয়ার আশা থাকে, তবে আরোগ্যলাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিজে হজ্জ আদায় করবে। আবার অপেক্ষাকালে যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে ত্যক্ত সম্পদ হতে তার ছেলেরা বা অন্য কেউ (তার নামে) হজ্জ করবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি অপরের তরফ থেকে নায়েব হয়ে (অপরের নামে) হজ্জ করবে তার জন্য শর্ত হল, সে যেন পূর্বে তার নিজের ফরয হজ্জ আদায় করে থাকে। নিজে হজ্জ না করে থাকলে অপরের নামে হজ্জ হবে না। অনুরূপভাবে উমরাতেও এই সব নীতি মান্য ও পালনীয়। এতে পুরুষের তরফ থেকে নারী অথবা নারীর তরফ থেকে পুরুষ হজ্জ বা উমরাহ করতে পারে।

যেমন মহিলার হজ্জের শর্ত হল, মাহরাম থাকা। যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম, তার সাথে অথবা স্বামীর সাথে হজ্জ করতে যেতে পারে।

ব্রাদারানে ইসলাম! সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালনে তড়িঘড়ি করুন। হালাল টাকা নিয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ ক'রে আসুন। সুনাম নেওয়ার জন্য অথবা বদনাম থেকে বাঁচার জন্য নয়, বরং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট ক'রে জান্নাত নেওয়ার জন্য ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য হজ্জে যান। ইন শাআল্লাহ আপনার হজ্জ কবুল হবে।

মক্কা না গিয়ে হজ্জ-উমরাহ

মহান আল্লাহ ধনীদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। জীবনে একবার তা করতে হয়। তিনি বলেছেন,

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। *(সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*

তার সওয়াবের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?' তিনি বললেন, "কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী)*

আর যদি আপনি সাহাবীর হজ্জ করতে চান, অর্থাৎ, মহানবী ﷺ-এর সাহচর্যে হজ্জ করতে চান, তাহলে রমযান মাসে উমরাহ করুন। নবী ﷺ বলেছেন, মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু কেউ একাধিকবার করতে চাইলে করতে পারেন, তার মাহাত্ম্যের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে, যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত ক'রে ফেলে।" *(সহীহ নাসাঈ ২৪৬৭ নং)*

কিন্তু যার হজ্জ একাধিকবার করার সামর্থ্য নেই অথবা মোটেই করার ক্ষমতা নেই, সে কি হজ্জ-উমরার সওয়াব লাভ করতে পারে? অবশ্যই পারে। মেহেরবান আল্লাহ সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। তিনি গরীবের হজ্জের ব্যবস্থা করেছেন। কোন মাযারে গেলে গরীবের হজ্জ হয় না, বরং শির্ক হতে পারে। পক্ষান্তরে শরীয়তের নির্দেশ মতে কর্ম করলে মক্কা না গিয়ে ঘরে বসে আপনি হজ্জ-উমরা করতে পারেন; অর্থাৎ তার সওয়াব অর্জন করতে পারেন। বছরে মাত্র একবার হজ্জ হয়, অথচ আপনি এক বছরেই কয়েক শ' হজ্জও ক'রে নিতে পারেন!

মহান আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার জন্য সওয়াবের নানা ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আপনি বসে থেকে টাকা খরচ ক'রে হজ্জ-উমরার সওয়াব নিতে পারেন। কাউকে হজ্জ-উমরার খরচ দিয়ে মক্কা পাঠাতে পারেন। তাতে আপনি তার সওয়াব লাভ করবেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধা প্রস্তুত ক'রে দিল, অথবা হাজী প্রস্তুত ক'রে দিল, অথবা তার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, অথবা রোযা ইফতারী করাল, সেই ব্যক্তিরও তাদেরই মত সওয়াব হল; তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)*

কিন্তু হজ্জ-উমরাহ করাবার মতো যদি আপনার মাল না থাকে, তাহলে এমন কাজ করুন, যাতে হজ্জ-উমরার সওয়াব আছে। যেমন ঃ-

(১) ফজরের নামায জামাআতে পড়ার পর বসে ইবাদত ক'রে ইশরাকের নামায পড়ুন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

সুতরাং এই কাজ প্রত্যহ ক'রে আপনি বছরে ৩৬৫টি হজ্জ-উমরাহ করতে পারেন!

(২) দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া অথবা নেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসুন, তাতে আপনার জন্য হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। যতবার যাবেন, ততবার আপনার হজ্জ করা হবে!

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮১নং)*

(৩) জামাআতে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে অথবা চাশ্‌তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসুন, তাহলে হজ্জ-উমরার সওয়াব পাবেন।

যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, তার এ কাজ হজ্জের মত

এবং যে ব্যক্তি নফল (চাশ্‌তের) নামায পড়ার উদ্দেশ্যে আসে, তার এ কাজ নফল উমরার মত। *(আহমাদ, আবূ দাউদ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহ থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর মতো। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে---তা এমন আমল, যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবূ দাউদ, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

ভেবে দেখুন যে, আপনি প্রত্যেক দিন পাঁচ অক্তের নামায জামাআত সহকারে পড়লে ৫ বার হজ্জ করা হয়। আর এইভাবে বছরে ১৮২৫টি হজ্জের সওয়াব আপনি সঞ্চয় করতে পারেন! আর তাতে একটি পয়সাও আপনাকে খরচ করতে হবে না।

(৪) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তসবীহ, তহমীদ ও তকবীর পড়ুন হজ্জ-উমরার সওয়াব হবে।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদকাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।) তিনি বললেন, প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।" ('আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার।) *(বুখারী-মুসলিম)*

(৫) মদীনা বা তার আশপাশে থেকে কুবার মসজিদে কোন নামায পড়লে একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে ওযূ ক'রে) বের হয়ে এই মসজিদে (কুবায়) উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করা সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

(৬) হজ্জ-উমরার পাকা নিয়ত রাখুন। দৃঢ়-সংকল্প হন যে, টাকা হলেই আমি হজ্জ-উমরা করব, তাহলে হজ্জ-উমরার সওয়াব পাবেন---ইন শাআল্লাহ।

নবী ﷺ বলেন, "তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো, দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে;

(ক) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।

(খ) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে, 'যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম।' সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান।

(গ) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।

(ঘ) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, 'যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম।' সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান। *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)*

মুহার্রম ও আশূরা

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বান্দা উপর অগণিত। প্রয়োজন আছে প্রতিযোগী লোকের; যারা আপোসে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেককে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে নড়তে-সরতে দেখা যায় না।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি বারোটি মাসের মধ্যে যে চারটি মাস 'হারাম', তার মধ্যে মুহার্রম মাস একটি। শরীয়তে এ মাসের যে মর্যাদা রয়েছে, তা রক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের অতিরিক্ত কর্তব্য হিসাবে রোযা পালন করার বিধান রয়েছে।

সুন্নত রোযাসমূহের মধ্যে মুহার্রাম মাসের রোযা অন্যতম। রমযানের পর পর রয়েছে এই রোযার মান। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম ১১৬৩নং, সুনান আরবাআহ, ইবনে খুযাইমাহ)*

মুহার্রাম মাসের রোযার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকীদপ্রাপ্ত হল ঐ মাসের ১০ তারীখ আশূরার দিনের রোযা। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে এই রোযা ওয়াজেব ছিল। রুবাইয়ে' বিন্তে মুআউবিয বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আশূরার সকালে মদীনার আশেপাশে আনসারদের বস্তিতে বস্তিতে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, "যে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ ক'রে নেয়। আর যে ব্যক্তি রোযা না রাখা অবস্থায় সকাল করেছে, সেও যেন তার বাকী দিন পূর্ণ ক'রে নেয়।"

রুবাইয়ে' বলেন, 'আমরা তার পর হতে ঐ রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলোর খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত।' *(আহমাদ ৬/৩৫৯, বুখারী ১৯৬০, মুসলিম ১১৩৬, ইবনে খুযাইমা ২০৮৮নং, বাইহাক্বী ৪/২৮৮)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে আশূরার রোযা পালন করত। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-ও জাহেলিয়াতে ঐ রোযা রাখতেন। (ঐ দিন ছিল কাবায় গিলাফ চড়াবার দিন।) অতঃপর তিনি যখন মদীনায় এলেন, তখনও তিনি ঐ রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশূরার রোযা ছেড়ে দিলেন। তখন অবস্থা এই হল যে, যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে না।' *(বুখারী ১৯৫২, ২০০২, মুসলিম ১১২৫নং প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।" সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ১১৩০নং)*

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আদেশ ছিল মুস্তাহাব। যেমন মা আয়েশার উক্তিতে তা স্পষ্ট। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "আজকে আশূরার দিন; এর রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেন নি। তবে আমি রোযা রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবে না।" *(বুখারী ২০০৩, মুসলিম ১১২৯নং)*

আবু কাতাদাহ ؓ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লার রসূল ﷺ আশূরার দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আমি আশা করি যে, (উক্ত রোযা) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেবে।" *(আহমাদ ৫/২৯৭, মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৫, বাইহাক্বী ৪/২৮৬)*

ইবনে আব্বাস ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশূরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)* অনুরূপ বর্ণিত আছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। *(বুখারী ২০০৬, মুসলিম ১১৩২নং)*

এক বর্ণনায় আছে, 'এই রোযা এক বছরের রোযার সমান।' *(ইবনে হিব্বান ৩৬৩১নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি আশূরার রোযা রাখবে তার জন্য তার একদিন আগে (৯ তারীখে) ও একটি রোযা রাখা সুন্নত। যেহেতু ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম ক'রে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখ।' *(বাইহাক্বী ৪/২৮৭, আব্দুর রায্‌যাক ৭৮৩৯নং)*

পক্ষান্তরে "তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি রোযা রাখ" -এই হাদীস সহীহ নয়। *(ইবনে খুযাইমা ২০৯৫নং, আলবানীর টীকা দ্রঃ)* তদনুরূপ সহীহ নয় "তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি রোযা রাখ" -এই হাদীস। *(যাদুল মাআদ ২/৭৬ টীকা দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, ৯ ও ১০ তারীখেই রোযা রাখা সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারীখে রোযা রাখা মকরূহ। *(ইবনে বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৭০)* যেহেতু তাতে ইহুদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, 'মকরূহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশূরার দিন) রোযা রাখলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।'

জ্ঞাতব্য যে, হুসাইন ؓ-এর এই দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ রোযার নিকট অথবা দূরতম

কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ﷺ এই দিনে রোযা রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপ্পড় মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রহার ইত্যাদি ক'রে থাকে, তা জঘন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

পরন্তু মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম ৬৭নং)*

আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।" *(মুসলিম)*

আসলে বিলাপ ও মাতম ক'রে কান্না করা মহিলাদের অভ্যাস। তাই রসূল ﷺ মহিলাদের জন্য বলেছেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে মৃত স্বামী হলে তার উপর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ১২০১ক, মুসলিম ২৭৩০ক, প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরার আগে তওবা না ক'রে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!" *(বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, (আমার পিতা) আবূ মূসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিৎকার ক'রে কান্না শুরু ক'রে দিল। সে অবস্থায় আবু মূসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, 'সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চ রবে বিলাপ করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুন্ডন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। *(বুখারী কাটা সনদে ১২৯৬নং, মুসলিম ১০৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮৬নং, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

মাতম করা বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ক'রে শোকপালন করা শরীয়তে বৈধ নয়; না হযরত হুসাইনের জন্য, আর না-ই তাঁর থেকে বড় কোন সাহাবী অথবা কোন নবীর জন্য। কেবল শহীদদের জন্য হলেও আপনি কাকে ছেড়ে কার কত শোক পালন করবেন? প্রায় দিনই তো

কেউ না কেউ শহীদ হয়েছেন।

আশূরার দিন 'মহর্রম' পরব মানাতে গিয়ে কিছু মুসলমান তাযিয়া বানিয়ে থাকে। হযরত হুসাইনের নকল কবর বানিয়ে তা রথের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় নকল কারবালার ময়দানে। আর সেই সঙ্গে ঢাক-ঢোল, বাজনা-বাঁশি, শির্কী ও বিদআতী মর্সিয়া সহ মাতম করা হয়, তলোয়ার ও লাঠি খেলা হয়, আত্মপ্রহার করা হয়, মদ খেয়ে নাচা হয় ও আমোদ-ফূর্তি করা হয়।

দলে দলে যিয়ারত করা হয় সেই নকল কবরের, সিজদা করা হয়, সেখানে নযর মানা ও পূরণ করা হয়। আর এ সব যে ইসলামী শরীয়তে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায় নিশানা বের ক'রে মর্সিয়া (শোকগাথা) গেয়ে বেড়ায়। যে মর্সিয়াতে সাহাবী মুআবিয়া ﷺ ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে গালাগালি করা হয়, কাফের বলা হয়, ইত্যাদি।

অথচ আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।" *(বুখারী)*

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না।" *(সহীহ তিরমিযী ২/১৯০)*

কাউকে কাফের বলাও সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু তাতে নিজের ক্ষতি নিজে করা হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'কাফের' বলে তাদের উভয়ের একজনের উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যদি সে কাফের হয় যেমন সে বলে; নচেৎ তা তারই উপর ফিরে আসে।" *(মুসলিম)*

"কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলে অভিহিত করে, তখন তা তারই উপর ফিরে আসে যদি অপর ব্যক্তি তা না হয়।" *(বুখারী)*

খানা-পানি দান করা ভালো জিনিস হলেও ঐ দিনে দান করা ভালো বলে কোন দলীল নেই। আর সেই জন্য নির্দিষ্ট ক'রে ঐ দিনে তা দান করা বিদআত।

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আমোদ করতে গিয়ে মুসলিমদের কত শত অর্থের অপচয় ঘটে। যে অর্থ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

পক্ষান্তরে এক সম্প্রদায়কে দেখা যায় যে, ফূর্তি ও ফুটানি করার জন্য তাদের পকেটে পয়সা নেই দেখে অমুসলিমদের পূজোর চাঁদা তোলার অনুকরণে তারাও জোরপূর্বক পথে-বাজারে চাঁদি ফাটিয়ে চাঁদা তুলে বেড়ায়। যাতে তারা উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘৃণিত হয়। দেশের আইনের কাছেও তারা হয় অপরাধী।

অমুসলিমরা হয়তো ধারণা করে যে, এটাও হল ইসলাম এবং এটাই হল মুসলমানদের প্রধান পর্ব! অথচ মুসলিমের ঘরে জন্ম নিয়ে তারা যে, কুলের কুলাঙ্গার তা তাদেরকে কে বুঝাবে? কে বুঝাবে যে, তাদের ঐ ইসলামে যদি ঐ শ্রেণীর আমোদ-ফূর্তি না থাকতো, তাহলে ভুলেও তারা সে কাজ করতো না। যেহেতু তারাই তো কোন মাদ্রাসার জন্য মুসলিমদের কাছে চাঁদা করতে দেখলে নাক সিঁটকায় এবং তারই জন্য মাদ্রাসার শিক্ষাকে 'ভিখেরী বিদ্যা' বলে অভিহিত করে।

আসলে বিজাতির দেখাদেখি আনন্দ লাভের মানসে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতার হৈচৈ-এ সীমাবদ্ধ ক'রে ঐ শ্রেণীর লোকেরা এই ধরনের পরব পালন ক'রে থাকে। আসলে হযরত হুসাইন বা তাঁর

নানা (ﷺ)র প্রতি যতটা মহব্বত তারা প্রকাশ ক'রে থাকে, তার থেকে আরো বেশী প্রকাশ ক'রে থাকে আমোদ-ফূর্তির প্রতি তাদের প্রধান মহব্বত। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ দেখান। আমীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিদআতের এই ঘটা নবী বা সাহাবাদের যুগে ছিল না। ছিল না তাবেয়ীদের যুগে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এই বিদআত সর্বপ্রথম চালু করে রাজা মুইয্‌যুদ দাওলাহ (মুয়ীজুদ্দুল্লা) ফাতেমী বাগদাদে ৩৫২ হিজরীতে। আর ধীরে ধীরে ইরান-তুরান পার হয়ে তা উপমহাদেশে চালু হয় প্রায় ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাদশাহ তৈমুরলঙ্গের যুগে।

হুসাইন ﷺ মুহার্রাম ও আশূরাকে কেন্দ্র করে কত শত বানাওয়াটি ও মনগড়া হাদীস ও ইতিহাস তৈরী হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একাধিক উপন্যাস ও কাব্য। আর সেই সব মনগড়া হাদীস ও উপন্যাসকে ভিত্তি ক'রে আমাদের যুবকরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে আনন্দবোধ করছে।

প্রকাশ থাকে যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন ইতিহাসের বই নয়; বরং তা একটি উপন্যাস। সুতরাং সেই বই থেকে ইতিহাস গ্রহণ ক'রে তা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়।

আমাদের উচিত, নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের সকলের প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত রাখা। তা না রাখলে আমাদের ঈমান থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে এই দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করা, ভালো খাবার খাওয়া, বিশেষ কোন নামায পড়া, দান-খয়রাত করা, বিশেষ করে শরবত-পানি দান করা, কলপ ব্যবহার করা, তেল মাখা, সুরমা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিদআত। এ সকল বিদআত হযরত হুসাইন ﷺ-এর খুনীরাই আবিষ্কার ক'রে গেছে। *(তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ দ্রঃ)*

নবী-দিবস

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী ﷺ নবুঅতের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন ক'রে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন আনন্দ অথবা শোকপালন ক'রে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা একাকী নবীদিবস পালন ক'রে যাননি। অন্য কোন সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এত ভালোবাসা ও

শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঈ অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। সুতরাং তা যে নব আবিষ্কৃত বিদআত, তা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া অধিকাংশ 'ঈদে-মীলাদুন-নবী'র অনুষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তা গর্হিত, বিদআত এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ; এর অন্যথা নয়। পক্ষান্তরে এই ঈদে মীলাদ রসূল ﷺ, তাঁর সাহাবাবৃন্দ, তাবেয়ীবর্গ, চার ইমামগণ এবং শ্রেষ্ঠতম (প্রারম্ভিক) শতাব্দীগুলির অন্য কেউই পালন ক'রে যাননি। আর এর সপক্ষে কোন শরয়ী প্রমাণও নেই। যদি তা পালন করা বিধেয় বা ভালো হত, তাহলে আমাদের আগে তাঁরাই তা পালন করে যেতেন। আর যখন তাঁরা তা পালন করে যাননি, তখন বোঝা গেল যে, অবশ্যই আমাদের তা পালন করা বিদআত ও হারাম।

খ্রিষ্টানরা আন্দাজে ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব (মীলাদ, বড়দিন বা ক্রিষ্টমাস ডে) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে') বড় আনন্দের সাথে পালন ক'রে থাকে। মুসলিমরা তাদের মত আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদআত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীদিবস (ঈদে-মীলাদুন-নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) 'হ্যাপি বার্থ ডে'র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ক'রে থাকে। অথচ তাদের রসূল ﷺ তাদেরকে সাবধান ক'রে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই একজন।" *(আবুদাঊদ)*

ওদের অনেকে বলে থাকে, 'আমরা মীলাদে রসূল ﷺ-এর জীবনচরিত আলোচনা করি।' কিন্তু বাস্তবে ওরা এমন সব কিছু করে ও বলে, যা তাঁর বাণী ও চরিতের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট ক'রে উক্ত দিনে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করাও বিদআত। আর নবীর প্রেমিক তো সেই ব্যক্তিই যে বৎসরান্তে একবার নয় বরং প্রত্যহ তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা ও পাঠ করে। জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে কেবল তাঁরই অনুসরণ করে। আর মসজিদ ও মাদ্রাসায় প্রায় তো তাঁর জীবনের কথা আলোচিত হয়েই থাকে। এর জন্য 'মীলাদ' অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

পরন্তু রবিউল আওয়াল; যে মাসে (এবং অনেকের মতে, যে দিনে) তাঁর জন্ম ঠিক সেই মাসেই (ও সেই দিনেই) তাঁর মৃত্যু। সুতরাং তাতে শোক-পালনের চেয়ে আনন্দ প্রকাশ নিশ্চয় উত্তম নয়। পক্ষান্তরে শোকপালনও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

আর কোন কাজকে ভালো মনে করেই করলে তা করা যায় না। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জন্ম-কাহিনী শোনাবার, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার, তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার, মানুষকে ধর্মের প্রতি আহবান করার আরো বহু সময় ও ক্ষেত্র আছে। কেবল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন তা করতে হবে। তাছাড়া ভালোর এ পদ্ধতি কি আল্লাহর হাবীব ﷺ ও তাঁর অনুগত সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-দের কি জানা ছিল না? কৈ তাঁরা তো তা ক'রে বা বলে গেলেন না? নাকি ঐ হুজুরদের ভালো বুঝার ক্ষমতাটা তাঁদের চাইতেও বেশী। আর তা হলে ঐ হুজুরদের ভ্রষ্টতার ব্যাপারে কি আপনার এখনো কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আমার পূর্বেও যে সকল আম্বিয়া ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই দায়িত্ব ছিল যে, তাঁরা যা উম্মতের জন্য উত্তম বলে জানবেন, তা তাদেরকে অবহিত করবেন এবং যা তাদের জন্য মন্দ বলে জানবেন, তা হতে তাদেরকে সতর্ক করবেন।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মীলাদে যে সকল কাজ করা হয়, তা তো ভাল কাজ, অতএব ভালো কাজে ক্ষতি কি?

কিন্তু কাজ ভালো হলেই যে ইচ্ছামত করা যাবে তা নয়। শরীয়তের নির্দেশিত পদ্ধতি, পরিমাণ, স্থান ও কাল হিসাবে না করলে কোন কাজ ভাল হলেও তা আসলে ভাল নয়। যিক্‌র ভাল হলেও নেচে নেচে যিক্‌র ভাল নয়। নামায ভাল, কিন্তু অসময়ে নামায ভাল নয়। সদকাহ করা ভাল, কিন্তু অপাত্রে সদকাহ করা ভাল নয়। হজ্জ করা ভাল, কিন্তু যিলহজ্জের ঐ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময় হজ্জ ভাল নয়, মকবূল নয়। তওয়াফ ভাল, কিন্তু কা'বা ছাড়া অন্য কিছু তওয়াফ নিশ্চয় ভাল নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে প্রশ্ন করেন, মীলাদ যদি শরীয়তে না-ই থাকে, তাহলে তা এল কোত্থেকে?

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফ্‌ফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ' ১১/৩৪৬)*

মীলাদের সময় তারা বিভিন্ন খানকাহে গান-বাজনার আসর বসাত। কোন কোন বছরে মুহার্রম ও সফর থেকেই মীলাদের আনুষ্ঠানিক মৌসম শুরু ক'রে দিত। সেই উপলক্ষ্যে গরু-ছাগল যবাই ক'রে খানা দেওয়া হত। কবি, গায়ক ও মীলাদপাঠক হুজুরদের সরগরম ভিঁড় জমে উঠত।

মীলাদ উপলক্ষ্যে মিথ্যা কাহিনী, গল্প ও কবিতা (না'ত-গজল) তৈরী করা হত। বহু হুজুর তার সপক্ষে বই লিখে তাদের সহযোগিতাও করেছিলেন। সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব নামক এক হুজুর 'আত্-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর' নামক বই লিখে শাহ মুযাফ্‌ফারের খিদমতে পেশ করলে তিনি তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর 'আল-হাবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মীলাদের আবিষ্কারক শাহ মুযাফ্‌ফার একদা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই ভোজ আয়োজনে ছিল পাঁচ হাজার ভোনা বকরী, দশ হাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, এক লক্ষ মাখন এবং হালোয়ার ত্রিশ হাজার পাত্র। সূফীদেরকে সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে গজল-গীতের অনুষ্ঠান চালু হয়; যা যোহর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত চালানো হয়। আর সেই অনুষ্ঠানে নাচনে-ওয়ালাদের সাথে তিনি নিজেও নাচেন!

অতঃপর সরকারের ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে উলামাদের ত্রুটি হলে মীলাদ একটি ধর্মীয় রূপ ধারণ ক'রে নেয়। হযরত ফাতেমার কেউ না হয়েও 'ফাতেমী' নাম নিয়ে এবং উক্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোকের মন লুটে তারা রাজত্ব ক'রে গেছে।

আর যে অনুষ্ঠানে এত আনন্দ, এত পান-ভোজনের ব্যবস্থা, সে অনুষ্ঠানে বাধা দিয়ে কি অধিকাংশ মানুষকে রাখা যেতে পারে? মীলাদের বাহন যদি মুরগী-পোলাও হয়, তাহলে তা 'বিদআত' হলেও, পেট-পূজারী হুজুররা 'বিদআতে হাসানা' বলে করতে বাধা পাবেন না। যেহেতু পরকালের 'হাসানা' থেকে ইহকালের 'হাসানা' বেশী লোভনীয়, বেশী আকর্ষণীয়!

বলবেন, 'ইসলামে কি আনন্দ করা নিষেধ?'

আনন্দ করা নিষেধ বলছি না। যা নিষেধ, তা হল শরয়ী কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এই

শ্রেণীর ভিত্তিহীন আনন্দ করা। আপনার যে খুশীতে আল্লাহ খোশ নন, সে খুশী কি আপনার গলার ফাঁসী নয়?

আর যদি পরকালের স্বার্থে করেন, তাহলে আল্লাহর বিধান শুনুন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, হে নবী) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি

ব্রাদারানে ইসলাম! কিছু মানুষ আছে যারা ধর্ম নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে, ধর্ম বুঝতে বাড়াবাড়ি করে, ধর্ম পালন করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে, মকরূহকে হারাম মনে করে, সুন্নতকে ফরয বা 'শেয়ারে ইসলাম' (ইসলামী প্রতীক) মনে করে।

এরা পুঁইকে রুই বানায়, সুইকে ফাল বানায়, এরা সবকিছুতে অতি আনে। আর অতিতে ক্ষতি থাকে, অতির কিছু ভাল নয়। যেমন অনাবৃষ্টি ভাল নয়, তাতেও ক্ষতি। তেমনি অতিবৃষ্টিও ভাল নয়, তাতেও ক্ষতি।

মহান প্রতিপালক ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ} (١٧١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। *(সূরা নিসা ১৭১ আয়াত)*

অনুরূপ তিনি দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর নবী ﷺ ও মু'মিন বান্দাগণকে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (١١٢)

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। *(সূরা হূদ ১১২)*

তিনি বানী ইস্রাঈলকে 'মান্ন্‌' ও 'সালওয়া' দান ক'রে বলেছিলেন,

{كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى}

অর্থাৎ, তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। *(সূরা ত্বাহা ৮১ আয়াত)*

সীমালংঘনের শাস্তি ঘোষণা ক'রে তিনি বলেছেন,

{فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى} (٣٩)

অর্থাৎ, সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে, এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহীম

(জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল। *(সূরা নাযিআত ৩৭-৩৯ আয়াত)*

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে শরীয়ত আমাদের সর্ববিষয়কে সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। সে সীমা অতিক্রম করাই হল শরীয়তের উপর বাড়াবাড়ি করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٥١)

অর্থাৎ, ওদের জন্য এ কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার (নবীর) উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ আছে। *(সূরা আনকাবূত ৫১ আয়াত)*

শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরেই রয়েছে মানুষের সার্বিক মঙ্গল। অবশ্য যারা এর উপদেশ গ্রহণ করে না অথবা তাতে বাড়াবাড়ি করে, তারা সে মঙ্গল ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

কুরআন নিয়েও বাড়াবাড়ি করা যাবে না; কুরআন পড়ার ব্যাপারে, কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে, কুরআন মানার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা যাবে না, যেমন অবজ্ঞাও করা যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পড়, তোমরা তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তা হতে দূরেও থেকো না, তার দ্বারা পেট চালায়ো না....।" *(আহমাদ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩০৫৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী নয় এমন হাফেয এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করলে এক প্রকার আল্লাহকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

সুতরাং 'কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী' ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়।

আমাদের দয়ার নবী ﷺ নিজের ব্যাপারেও অতিরঞ্জন পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি আমাদের সাইয়িদ (সর্দার)।' তা শুনে তিনি বললেন, "আস-সাইয়িদ (প্রকৃত সর্দার বা প্রভু) হলেন আল্লাহ।" তাঁরা বললেন, 'তাহলে আপনি মর্যাদায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি।' তিনি বললেন, "তোমরা যা বলছ তা বল অথবা তার কিছু বল, আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (অসঙ্গত কথা বলতে) অবশ্যই ব্যবহার না করে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ,নাসাই, মিশকাত ৪৯০০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার উপর দরূদ পড়ো। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(আবূ দাউদ ২০৪২, সহীহুল জামে' ৭২২৬নং)*

হজ্জের সময় হাজীরা কত অতিরঞ্জন করে। সাতটি পাথর দ্বারা রম্ই জিমার করতে হয়; কিন্তু অনেকে তার থেকে বেশী পাথর ছুঁড়ে। পাথরগুলি সাইজে ছোলা থেকে একটু বৃহদাকার হবে। কিন্তু অনেকে মনে করে শয়তানকে বাঁধা পেয়ে শায়েস্তা করবে, তাই বড় আকারের পাথর ছুঁড়ে, কেউ কেউ জুতা, ছাতা এবং পানির বোতল ইত্যাদি ছুঁড়ে!

হজ্জে মহানবী ﷺ রম্ইর পাথরের সাইজ দেখিয়ে দিয়ে বড় পাথর মারতে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "তোমরা এই রকম পাথর মারো। হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন

করা থেকে দূরে থাকো। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম প্রমুখ)*

'যত কষ্ট, তত সওয়াব' কথাটা ঠিক হলেও নিজে নিজে কষ্ট সৃষ্টি ক'রে তা সহ্য করা এবং সওয়াবের আশা করা ভুল। ধরে নিন, মসজিদে গেলেন নামায পড়তে। সেখানে প্রচণ্ড গরম। আপনি বেশী সওয়াবের আশায় এসি-ফ্যান বন্ধ ক'রে নামায পড়তে লাগলেন। এতে কিন্তু সওয়াব নেই। একেই বলে 'তাকাল্লুফ', ইচ্ছাকৃত কষ্ট ভোগ করা। হ্যাঁ, যদি কারেন্ট চলে যায় এবং তার ফলে প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও আপনি মসজিদে নামায পড়েন, তাহলে কষ্টের জন্য বেশী সওয়াবের আশা করতে পারেন।

একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বলল, 'আবূ ইস্রাঈল, সে এই নযর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা পালন করবে!' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ওকে আদেশ কর, যেন ও কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং রোযা পূরণ করে।" *(বুখারী, মিশকাত ৩৪৩০ নং)*

একদা তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর ক'রে (মক্কার দিকে) হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর ব্যাপার কি?" বলল, 'পায়ে হেঁটে কা'বা-ঘর যাওয়ার নিয়ত করেছে!' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার এমন প্রাণকে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওহে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ার হয়েই মক্কা যাও। কারণ, আল্লাহ তুমি ও তোমার নযরের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৩১-৩৪৩২ নং)*

মক্কা বিজয়ের দিনে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহর কাছে এই নযর মেনেছি যে, তিনি যদি আপনার হাতে মক্কার বিজয় দান করেন, তাহলে আমি 'বাইতুল মাক্বদিস' (জেরুজালেমের মসজিদে) দুই রাকআত নামায আদায় করব।' এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে দু'বার বললেন, "তুমি এখানেই (কা'বার মসজিদেই) নামায পড়ে নাও।" *(আবূ দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৩৪৪০ নং)*

একদা তিন ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট উপস্থিত হল। যখন তাঁর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলা হল, তখন তারা তা কম মনে করল এবং বলল, 'নবী ﷺ-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন।' অতঃপর একজন বলল, 'আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়তে থাকব।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা রোযা রাখতে থাকব; কখনও রোযা ত্যাগ করব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা স্ত্রী থেকে দূরে থাকব; কখনো বিবাহ করব না।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সেই সকল লোক, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের থেকে অধিকরূপে ভয় ক'রে থাকি এবং তাঁর জন্য অধিক সংযম অবলম্বন ক'রে থাকি। এতদ্সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোন দিন রোযা ছেড়েও দিই। (রাত্রে) নামাযও পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫নং)*

মহানবী ﷺ-এর সাহাবাগণও দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। একদা হজ্জে গিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলাকে লক্ষ্য করলেন, সে মোটেই কথা বলে না। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, ও কথা বলে

না কেন?' লোকেরা বলল, 'ও নীরব থেকে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছে।' তিনি সেই মহিলাকে সরাসরি বললেন, 'তুমি কথা বল। এমন কর্ম বৈধ নয়। এমন কর্ম জাহেলিয়াত যুগের!' এ কথা শুনে মহিলা কথা বলতে শুরু করল। *(বুখারী ৩৮৩৪ নং)*

নবী ﷺ বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

তিনি ইবাদতের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি ও আত্মকষ্ট পছন্দ করতেন না। একদা তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে।' *(বুখারী-মুসলিম)*

আবূ জুহাইফা অহব ইবনে আব্দুল্লাহ ؓ বলেন, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী)*

উসমান বিন মাযঊন ؓ অনুরূপ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হে উসমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উসমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও তালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উসমান! নিশ্চয় তোমার

উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।" *(আবূ দাউদ প্রমুখ)*

উক্ত উসমান বিন মাযঊন ও তাঁর কিছু সঙ্গী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটানা রোযা রাখতে, রাতভর নামায পড়তে, খাসি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দিনে খাওয়া ও রাতে ঘুমানোকে নিজেদের জন্য হারাম ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এ কাজ আল্লাহর নৈকট্যদানকারী। কিন্তু তা ছিল আসলে তাঁদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিষেধ ক'রে বললেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٨٧)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। *(সূরা মাইদাহ ৮৭ আয়াত)*

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু (খাদ্য, পানীয়, ঘুম ও স্ত্রী-সম্ভোগ) বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না এবং (খাসি ক'রে) সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ (হালাল জিনিস হারাম ক'রে ও খাসি ক'রে) সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল বিষয়ে অতিরঞ্জন থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

একতা ও বিচ্ছিন্নতা

একতাই বল---এ কথা আমরা সবাই জানি ও মানি; কিন্তু এক হয়ে থাকতে পারি না। লক্ষ-কোটি মানুষের লক্ষ-কোটি মন। একটি মনের সাথে অন্য একটি মনের মিল নেই, পছন্দের মিল নেই। মহান আল্লাহ এই প্রকৃতি দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা হূদ ১১৮-১১৯ আয়াত)*

তবুও মানুষকে সমিলে চলতে হবে, অপরের মনের সাথে হক বিষয়ে মিল খুঁজে বের ক'রে একমত হতে হবে, ঐকবদ্ধ হয়ে জীবনধারণ করতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব, সেই জীবের মান রক্ষা করতে হবে।

মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ঐকবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করতে। দ্বীন নিয়ে, দুনিয়া নিয়ে কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আপোসে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (١٠٣)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত

ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(সূরা আলে ইমরান ১০২-১০৩ আয়াত)*

{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } (١٣) سورة الشورى

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন ধর্ম; যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, 'তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তার ব্যাপারে ছিন্নভিন্ন হয়ো না।' *(সূরা শূরা ১৩ আয়াত)*

বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি সৃষ্টি করা কোন মুসলিমের কাজ নয়। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } (١٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। *(সূরা আনআম ১৫৯ আয়াত)*

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী মুশরিক ও অংশীবাদীরা হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } (٣٢) سورة الروم

অর্থাৎ, তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। *(সূরা রূম ৩১-৩২ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ব্যাপারে এক হন। ভিন্ন ভিন্ন দেহ হলেও মনের বন্ধন যেন ছিন্ন না হয়। নচেৎ একটি পার্ট অচল হলে পুরো মেশিন অচল হয়ে যাবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

তিনি বলেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেকো। সুতরাং যে জান্নাতের মধ্যস্থল পেতে চায়, সে যেন জামাআতের সাথে থাকে।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৭নং)*

তিনি বলেন, "জামাআত (ঐক্য) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।" *(মুসনাদে*

আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৫, সহীহুল জামে' ৩১০৯নং)

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

তিনি বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে একতা নয়, বরং হক দেখে তাদের সাথে এক হতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

একতার ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সমৃদ্ধিশীল হয়, আর বিবাদের ফলে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

একটি ফুল দিয়ে কখনো মালা গাঁথা যায় না। মালা তৈরি করতে গেলে এক সাথে একই সূত্রে গাঁথা অনেক ফুল চাই।

কেউ একা সবকিছুই করতে পারে না; কিন্তু প্রত্যেকে কিছু কিছু ক'রে অনেক কিছু করতে পারে।

এক বিন্দু বৃষ্টি একটি ফুলের পাঁপড়িও ধৌত করতে পারে না। কিন্তু অজস্র বিন্দু এক সাথে মিলে পৃথিবী ভাসাতে পারে।

একতাই বল। এ গল্প কে না জানে?

"এক বৃদ্ধের পাঁচটি ছেলে পাঁচ রকমের মতি,
মিল ছিল না ভাব ছিল না একে অন্যের প্রতি।
বৃদ্ধ একদিন একটি আঁটি কঞ্চি দিয়ে হাতে,
বলল, 'দেখি কে পারো সব ভাঙ্গতে একই সাথে।'
পারল না কেউ বৃদ্ধ তখন আঁটিটাকে খুলে,
এক-একটি কঞ্চি দিল সবার হাতে তুলে।
ভাঙ্গল সবাই, বৃদ্ধ বলল, 'দেখলে কেমন ফল?
একা হলেই দুর্বল হবে, একতাতেই বল।"

ব্রাদারানে ইসলাম! ইসলাম মুসলমানকে একতাবদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (٦٣) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আনফাল ৬৩ আয়াত)*

আমরা ভাই-ভাই পৃথক হলেও আমাদের মাঝে একতা থাকবে। পাড়া-পাড়া পৃথক হলেও সকলের মাঝে সংহতি থাকবে। গ্রাম-গঞ্জ পৃথক হলেও সবার মাঝে ঐক্য থাকবে। পার্টি-পার্টি ভিন্ন হলেও সবার মাঝে অভিন্নতা থাকবে। আমাদের পছন্দ ও মত বিভিন্ন হলেও আমাদের মাঝে মিলনের বৈশিষ্ট্য থাকবে।

কোন ভুল বুঝাবুঝি আমাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরাতে পারবে না। কোন পার্টি আমাদের ঐক্যকে মাটি করতে পারবে না। কোন মুসলিম-বিদ্বেষী আমাদের মাঝে ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না।

মানুষ বিচ্ছিন্নতায় দুর্বল হয়ে যায়। এ কথা আল্লাহও বলেছেন,

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (٤٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা আনফাল ৪৬ আয়াত)*

মুসলিম পারে না কুফ্‌রীর সাথে দোস্তী ক'রে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে। পারে না পার্টিবাজি বা দলবাজি করতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে। পারে না পার্টির অন্ধভক্তিতে পড়ে অন্য পার্টিকে গালাগালি করতে, অপরের প্রতি কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করতে।

হক কথা বলুন, তবে ভদ্রতার সাথে। নচেৎ অনেক সময় হক কথাও অশ্লীল হয়ে যায়। আর অশ্লীলভাবে কেউই হক গ্রহণ করতে পারে না।

মুসলিম পারে না কোন ছোটখাট দ্বীনী বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে। মুসলিম পারে না গীবত, চুগলী ও অহংকারের মাধ্যমে সুসংহত সমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمؤمِنَاتِ وَالمسلمِينَ وَالمسلمَاتِ، وَأَلِّفْ بَينَ قُلُوبِهِم، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَينِهِم، وَانصُرهُم عَلى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِم، اَللَّهُمَّ عَذِّبِ الكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَولِيَاءَكَ، اَللَّهُمَّ خَالِفْ بَينَ كَلِمَتِهِم، وَزَلْزِلْ أَقدَامَهُم، وَأَنزِلْ بِهِم بَأسَكَ الَّذِي لاَ تَرُدُّهُ عَنِ القَومِ الْمُجرِمِينَ.

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা

ব্রাদারানে ইসলাম! এ পৃথিবী পাপের ধরাধাম। পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে মানুষ। সৎকাজ করে এমন লোক নগণ্য, পক্ষান্তরে অসৎ কাজ করে এমন লোক অসংখ্য। এ জন্যই ভাল লোকদের ভিতর থেকে এমন একটি দল হতে হবে, যে দল মানুষকে ভাল কাজের আদেশ-উপদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দান করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٠٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

আর যে দল এমন কাজের দায়িত্ব পালন করবে, সে দল শ্রেষ্ঠ উম্মত। মহান আল্লাহ বলেন,

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। *(ঐ ১১০ আয়াত)*

ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, অফিসে-মসজিদে, বাজারে-লোকালয়ে যেখানেই আপনি খারাপ কাজ দেখবেন, তাতে পারলে শক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। বাধা দিতে না পারলে, অথবা বাধা দিলে তার সম পরিমাণ অথবা তার থেকে বেশী বড় পরিমাণ খারাপ কাজ ঘটার আশংকা হলে মুখের দ্বারা উপদেশ দিয়ে সে কাজ বন্ধ করুন। তাতেও সক্ষম না হলে অথবা বাধা দিলে কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে আপনি সে কাজকে মনে মনে ঘৃণা করুন এবং সে স্থান বর্জন করুন।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত তা করত না এবং তারা তা করত যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই। *(মুসলিম)*

সৎকাজের আদেশ দিন, মন্দকাজে বাধা দিন। আর এতে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন না। সাহাবাগণ এই কথারই বায়আত করেছেন নবী ﷺ-এর হাতে, "আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

নবী ﷺ বলেন, "অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক উলামা এটিকে ইসলামে ষষ্ঠ রুক্‌ন বলে গণ্য করেছেন।

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ ঈমানী বলবত্তার দলীল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٧١)

অর্থাৎ, আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

পক্ষান্তরে এর উল্টা কাজ মুনাফিক মানুষের। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٦٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিক্ব পুরুষেরা এবং মুনাফিক্ব নারীরা এক অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাতগুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ ক'রে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিক্বরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য। *(ঐ ৬৭ আয়াত)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভের একটি কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (٤١) سورة الحج

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে (রাজ)ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর আয়ত্তে। *(সূরা হাজ্জ ৪১ আয়াত)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পরিত্রাণের উপায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ} (١٦٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ১৬৫ আয়াত)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পরিত্যাগ করলে আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (٧٩)

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাঊদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়িদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পরিত্যাগ করলে দুআ কবুল হয় না। নবী ﷺ বলেন, তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না। *(তিরমিযী)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পরিত্যাগ করলে ব্যাপকভাবে ভাল-মন্দ সকল মানুষকে শাস্তি ভুগতে হয়। এ কথা ভাববেন না যে, 'চাচা আপন জান বাঁচা, যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে।' পরের ব্যাপারে আমার নাক গলানো দরকার কি? কেননা, মন্দকাজে বাধা না দিলে তার শাস্তিতে আপনিও শামিল হতে পারেন।

নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি ক'রে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী)*

আবূ বাকর সিদ্দীক رضي الله عنه বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

একদা যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ধ্বংসের খবর শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামি বেশী হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ পরিত্যাগ করা দেহের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি বিনা চিকিৎসায় ছেড়ে রাখার মতো।

ব্রাদারানে ইসলাম! সমাজ যাকে ভাল বলে তা ভাল নয়, সমাজ যাকে খারাপ বলে তা খারাপ নয়। বরং শরীয়ত যাকে ভাল বলে, তা-ই ভাল এবং যাকে খারাপ বলে তা-ই খারাপ।

সৎ কর্মে আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধাদান করার কাজ সাধ্য অনুযায়ী সকলের জন্যই অপরিহার্য।

নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব

সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং ইখলাসের সাথে নম্র ও হিকমতের সাথে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সকল স্থানে মানুষকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দিন। আমীন।

স্ত্রীর অধিকার

নারী একটি মেরুদণ্ডহীন জীব। অবলম্বন ছাড়া তার বাঁচা বড় দুষ্কর। তাই সে অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা। তার অবস্থা বলে, 'কত কাজ করি সংসারে, তবু কেন নির্যাতিতা হই বারেবারে?'

ব্রাদারানে ইসলাম! মহান আল্লাহ আমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টি তাঁর অন্যতম নিদর্শন। তিনি বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِـي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (٢١) سورة الروم

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী নারী। *(মুসলিম)*

"প্রেমের প্রতিমা স্নেহের সাগর করুণা-নির্ঝর দয়ার নদী,
হতো মরুময় সব চরাচর জগতে নারী না থাকিত যদি।"

স্ত্রী কেবল ভোগের বস্তু নয়। স্ত্রী আমাদের অর্ধাঙ্গিনী। দু-চাকা গাড়ির একটি চাকা। পুরুষের উপর স্ত্রীর বহু অধিকার আছে। আর সে অধিকার পুরুষ আদায় করতে বাধ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।" *(তিরমিযী)*

১। আর্থিক অধিকার

(ক) স্ত্রীর মোহর আদায় করা। দেনমোহর বাকী থাকলে তা পরিশোধ ক'রে দেওয়া। মোহর আদায় করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِـهِ مِـنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ,উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। *(সূরা নিসা ২৪ আয়াত)*

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِـذَاتِ أَخْدَانٍ } (٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে, তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। *(ঐ ২৫ আয়াত)*

হ্যাঁ, পরবর্তীতে যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় কিছু মাফ ক'রে দেয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। *(ঐ ৪ আয়াত)*

অবশ্য তাকে মাফ করতে বাধ্য করা যাবে না। যেমন তাকে মোহর দেওয়ার জায়গায় মোহর নেওয়া যাবে না। মেয়ের বাবার নিকট থেকে পণ বা যৌতুক হিসাবে যা নেওয়া সমাজে প্রচলিত আছে, তা মুসলিমদের জন্য হালাল নয়।

(খ) ভরণ-পোষণ করা। স্বামী যেমন খাবে তেমনি স্ত্রীকে খাওয়াবে, যেমন মানের পোশাক নিজে পরবে তেমন মানের পোশাক তাকেও পরাবে।

উপরন্তু স্ত্রীকে খাওয়ালে সদকার নেকী রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।" *(বুখারী)*

স্ত্রীর জন্য খরচ করলে বেশী সওয়াব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে, যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে।" *(মুসলিম)*

সংসারে অভাব এলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে জানালা দিয়ে ভালবাসা লুকিয়ে পালিয়ে যায়।

'শরীরার্ধ বল যারে সেই বনিতাই রে সেই বনিতাই রে,
নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে যদি ধন নাই রে।'

সুতরাং স্ত্রীর ভালবাসা বজায় রাখতে অর্থ ব্যয় করতে হবে, বৈধ পথে অর্থ উপার্জন করতে হবে। মা-বোন ও স্ত্রীর স্ব-স্ব অধিকার বজায় রাখতে হবে। বোন ভাত পায় না, আর শালীর পাতে মোন্ডা যেন না হয়। মা খরচ পায় না, আর স্ত্রীর নামে সবকিছু যেন না হয়। মায়ের নামে সবকিছু হলেও

খেয়াল রাখতে হবে স্ত্রী যথেষ্ট খরচ পাচ্ছে কি না। মায়ের প্রতি অন্ধভক্তি যেন আপনাকে স্ত্রীর প্রতি অন্যায়াচরণে বাধ্য না করে।

২। ব্যবহারিক অধিকার

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরয। তার সাথে সদ্ভাবে বসবাস করা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }

অর্থাৎ, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রী)কে ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "শোনো! তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে, (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)।" *(তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" *(তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল তালাক দেওয়া।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ব্যবহারিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হল ঃ-

(ক) যথাসময়ে মাহরাম আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করতে দেওয়া।

(খ) তার ব্যবহারে ধৈর্য ধরা। 'যত ভুল হোক ফুল ভালোবাসাতে।' মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

চাঁদের গায়ে কলঙ্ক আছে, গোলাপ ফুলের গোড়ায় কাঁটা আছে, স্ত্রীরও কোন দোষ থাকতে পারে। নারী গোলাপের মত সুন্দর বলেই তার মুখে কাঁটা আছে। সুতরাং 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন

কমল তুলিতে?'

মানুষের ভাগ্যে তিন প্রকার স্ত্রী জোটে; কারো স্ত্রী প্রভু, কারো স্ত্রী দাসী, আর কারো স্ত্রী বন্ধু। কারো ভাগ্যে স্ত্রী বড় নিয়ামত, কারো ভাগ্যে সন্তানের আধার, আর ভাগ্যে গলার বেড়ি। সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবকে বরণ ক'রে ধৈর্যের সাথে সংসার করা পুরুষের কর্তব্য।

আর খবরদার! উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে স্ত্রীর নিকট অতিরিক্ত প্রেমের আশা করবেন না। নচেৎ কল্পিত প্রেমের খোঁজে বাস্তব প্রেমও হারিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।' তবুও মনে রাখবেন, ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না।" পরবর্তীতে উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে।' সুতরাং নবী ﷺ প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট প্রচুর মহিলাদের সমাগম, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) ঐ (স্বামী)রা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ নয়।" *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

(গ) স্ত্রীর সাথে বৈধ খেলা খেলা ও তাকে বৈধ খেলা দেখানো ব্যবহারিক জীবনের একটি সৌন্দর্য। তাতে মন তরতাজা হয়, দাম্পত্য সুখের হয়। মহানবী ﷺ স্ত্রীর সাথে সেরূপই করতেন।

(ঘ) গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করাও ব্যবহারিক অধিকারের অন্তর্ভূত। অসুখ-বিসুখ হলে তো বটেই, সাধারণ সময়েও তার কাজে হাত লাগিয়ে দেওয়া অথবা নিজের সেই কাজ যা স্ত্রীকে করতে হয়---তা নিজে নিজে ক'রে ফেলা ভাল স্বামীর পরিচয়।

আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নবী ﷺ ঘরে কি করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। অতঃপর নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।' *(বুখারী ৬৯৩৯নং)*

অর্থাৎ, তিনি নিজের কাপড় নিজে সিলাই করতেন, নিজের জুতা নিজে পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজে করতেন। যাতে স্ত্রীর বোঝা হাল্কা হয়।

(ঙ) স্ত্রীর এঁটো খাওয়া ভালবাসার পরিচয়। অনেকে তা ঘৃণা করে। কিন্তু আমাদের নবী ﷺ স্ত্রীর মুখ লাগানো খাদ্য ও পানীয় খেয়েছেন।

(চ) উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া স্ত্রীর ব্যবহারিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(ছ) তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করাও তার ব্যবহারিক অধিকার। দুনিয়ার বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামী মারা গেলে, তার মরণ শহীদী মরণ হয়।

আর আখেরাতের বিপদ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

সুতরাং তাকে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে পর্দার সাথে রেখে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বামীর ঘাড়ে।

(জ) তার ধর্ম ও দেহে ঈর্ষাবান হওয়া, পর পুরুষের চোখে-মুখে ও মনে বিচরণ করা হতে বাধা দেওয়াও ব্যবহারিক অধিকারের শামিল। পক্ষান্তরে 'দাইয়ূস' বা ভেঁড়া হওয়া মুসলিমের উচিত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদর্শ স্বামী হওয়ার এবং আদর্শ দাম্পত্য গড়ে তোলার তওফীক দিন। আমীন।

[رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا]

মুনাফিকী আচরণ

ব্রাদারানে ইসলাম! আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে, যারা মুনাফিক। হ্যাঁ, আমাদের সমাজেও মুনাফিক আছে। রসূল ﷺ-এর যুগে ছিল, অথচ তখন কুরআন অবতীর্ণ হয়ে গোপন খবর প্রকাশ ক'রে দেওয়া হতো। তাহলে এখন থাকবে না কেন? অনেক আছে ঘরের ঢেঁকিই কুমীর। অনেক আছে এ সমাজের মীরজাফর।

রাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে, ব্যবসা ও ব্যবহারে, প্রেম ও দাম্পত্যে মুনাফিকীর আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য মুনাফিক বললেই যে, তার মানে সে কাফের---তা সর্বক্ষেত্রে নয়। বরং কুফরীর যেমন ছোট-বড় আছে, তেমনি মুনাফিকীরও দু'টি ভাগ আছে; বিশ্বাসগত (বড়) ও কর্মগত (ছোট) মুনাফিক।

বিশ্বাসগত (বড়) মুনাফিক হল সেই ব্যক্তি, যে উপরে মুসলিম সেজে তলায় তলায়---

১। রসূল ﷺ-কে মনে মনে মিথ্যাজ্ঞান করে। তিনি আসলে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী নন---এই ধারণা পোষণ করে।

২। তাঁর আনীত কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে। কোন কোন বিধানকে আল্লাহর বিধান নয় ভাবে।

৩। রসূল ﷺ মনে মনে ঘৃণা করে। কখনো স্বার্থের খাতিরে ভালবাসা প্রকাশ করলেও আসলে তাঁকে ভালবাসে না।

৪। তাঁর আনীত কিছু বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। শরীয়তের কোন কোন বিষয়কে অপছন্দ করে।

৫। ইসলামের পরাজয়ে আনন্দবোধ করে। ইসলাম ও মুসলিমদের অবনতির কথা শুনলে খুশী হয়।

৬। ইসলামের বিজয়ে কষ্টবোধ করে। ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতির কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

এই মুনাফিক কাফের অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। আর এ জন্যই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তার ঠাঁই হবে।

কর্মগত (ছোট) মুনাফিকীর নিদর্শন হল ৫টি ঃ-

সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত (বিনষ্ট) করে এবং বাদানুবাদ করলে অশ্লীল বলে।

কোন মুসলিমের চরিত্রে যদি উপর্যুক্ত কোন আচরণ থেকে যায়, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। বলা যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকের আচরণ রয়েছে। অবশ্য উক্ত পাঁচটি নিদর্শন যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে, তার খাঁটি মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।"

তিনি আরো বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হুযাইফা বিন য়্যামান বলেন, 'হৃদয় হল চার প্রকার; এক প্রকার হৃদয় হল মোহর মারা, আর তা হল কাফেরের হৃদয়। দ্বিতীয় প্রকার হৃদয় হল দু'মুখো, আর তা হল মুনাফিকের হৃদয়। তৃতীয় প্রকার হৃদয় হল উদার, যাতে আছে দেদীপ্যমান প্রদীপ, আর তা হল মু'মিনের হৃদয়। চতুর্থ প্রকার হৃদয়, যাতে আছে ঈমান ও (কর্মগত) মুনাফিকী। ঈমানের উদাহরণ হল সেই গাছের মত, যা পবিত্র পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আর মুনাফিকী হল ফোঁড়ার মত, যা বদ রক্ত ও পুঁজ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং এমন হৃদয়ে উভয়ের মধ্যে যে বিজয়ী হয়, সেই হৃদয়ের মানুষ সেই দিকে ঢলে যায়।' *(ঈমান, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/১০৬)*

কোন কোন মুনাফিক কাফের এবং কোন কোন মুনাফিক ফাসেক। তাদের নেক আমল পণ্ড, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (٥٣) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)

অর্থাৎ, তুমি (আরো) বলে দাও, তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না; নিঃসন্দেহে তোমরা আদেশ লংঘনকারী (ফাসেক) সমাজ। আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে থাকে। *(সূরা তাওবাহ ৫৩-৫৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ-এর যুগে যে সকল মুনাফিক ছিল, তাদের জন্য তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনাও কোন কাজে লাগেনি। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন,

{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٦)

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত

করেন না। *(সূরা মুনাফিকূন ৬ আয়াত)*

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٨٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না; যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। *(সূরা তাওবাহ ৮০ আয়াত)*

পরবর্তীতে তাঁকে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এবং তাদের কবরের ধারে-পাশে দাঁড়াতে নিষেধ করা হল। মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন মারা গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার জানাযা পড়ার জন্য আহবান করা হল। আল্লাহর রসূল ﷺ জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উমার বিন খাত্তাব ﷺ তাঁর কাপড় ধরে বাধা দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ওর জানাযা পড়বেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন?!'

আল্লাহর রসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, "আমাকে ছেড়ে দাও হে উমার!" কিন্তু উমার ﷺ বাধা দিতেই থাকলে তিনি বললেন, "আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি একটি এখতিয়ার গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।' সুতরাং আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক'রে দেবেন, তাহলে আমি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।"

উমার ﷺ বললেন, 'সে একজন মুনাফিক।'

কিন্তু মহানুভব মহানবী ﷺ উমার ﷺ-এর সে বাধা উপেক্ষা ক'রে সকরুণ হৃদয় নিয়ে তার জানাযা পড়লেন। সাহাবাগণও সেই জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে দাফন করার কাজ শেষ হলে তিনি ফিরে এলেন। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} (٨٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(সূরা তাওবাহ ৮৪ আয়াত)*

এই নির্দেশের পর মহানবী ﷺ আজীবন আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াননি। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ)*

বলাই বাহুল্য যে, এই নির্দেশের ভিত্তিতে কোন মুনাফিকের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তাদের জন্য দুআ করা। আর দুআর অনুষ্ঠান বা মীলাদ পড়া তো এমনিই বিদআত। মুনাফিকের জন্য তা হারাম ও বিদআত উভয়ই। আত্মীয়তা বা রাজনীতির

খাতিরেও সে জানাযা বা দুআ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বৈধ হবে না। কারণ, হারাম জেনেও লোককে দেখানোর জন্য তাতে অংশগ্রহণ করাও এক প্রকার মুনাফিকী।

কিন্তু কেউ যদি তাতে বাধ্য হন এবং তিনি যদি আল্লাহর নির্দেশে পরিপূর্ণ ঈমান রাখেন, তাহলে তিনি কি অন্তর থেকে তার জন্য দুআ করবেন ভাবছেন? কক্ষনই না। আল্লাহর বন্ধু কোনদিন সেই মানুষকে ক্ষমা করতে বলবেন না, যে মানুষ মুসলিমদের শত্রু, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন।

মুনাফিকরা অভিশপ্ত, ক্ষমা করা হবে না তাদেরকে বিচারের দিনে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

{وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} (٦٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। *(সূরা তাওবাহ ৬৮ আয়াত)*

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর আছে। পানির সর্বনিম্নে যেমন চাপ বেশী থাকে, আগুনের সর্বনিম্নে তেমনি চাপ ও তাপ বেশী থাকবে। আর সেই সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে কপটরা। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (١٤٥)

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা নিসা ১৪৫)*

আজ আইনের সাহারা নিয়ে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুনাফিকরা বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু কাল কোন সরকার, কোন পীর-আউলিয়া, কোন ওজর-অজুহাত তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

বাংলার প্রবাদে বলে, 'দোদেল বান্দা কলেমা চোর, না পায় বেহেশ্ত্ না পায় গোর।'

আল্লাহ আমাদেরকে মুনাফিকী আচরণ থেকে এবং আমাদের সমাজকে মুনাফিক থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

মরণকে স্মরণ

বেঁচে আছি মরতে হবে, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথায় ভবে? আপনার নাম শত্রুতে মিটিয়ে দিতে না পারলেও একদিন আপনা-আপনিই মিটে যাবে।

এ দুনিয়া মুসাফিরখানা, পান্থশালা। এ দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। এ ঘর-বাড়ি আমাদের আসল ঘর-বাড়ি নয়। আসল ঘর হল কবর। আসল ঠিকানা হল জান্নাত অথবা জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন,

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার সাথে দুনিয়ার সাথ কি? আমি তো সেই মুসাফির ব্যক্তির মত, যে কোন গাছের ছায়ায় কিছু বিশ্রাম নিয়ে তা ত্যাগ ক'রে চলে যায়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

'কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে, এক যায় আর আসে, জগতের রীতি, সাগরতরঙ্গ যথা।'

ব্রাদারানে ইসলাম! ধুলার সংসারে আমরা ঘর বানিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মেতে গিয়ে পরকালের আসল ঘরকে ভুলে আছি। মন-ভুলানো সুন্দর মুসাফিরখানায় বাস ক'রে নিজেদের প্রকৃত বাড়ির কথা আমাদের মনে থাকে না।

আসুন! একবার পরপারের যাত্রার কথা মনে ক'রে হৃদয়ের জং ছাড়াই। মরণকে স্মরণ ক'রে ঈমানকে নবায়িত করি।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, সর্বসুখ-বিনাশী মৃত্যুকে তোমরা অধিকাধিক স্মরণ কর। *(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ)* কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।" *(বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২১০-১২১১নং)*

একদা এক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ মু'মিন সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সাহাবী বললেন, 'কোন্ মু'মিন সবচেয়ে জ্ঞানী?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে বেশি মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য বেশি ভাল প্রস্তুতি নেয়। তারাই হল জ্ঞানী লোক।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৮৪নং)*

উমার বিন আব্দুল আযীয আওযায়ীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, '....পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি অধিক অধিক মরণকে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বল্প উপকরণ (ধন-সম্পদ) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।'

আত্বা বলেন, 'উমার বিন আব্দুল আযীয প্রত্যেক রাত্রে ফকীহগণকে সমবেত করতেন এবং সকলে মিলে মৃত্যু, কিয়ামত ও আখেরাতের কথা আলোচনা ক'রে কাঁদতেন।'

সালেহ মুর্রী বলতেন, 'সামান্য ক্ষণ মরণকে বিস্মৃত হলেই আমার হৃদয় মলিন হয়ে যায়।'

দাক্কাক বলেন, 'যে ব্যক্তি মরণকে স্মরণ করে সে তিনটি উপকার লাভ করে; সত্বর তওবা, স্বল্পে তুষ্টি, আর আলস্যহীন ইবাদত। পক্ষান্তরে যে মরণের কথা ভুলেই থাকে, সেও তিনটি জিনিস সত্বর লাভ করে; তওবায় দীর্ঘসূত্রতা, যথেষ্ট সব কিছু পেয়েও অতৃপ্তিবোধ এবং ইবাদতে অলসতা।'

মরণকে স্মরণ ক'রে পাথেয় সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই শরীয়তে কবর যিয়ারত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৭,*

আবূ দাউদ ৩২৩৫নং, আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫) "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" *(আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫ প্রমুখ)* "সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা করে সে করতে পারে; তবে যেন (সেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।" *(নাসাঈ ২০৩২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।" *(হাকেম ১/৩৭৬, আহমাদ ৩/২৩৭-২৫০)*

উসমান ﷺ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে, তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

বাতির কাঁচ ময়লা হলে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা হয়, মনের কালিমা দূর করতে নামায-রোযা, হজ্জ-উমরা, কবর যিয়ারত ইত্যাদি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যাকে ইচ্ছা মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে পরিষ্কার করেন এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে তওফীক দান করেন।

মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার নামাযে মরণকে স্মরণ কর। কারণ, মানুষ যখন তার নামাযে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার নামাযকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য নামায পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা ক'রে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়। *(মুসনাদে ফিরদাউস, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪২১, সহীহুল জামে' ৮৪৯ নং)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে তখন (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যা বলে (অপরের নিকট) ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকেদের হাতে যা আছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাও।" *(বুখারী তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৭১ নং, আহমাদ ৫/৪১২, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪০১ নং)*

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "তুমি (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। (মনে মনে কর,) যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, নচেৎ তিনি তোমাকে দেখছেন---।" *(ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, প্রমুখ সিলসিলাহ সহীহাহ ১৯১৪ নং)*

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران/١٨٥]

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে

সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ঃ 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্‌কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্‌গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে

বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ্ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ্ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ্ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّـى يَلِـجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ } (٤٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(সূরা আ'রাফ ৪০ আয়াত)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় মহানবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } (٣١)

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। *(সূরা হাজ্জ ৩১ আয়াত)*

সুতরাং তার রূহ্ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে

বলে, ‘হায়, হায়, আমি তো জানি না।’ অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার দ্বীন কি?’ সে বলে, ‘হায়, হায়, আমি তো জানি না।’ তারপর জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?’ সে বলে, ‘হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।’

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), ‘সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, ‘তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।’ তখন সে জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করো!’ সে বলে, ‘আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।’ তখন সে বলে, ‘আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

ব্রাদারানে ইসলাম! মরতে তো একদিন সকলকেই হবে। সুতরাং ঈমান বজায় রেখে আমল সংগ্রহ ক’রে মরাই হল সুখের মরণ। অতএব প্রস্তুতি নিন।

{رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ} {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ}

ইসলাম শান্তির ধর্ম

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ হল ঃ আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। এর মূল ধাতু হল ‘সিল্‌ম’। আর তার অর্থ শান্তি।

ইসলামে খুনাখুনি হানাহানি নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٣٢)

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। *(সূরা মাইদাহ ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক’রে রাখবেন। *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন।” *(বুখারী ৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।” *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম ৪/৩৫১, আবূ দাউদ আবূ দারদা হতে, সহীহুল জামে’ ৪৫২৪নং)*

তিনি আরো বলেন, “একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।” *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।” *(আহমাদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

ইসলামে জোর ক’রে কোন জায়গায় মসজিদ বৈধ নয়, সে মসজিদে নামায শুদ্ধ নয়। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ বৈধ নয়, সে ইসলাম গ্রহণযোগ্যও নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত)*

‘ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচারিত হয়েছে’---এ কথা মিথ্যা। ইসলাম ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলিমদের মুগ্ধকারী সচ্চরিত্রতার দ্বারা প্রসার লাভ করেছে।

ইসলামে সন্ত্রাস নেই। ইসলাম বিজয়ের জন্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে বলে না।

তাহলে ইসলামে কি জিহাদ নেই? জিহাদ অবশ্যই আছে। কিন্তু জিহাদ হয় প্রয়োজনে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ হয়, জিহাদ হয় মানুষের অধিকার আদায় করার জন্য। অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ও বঞ্চিতের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জিহাদ হয়। আর যে যুদ্ধ শান্তির জন্য, সে যুদ্ধ তথাকথিত সভ্য সমাজেও অমানবিক নয়। তার জন্যই তো তার বিনিময়ে অনেকে নোবেল পুরস্কারও পায়!

অনেক সময় কাটাকাটি হলেও অপারেশনের দরকার আছে, নচেৎ রোগ যে সারবে না।

ব্রাদারানে ইসলাম! মুসলিম দুনিয়ার অধঃপতনের কথা শুনে আপনার মন খারাপ হবে, তা হোক, তা হওয়া ভাল। মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার ও বঞ্চনার কথা শুনে আপনার গায়ের রক্ত টগবগ ক’রে ফুটে উঠবে, তা উঠুক, তা উঠা ভাল। উৎসাহ ও উত্তেজনায় আপনার শরীর ফাটতে চাইবে, তা ফাটুক, তা ফাটা ভাল। কিন্তু ভাইজান! তার তো একটা সীমাবদ্ধতা থাকা দরকার। আপনার গাড়ির যত বেশীই স্পীড থাক, তার যদি ব্রেক না থাকে, তাহলে কি বিপদের কথা নয়? সে দামী ও দ্রুতগামী গাড়ি নিয়ে কি রাস্তায় নামা যাবে?

আপনার শক্তি ও বলবত্তার ব্রেক হল কুরআন-হাদীসের নীতি। সে নীতির বাইরে কিছু করতে গেলে ব্রেকহীন গাড়ির মত আপনাকে রাস্তার মাঝে অযথা মরতে হবে।

ধৈর্যধারণ করুন আপনার নবী ﷺ-এর মত। তিনি তায়েফবাসীদেরকে মারতে চাননি, তাঁর বদ্দুআ ছিল এ্যাটম-বোমার চাইতেও বেশী শক্তিশালী; কিন্তু তিনি তা প্রয়োগ করেননি। তাঁর দুই ডানা চাচা আবূ তালেব ও স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) হারানোর পর যখন তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন তিনি নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর সন্ধানে তায়েফ সফর করলেন। সেখানে

পৌঁছে সাকীফ গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেখানেও তিনি তাদের নিকট থেকে ঔদ্ধত্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সেখানে তিনি (১০ অথবা) ৩০ দিন অবস্থান করলেন। পরিশেষে তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল। এমনকি তাতে তাঁর পায়ের গোড়ালীদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক্ষণে তিনি মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরার পথে তিনি তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে দুই হাত তুলে এক প্রসিদ্ধ দুআ করলেন।

তিনি বলেন, "আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুন বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। 'ক্বারনুস সাআলিব' (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া ক'রে আছে। লক্ষ্য ক'রে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত ক'রে ওদেরকে পিষে ধ্বংস ক'রে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম, "না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।" *(বুখারী + মুসলিম)*

আমাদের নবী ﷺ-কে মহান আল্লাহ বিশ্বাবাসীর জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। *(সূরা আম্বিয়া ১০৭ আয়াত)*

নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রেও শান্তি বজায় রাখুন। গর্হিত কাজ দেখলেই শক্তি প্রয়োগ করবেন না। আগে ভেবে দেখুন, শক্তি প্রয়োগের ফলে যে পাপ বন্ধ হবে, তার থেকে কোন বড় পাপ সৃষ্টি হবে কি না? ভয় থাকলে দ্বিতীয় পর্যায় ব্যবহার করুন। অর্থাৎ, উপদেশ দিয়ে সে পাপ বন্ধ করার চেষ্টা করুন। তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা জানুন। আপনার কর্তব্য শেষ। আর খবরদার নির্দিষ্টভাবে কাউকে 'কাফের' বলবেন না।

সাত বছর বয়সে ছেলেকে নামাযের ট্রেনিং দেন। ছেলে নামায না পড়লে দশ বছরে প্রহার করুন। কিন্তু দশ বছরের আগে প্রহার করার অধিকার নেই। যেমন আপনার ছেলে দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে আমার মারার অধিকার নেই। আপনার ছেলেকে আপনিই মারতে পারেন।

দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবে সরকার। বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করবে সরকার। চোরের হাত

কাটবে সরকার। আপনি-আমি হত্যা করতে বা হাত কাটতে পারি না। দেশে ইসলামী আইন না থাকলে সে আইন আপনি নিজে প্রয়োগ করতে পারেন না।

ভেবে দেখুন নবী-জীবনের আপনি কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছেন? মক্কী জীবনে অবস্থান ক'রে মাদানী জীবন পরিচালনা করা তো বোকামি ও ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। আর মহান আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত ভার দেন না।

প্রত্যেক বিষয়ে ভেবে-চিন্তে সত্যতা যাচাই-বাছাই ক'রে কাজ করুন। যাতে এমন না হয়ে বসে যে, সে কাজ করার পর আপনাকে লাঞ্ছিত হতে হল।

ইসলামী দাওয়াত দিন আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি মতে, মহান আল্লাহ বলেন,

{ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } (١٢٥) سورة النحل

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

শান্তির ধর্ম যথার্থরূপে পালন ক'রে সমাজ ও পরিবেশে শান্তি বজায় রাখুন। আল্লাহর নাম আস্-সালাম, আপনার ইসলামে আছে সালাম, আপনার অভিবাদন সালাম। আপনিও আব্দুস সালাম হয়ে যান।

হালাল রুযীর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীকে খাদ্য-সম্ভার দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। রুযীর ভাণ্ডারের মধ্যে কোন কোন রুযীকে তিনি আমাদের জন্য হারাম ও অবৈধ করেছেন। তাতে ক্ষতি আছে এই জন্য অথবা আমাদের পরীক্ষার জন্য। পবিত্র-অপবিত্র রুযী দিয়ে পবিত্র ভক্ষণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } (١٧٢)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

তিনি বনী ইস্রাঈলকে বলেছিলেন,

{كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى } (٨١) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। *(ত্বাহা ৮১ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেন,

{وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ} (٨٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন, তা হতে বৈধ ও উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী। *(সূরা মাইদাহ ৮৮ আয়াত)*

{فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (١١٤)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদত কর, তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *(সূরা নাহল ১১৪ আয়াত)*

যেমন তিনি আমাদেরকে হারাম রুযী ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন; তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।" *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, "হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব! 'ইয়া রব্ব!' বলে দুআ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দুআ কিভাবে কবূল করা হবে? *(মুসলিম)*

নবী ﷺ বলেন, "তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।" *(বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।" *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

কা'ব বিন উজরা ﷺ বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করত। আর আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন।

(অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।) একদিনের ঘটনা, ঐ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর খিদমতে হাজির করল। আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন। দাসটি বলল, 'আপনি কি জানেন, এটা কি জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)?' আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'তা কি?' দাসটি বলল, 'আমি জাহেলী যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অথচ আমার ভাগ্য গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে (পারিশ্রমিক স্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন।'

এ কথা শুনে আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ নিজের হাত তাঁর মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি ক'রে বের ক'রে দিলেন। *(বুখারী)*

নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

অর্থ ৪ প্রকার। (১) যা আল্লাহর অনুগত থেকে উপার্জন করা হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা হয়। আর এটা হল সর্বোত্তম অর্থ। (২) যা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কামানো হয় এবং পাপের পথে ব্যয় করা হয়। আর এ হল নিকৃষ্টতম অর্থ। (৩) যা কোন মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে কামানো হয় এবং কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার পথে ব্যয় করা হয়। আর তাও নিকৃষ্ট অর্থ। (৪) যা বৈধ পথে অর্জন করা হয় এবং বৈধ প্রবৃত্তির পথে ব্যয় করা হয়। যাতে আসলে কোন উপকার বা অপকার নেই।

ব্রাদারানে ইসলাম! হারাম কামাই থেকে দূরে থাকুন, হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকুন। দূরে থাকুন সূদ, জুয়া, ঘুস, রূপ-ব্যবসা, দেহ-ব্যবসা ও হারাম বস্তুর ব্যবসা থেকে।

দূরে থাকুন মিথ্যা বলে ব্যবসা বা অন্য কোন উপার্জন থেকে। দূরে থাকুন মানুষকে ধোকা দিয়ে উপার্জন করা হতে। দূরে থাকুন দাঁড়ি মারা থেকে ও ধানে ধুলো দেওয়া থেকে এবং জিনিসে ভেজাল দেওয়া হতে।

দূরে থাকুন ছিন্তাই, মস্তানি, চুরি-ডাকাতি, পণবন্দী বানিয়ে অর্থগ্রহণ, বিবাহের নামে স্ত্রীকে পণবন্দী করে পণ ও যৌতুক আদায় করা হতে।

দূরে থাকুন যাকাত-ওশর না দিয়ে মাল ভক্ষণ করা হতে।

দূরে থাকুন ভিক্ষা ক'রে খাওয়া হতে।

দূরে থাকুন এতীমের মাল খাওয়া হতে এবং জনগণের মাল খাওয়া হতে।

দূরে থাকুন ধর্ম-ব্যবসা ক'রে মানুষের মাল ভক্ষণ করা হতে।

পরিশেষে দুআ করি,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমাদের জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮০)*

সৎ কাজে প্রতিযোগিতা

দুনিয়ার জিন্দেগীতে আমরা সব বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে জানি। ধন-সম্পদ নিয়ে, গাড়ি-বাড়ি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমরা জানি, মান-যশ নিয়ে রেষারেষি করতে পারি। এটাই হয়তো পার্থিব সংসারের রীতি-নীতি। মহান আল্লাহ বলেন,

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠)

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে আমাদের কতজন জানে? সৎ কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমাদের কয়জন আছে? অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত)*

{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٢١)

অর্থাৎ, তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা হাদীদ ২১ আয়াত)*

{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ} (١٤٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, প্রত্যেকের (নির্দিষ্ট) একটি দিক আছে, যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াত)*

মহান আল্লাহর বেহেশ্তে যাবার জন্য প্রতিযোগিতার কিছু নমুনা শুনুন ঃ-

বদর যুদ্ধে যখন মক্কার মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তরবারি দিয়ে শেষ করে দিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হয়েছিল, তখন রসূলে আকরাম ﷺ নিজের সাহাবীদেরকে বলেছিলেন,

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

অর্থাৎ, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে উঠে দাঁড়াও, যার প্রস্থ আসমান ও যমীন সমতুল্য।

একথা শোনা মাত্র সাহাবী উমাইর বিন হুমাম আনসারী ؓ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! শহীদ হওয়ার বিনিময়ে আসমান ও যমীনের প্রস্থ্য সমতুল্য কি জান্নাত? রসূলে আকরাম ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' উমাইর বিন হুমাম বললেন, بخ بخ (বাহ্ বাহ্) রসূলে আকরাম ﷺ বললেন, বাহ-বাহ্ বলার জন্য তোমাকে কি জিনিস উৎসাহিত করছে? উমাইর বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর ক্বসম! আমি এ কথা জান্নাতের আশায় বলেছি।' রসূলে আকরাম ﷺ বললেন, "নিশ্চয় তুমি জান্নাতবাসীদের মধ্যে গণ্য।" উমাইর বিন হুমাম তীরদান থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। অতঃপর শহীদ হওয়ার অদম্য ইচ্ছায় বলতে লাগলেন, 'আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে তো জীবন লম্বা হয়ে যাবে।' সুতরাং তিনি সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং ময়দানে অগ্রসর হলেন। পালোয়ানের মত বীর-বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। *(মুসলিম)*

বদর যুদ্ধের পূর্বে নবী ﷺ যখন যোদ্ধা নির্বাচন করছিলেন, তখন উমাইর বিন আবী অক্কাস লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছিলেন। তাঁর ভাই সা'দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার তোমার?' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি ছোট বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। অথচ আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে শহীদ হতে চাই।'

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দৈর্ঘ্য দেখলেন, তখন তিনি পায়ের গোড়ালি তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে লম্বা প্রমাণ করতে চাইলেন। অবশেষে তিনি যখন তাঁকে ফিরে যেতে বললেন, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাঁর কাঁদা দেখে তাঁকে বদর যেতে অনুমতি দিলেন। আর সেখানে গিয়ে যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। *(উসুদুল গা-বাহ)*

উহুদ যুদ্ধের দিন ঐভাবে সৈন্য নির্বাচনের সময় ছোট-বড় দেখা হচ্ছিল। অনেককেই ছোট বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরাহ বিন জুন্দুব ছিলেন। পরবর্তীতে রাফে'কে অনুমতি দেওয়া হল; কারণ তিনি তীরন্দাজ ছিলেন। তা দেখে সামুরাহ কাঁদতে লাগলেন। (হ্যাঁ, মরণের জন্য কাঁদতে লাগলেন!) অতঃপর তিনি তাঁর সৎবাপের কাছে অভিযোগ ক'রে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রাফে'কে অনুমতি দিলেন, আর আমাকে দিলেন না। অথচ আমি ওকে কুশতি লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারব।' এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি উভয়কে কুশতি লড়তে আদেশ দিলেন। অতঃপর সত্যিসত্যিই সামুরাহ তাতে বিজয়ী হলেন এবং তিনি তাঁকেও যুদ্ধে অনুমতি দিয়ে দিলেন। *(বুখারী, প্রমুখ)*

আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ বলেন, বদর যুদ্ধে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় দুই আনসারী নব-যুবক আমার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের একজন আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে বলল, 'চাচাজান! আপনি কি আবূ জাহলকে চেনেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ চিনি। তার সাথে তোমার কি দরকার ভাতিজা?' সে বলল, 'আমি শুনেছি, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গালি দেয়! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! দেখতে পেলে আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের সত্বর না মরা পর্যন্ত আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না!' আমি তার এ কথা শুনে বড় অবাক হলাম। একটু পরে দ্বিতীয় যুবকটিও আমাকে হাত দ্বারা স্পর্শ ক'রে ঐ একই কথা বলল। ইতিমধ্যে আবূ জাহলকে লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, 'ঐ যে তোমরা যাকে খুঁজছিলে, সেই লোক।'

আমার এ কথা শোনামাত্রই উভয়েই ছুটাছুটি ক'রে গিয়ে তাকে হত্যা ক'রে ফেলল!

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সে খবর জানাল। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?" তাদের প্রত্যেকেই বলল, 'আমি হত্যা ক'রেছি।' তিনি বললেন, "তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ?" তারা বলল, 'জী না।' তিনি দেখলেন, উভয়ের তরবারিতে রক্ত লেগে আছে। অতঃপর বললেন, "তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

যুবক দু'টির নাম ছিল, মুআয বিন আফরা' ও মুআয বিন আম্র। কোন কোন বর্ণনায় মুআওয়ায বিন আফরা' নামও পাওয়া যায়।

মোটকথা, হকের জন্য উভয় যুবকের জানবাজির প্রতিযোগিতা সত্যই শিক্ষণীয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু ক'রে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ?" তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, "ওরা হল তারা, যারা দাগায় না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।"

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, '(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন!' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে একজন।" অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন।' তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

উমার বিন খাত্ত্বাব رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, 'যদি কোনদিন আবূ বাক্‌রকে হারাতে পারি, তাহলে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব।' সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "(এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কি রেখে এলে?" উত্তরে আমি বললাম, 'অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।' আর এদিকে আবূ বাক্‌র তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাঁকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কি রেখে এলে?" উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!' তখনই মনে মনে বললাম যে, 'আবূ বাক্‌রের কাছে কোন

প্রতিযোগিতাতেই আমি জিততে পারব না।' *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

একদা মুহাজেরীনদের একটি গরীবের দল আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে নিবেদন ক'রে বলল, 'ধনীরা (বেহেশ্তের) সমস্ত উঁচু উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়ে গেল। কারণ, তারা নামায পড়ে যেমন আমরা পড়ি, রোযা রাখে যেমন আমরা রাখি, কিন্তু তারা দান করে আমরা করতে পারি না, দাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। (এখন তাদের সমান সওয়াব লাভের কৌশল আমাদেরকে বলে দিন।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় অগ্রণী লোকদের সমান হতে পার, তোমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী লোকদের আগে আগে থাকতে পার এবং অনুরূপ আমল যে করে সে ছাড়া তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে না পারে?" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ক'রে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।" (মুহাজেরীনরা খোশ হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে ধনীরা এ খবর জানতে পেরে তারাও এ আমল শুরু ক'রে দিল।) মুহাজেরীনরা ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ধনী ভায়েরা এ খবর শুনে তারাও আমাদের মত আমল করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। (অতএব আমরা আবার পিছে থেকে যাব।) মহানবী ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। (এতে তোমাদের করার কিছু নেই।) *(বুখারী, মুসলিম ৮৩৭০নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত এশা ও ফজরের নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

কোন মানুষের প্রতি হিংসা বৈধ নয়। হিংসা ক্ষতি ছাড়া কিছু আনে না। কিন্তু যে হিংসাতে লাভ আছে, তা করুন। নবী ﷺ বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অর্থাৎ, উক্ত দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। আর ঐ ঈর্ষা করলে মানুষ ইহ-পরকালে বড় হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন ২২-২৬ আয়াত)*

পর্দার বিধান

নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সব দেশে জোরদার হয়ে উঠেছে। আসলে যৌন-স্বাধীনতার আইন প্রায় সব দেশে লাগামহীন হয়ে উঠেছে। আল্লাহর বিধান লংঘন ক'রে মহিলা তথা তাদের রূপ-যৌবনের লুটেরারা দিন দিন প্রগতির দাবী জানিয়ে নারীকে আলোকপ্রাপ্ত করতে চাচ্ছে। আলো মানে জ্ঞানের আলো নয়, শিক্ষা ও সভ্যতার আলো নয়; বরং সূর্যের আলো। সূর্যের আলো মহিলার দেহে যত বেশী পাবে, মহিলা তাদের কাছে তত সভ্যতা ও আলোকপ্রাপ্ত হবে!

পুরুষের সমানাধিকার দাবী ক'রে পুরুষের চেয়ারে ঠেসাঠেসি শুরু করেছে! দেহাঙ্গের গঠন ও সৌন্দর্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লেবাসে পুরুষের সমান স্বাধীনতা দাবী করছে। আর তাতে লাভ নৈতিকতাহীন পুরুষের থাকলেও এমন স্বাধীনতাকামী মহিলাও তো নৈতিকতা-বিরোধী।

পক্ষান্তরে নীতি-নৈতিকতার ধর্ম ইসলাম নারীকে হিফাযতে রাখতে চায়, নারীকে চরিত্রের বেড়াতে বেড়ি দিয়ে নয়, বরং পরপুরুষের চোখের আড়ালে রাখতে চায়। নারীকে যে প্রকৃতি ও দেহাঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে তার উপযুক্ত অবস্থানক্ষেত্র ঘরই। পুরুষ করবে মেহনতের কাজ বাইরে, আর নারী করবে সংসার ও সন্তান লালন-পালনের কাজ ঘরের ভিতরে। এই বিধানই সৃষ্টিকর্তার বিধান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

কিন্তু প্রয়োজনে ঘরের বাইরে মহিলা যেতে পারে। তবে সে যাওয়া হবে মুসলিম রমনীর মত, সভ্যতার সাথে, সম্ভ্রমের সাথে, আদবের সাথে, পর্দার সাথে। আর তাতে সম্ভ্রান্ত মহিলা ও দাসীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হবে। মহান আল্লাহ সে বিধান দিয়ে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ঐ ৫৯ আয়াত)*

শুধু মহিলাদেরকেই গোপন থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে---তা নয়; বরং পুরুষদেরকেও বলা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (٣٠) سورة النــــور

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। *(সূরা নূর ৩০ আয়াত)*

জাবের ﷺ বলেন, আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" *(মুসলিম)*

অন্যদিকে মহিলাদেরকেও বলা হল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের দেহ-সৌন্দর্য গোপনে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ.. }

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

যদি কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের কোন কালেও বিবাহ বৈধ না হয়, তাহলে সে পুরুষকে তার মাহরাম বা এগানা বলা হয়। আর কোনও কালে যদি তার সাথে বিবাহ বৈধ হয়, তাহলে তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। এমন মহিলা-পুরুষের (সাবলকত্বের পরপরই) আপোসে দেখা-সাক্ষাৎ ইসলামে বৈধ নয়। পক্ষান্তরে দেখা-সাক্ষাৎ ও লেনদেন যদি প্রয়োজনে করতেই হয়, তাহলে তার বিধান হল পর্দা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! পর্দায় মুসলিম নারীর মূল্য হ্রাস করেনি, বরং বর্ধন করেছে। মূল্যবান জিনিসকে হিফাযতের সাথেই গোপনে রাখা হয়। আকর্ষণীয় জিনিসকে জ্ঞানীরা লোভীদের নজর থেকে গোপনে রাখেন। বলুন, কলার বাজারে ছিলা কলা কি কেউ পছন্দ করে? এক ডালি চকলেটের ভিতরে যে চকলেট কাগজ-মোড়া নেই, সেই চকলেট কি কেউ পছন্দ করে? অবশ্য কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের অবশ্যই আছে। কিন্তু সুরুচির দিক থেকে কোন জিনিস বেশী ভাল---ঢাকা, না আঢাকা?

বলা বাহুল্য, বেপর্দা নারীরই মান নেই, দাম নেই। পর্দার সাথে নারীর মান আছে বলেই সঊদী আরবে যুবকরা সহজে বিয়ে করতে পারে না, যেমন পণ-প্রথার কারণে আমাদের দেশের মেয়েদের সহজে বিয়ে হয় না।

ব্রাদারানে ইসলাম! যাদের সাথে ফষ্টিনষ্টি হওয়ার বেশী আশংকা আছে, আপনার স্ত্রীকে

তাদের সাথেই বেশী পর্দা বজায় রাখতে আদেশ করুন। ওরা যাকে দ্বিতীয় বর বা 'দেওর' নাম দিয়েছে, আপনি কি চান আপনার কোন ভাই বা অন্য কেউ আপনার স্ত্রীর দ্বিতীয় বর হোক? আপনি কি 'দাইয়ূস' হতে চান? তাহলে তার শাস্তি শুনুন, মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)" *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

আর আপনার বেগানা আত্মীয়রা আপনার স্ত্রীর জন্য মৃত্যু স্বরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?' তিনি বললেন, "দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

আপনি আপনার আত্মীয়কে ফিরিশ্তার মত বিশ্বাস করলেও নবীজীর নির্দেশ মানতে ভুল করবেন না।

না পর্দার বিধান গোঁড়ামি নয়। যেহেতু ইসলামের বিধান ঠিকমত পালন করা গোঁড়ামি নয়; বরং তাতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা, পর্দার সাথেও বাইরে যেতে না দেওয়া, বাসে-ট্রেনে চড়তে না দেওয়াই গোঁড়ামি।

যদি বলেন, পর্দা তো নিজের কাছে। নিজে ঠিক থাকলে বোরকা ঢাকার দরকার নেই। কিন্তু মহিলা ঠিক থেকে বেপর্দা হলে তাকে দেখে পুরুষ তো ঠিক থাকবে না। আর এ জন্যও পর্দা মানতে হবে।

পর্দাহীনতা ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা।

পর্দাহীনতা ঃ নগ্নতা, অসভ্যতা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, ঈর্ষাহীনতা ও প্রগলভতা।

পর্দাহীনতা ঃ সাংসারিক অশান্তি, ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম, ধর্ষণ, অপহরণ প্রভৃতির ছিদ্রপথ।

পর্দাহীনতা ঃ যৌন অনুভূতি উদ্রেকের সহায়ক, মানবরূপী শয়তানদের চক্ষুশীতলতা।

পর্দাহীনতা ঃ দুষ্কৃতীদের নয়নাভিরাম, চরিত্রের কালিমা, কিয়ামতের অন্ধকার।

পর্দাহীনতা ঃ ইবলীসী ও জাহেলিয়াতী প্রথা। বরং জাহেলী যুগের মেয়েরাও আজকের সভ্য যুগের আলোকপ্রাপ্ত মহিলা দেখে লজ্জা পাবে।

বেপর্দা মেয়েদের জাহান্নাম থেকে কোন পর্দা নেই।

পক্ষান্তরে পর্দা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।

পর্দা ঃ নারীর নারীত্ব, সতীর সতীত্ব, সম্ভ্রম ও মর্যাদা।

পর্দা ঃ প্রেম ও চরিত্রের পবিত্রতা, অনাবিলতা ও নিষ্কলঙ্কতা।

পর্দা ঃ লজ্জাহীনতা, অন্তর্মাধুর্য, ও সচ্চরিত্রতা।

পর্দা ঃ মানবরূপী শয়তানের দৃষ্টি ও কবল থেকে রক্ষাকবচ।

পর্দা ঃ ইজ্জত হিফাযত করে, অবৈধ প্রণয়, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, ব্যভিচার দূর করে, নারীর মান ও মূল্য রক্ষা করে।

পর্দা ঃ কাফের ও ক্রীতদাসী থেকে মুসলিম নারীকে পৃথক করে।

নারীদের প্রধান শত্রু হল তার যৌবন। আর পর্দা হল তার লালকেল্লা।

পর্দা ঃ আল্লাহর আযাব ও তার দোযখ থেকে পর্দা।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট

নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

কুরআন কারীমের গুরুত্ব

ব্রাদারানে ইসলাম! মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট পথ-নির্দেশিকা এসেছে, আমরা তা উপেক্ষা করেছি। মহান আল্লাহর তরফ থেকে একটি গাইড-বুক এসেছে, আমরা তা অবজ্ঞা করেছি। মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট কুরআন এসেছে, আমরা তা থেকে বিমুখ রয়েছি। না তা শিক্ষা করি, না তার উপর আমল করি, আর না তার কদর জানি।

রসূল ﷺ-এর এই অভিযোগের কথা মহান আল্লাহ আল-কুরআনে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (٣٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।' *(সূরা ফুরকান ৩০ আয়াত)*

মুশরিকরা কুরআন পাঠের সময় খুব হৈ-হল্লা করত, যাতে কুরআন না শোনা যায়। এটাও এক ধরনের কুরআন পরিত্যাগ করার নামান্তর। কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা, তা শিক্ষা না করা, না পড়া এবং সেই মত আমল না করাও কুরআন বর্জন করার নামান্তর। কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা, তার আদেশাবলী পালন না করা ও তাঁর নিষেধাজ্ঞাবলী হতে বিরত না থাকাও এক প্রকার কুরআন ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। অনুরূপ তার উপর অন্য কোন কিতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়াও তা পরিত্যাজ্য মনে করার মধ্যে গণ্য।

কিন্তু আমাদের অনেকে এ কুরআনের তা'যীম করে, এ কুরআন ধরে চুমু খায়, সুন্দর কাপড়ে জড়িয়ে সুন্দর বাক্সে ভরে উঁচু তাকে তুলে রাখে। কুরআনের তাবীয ব্যবহার করে, মরা মানুষের কাছে ও তার নামে কুরআনখানী করে।

অথচ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে জীবিত মানুষের জন্য, মৃতর জন্য নয়।

এ কুরআন মানুষকে পথের দিশা দেয়, অন্ধকারে আলো দেয়, শোকে সান্ত্বনা দেয়, মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। *(সূরা ইসরা ৯ আয়াত)*

ঝড়-তুফানের মাঝে যে ব্যক্তি উদ্ধার কাজের কর্মীদের ছুঁড়ে দেওয়া রশি ধরতে পারবে, সে বন্যায়

ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আল-কুরআনও আল্লাহর রশি। যে তা মজবুতভাবে ধারণ করবে, সে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

এ কুরআনে রয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য সবকিছুর বর্ণনা। এতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার নীতি। স্ত্রীর বিছানা থেকে নিয়ে রাজদরবার পর্যন্ত সকল আদর্শের বয়ান। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (٨٩)

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। *(সূরা নাহল ৮৯ আয়াত)*

এ কুরআন মানুষের মনের আমূল পরিবর্তন আনে। জ্ঞানীদের মনে বিপ্লব আনে। উমারের মনে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা ভেবে দেখুন। সাহাবাদের মনে কি বিপ্লব এসেছিল, তা চিন্তা ক'রে দেখুন।

কুরআন সবচেয়ে বড় মু'জিযা। এর অলৌকিকতা এই যে, এর মত বাণী কোন পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক রচনা করতে পারেনি, আর পারবেও না। মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তিনি বলেন,

{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} (٨٨) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।' *(সূরা ইসরা ৮৮ আয়াত)*

{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (٢٤)

অর্থাৎ, আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী (এ কাজে সহযোগী উপাস্যদের)কে আহবান কর। যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩-২৪ আয়াত)*

বহু মিথ্যা নবী নিজের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা দাবী ক'রে হাসির পাত্র হয়েছে। পারেনি কুরআনের মত বাক্য রচনা করতে।

এই কুরআন যা 'লওহে মাহফূয'-এ ছিল, সেই কুরআন যা শেষনবী ﷺ-এর উপর ২৩ বছরে কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ কুরআন ৩০ পারা। ৪০, ৬০ অথবা ৯০ পারা নয়। আর কুরআনের তফসীর কুরআন নয়। এ ছাড়া আর কোন গুপ্ত কুরআন নেই।

এ কুরআনের কথা শুনে কাফেররা ভয় করে, ভয় করে তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে। তারা

জানে যে, মুসলিমদের অমুসলিম করা যাবে না। অতএব মুসলিমদের বুক থেকে এই কুরআনকে সড়িয়ে দাও। যেহেতু কুরআনহীন মুসলিম তাদের জন্য কোন সমস্যার কারণ নয়। তারা কখনো কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করতে চায়, পৃথিবীর বুক থেকে কুরআনকে মুছে দিতে চায়। কারণ তাদের মতে কুরআন অশান্তি, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে!

আমরা বলি, তাই যদি হয়, তাহলে সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দাও। অতঃপর কোন সময় যদি দরকার পড়ে, তাহলে ডাক দাও, 'বাইবেল এসো।' আসবে না। 'মহাভারত এসো।' আসবে না। 'গীতা এসো।' আসবে না। কারণ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাহলে আসবে কিভাবে? কিন্তু যখন ডাক দিয়ে বলবে, 'কুরআন এসো।' তখন আমরা আমাদের বুক নিয়ে হাজির হয়ে বলব, 'কুরআন অক্ষত ও অবিকৃত আছে।' আমাদের লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফেয আছে। কুরআন মিটে যাবে না।

{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ}

অর্থাৎ, বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে। *(সূরা আনকাবূত ৪৯ আয়াত)*

তাছাড়া আল্লাহ খোদ কুরআনের হাফেয। তিনি বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। *(সূরা হিজর ৯ আয়াত)*

কুরআনকে মিটাতে হলে মুসলমানকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দাও। আর মুসলমান নিশ্চিহ্ন হলে তোমরাও অবশিষ্ট থাকবে না।

এ কুরআন বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানের সাথে তার কোন সংঘর্ষ নেই। তার পরিবেশিত তথ্য সত্য, বিজ্ঞান যা প্রমাণ করছে ও করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} (٨٨) سورة ص

অর্থাৎ,এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই জানতে পারবে।' *(সূরা স্বা-দ ৮৭-৮৮ আয়াত)*

{لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} (٦٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে। *(সূরা আনআম ৬৭ আয়াত)*

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ কুরআনে কোন সন্দেহ নেই।

{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক। *(সূরা বাক্বারাহ ২ আয়াত)*

কিন্তু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে সন্দেহ আছে। তা মানুষ কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে বাতিল কিছু নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।) আর এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১-৪২ আয়াত)*

এ কুরআনে যারা বিশ্বাস রাখে না, এ কুরআন যারা মান্য করে না, এ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যারা আমল করে না, তাদের ইহ-পরকালে শাস্তি আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً } (١٠١) سورة طه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কুরআন) দান করেছি। যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। *(সূরা ত্বাহা ৯৯-১০১ আয়াত)*

{فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى } (١٢٧) سورة طه

অর্থাৎ, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' *(ঐ ১২৩-১২৭ আয়াত)*

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ } (٢٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। *(সূরা সাজদাহ ২২ আয়াত)*

{لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا } (١٧) سورة الجن

অর্থাৎ, যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। *(সূরা জ্বিন ১৭ আয়াত)*

এই কুরআন হল, মানুষের দৈহিক ও হার্দিক আধি ও ব্যাধির মহৌষধ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا } (٨٢)

অর্থাৎ,আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা

সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(সূরা ইসরা ৮২ আয়াত)*

এই কিতাবের দু'টি আয়াত দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!" *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

নামাযের মধ্যে তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!" *(মুসলিম ৫৫২ নং)*

যখনই কোন জন-গোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর এই কিতাব তেলাঅত করে ও আপোসে অধ্যয়ন করে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টন ক'রে নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন----। *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

এ কুরআন যে শিখে ও শিক্ষা দেয় সেই হল শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে।" *(বুখারী ৫০২৭ নং)*

এই কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফয্‌কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পূতচরিত্র লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(মুসলিম ৭৯৮ নং)*

মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহ্‌লে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।" *(আহমদ, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২১৬৫ নং)*

কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! কুরআন পাঠকারীকে অলংকৃত করুন।' সুতরাং তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, 'হে প্রভু! আপনি ওর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।' সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।' আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

কুরআন তেলাঅতকারীকে বলা হবে, 'পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে-ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।' *(আবু দাঊদ নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮১২২ নং)*

কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাকে বলা হবে, '(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এই ভাবে সে তার (মুখস্ত করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।" *(আহমদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৮১২১ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-

লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ। (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৬৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (অধিক) ভালবাসুক অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুন, সে যেন কুরআন দেখে পাঠ করে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৪২নং)*

এ কুরআন তেলাঅত করুন। এর অর্থ জানার চেষ্টা করুন। এর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করুন। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আপনার জন্য। আপনার জীবনকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ক'রে গড়ে তোলার জন্য। এ কুরআনের উপর আমল করুন। এর আদেশ পালন করুন, নিষেধ বর্জন করুন, উপদেশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে ইহ-পরকালে কল্যাণ দান করবেন।

হারাম বাজনা-গান

ব্রাদারানে ইসলাম! মুসলিমদের মধ্যে যে সকল মহাপাপ ব্যাপক আকারে লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে একটি গান-বাজনা শোনা। অনেকে তা পাপ বিশ্বাস করেও শোনে, অনেকে না জেনে শোনে এবং অনেকে হালাল মনে ক'রে শোনে।

যারা হালাল জেনে শোনে, তাদের যুক্তি হল, গানে জ্ঞান বাড়ে। আর তা হারাম হওয়ার কোন দলীল নেই! আর এই জন্য অনেক ডিস্কো মার্কা আলেম-তালেবে ইল্মকে দেখবেন, বেপরোয়া হয়ে গান-বাজনা শুনছে।

তারা আবার চ্যালেঞ্জ ক'রে গানের সুরে বলে, 'কোন্ কিতাবে আছে রে ভাই হারাম বাজনা-গান?'

কিন্তু আমরা যারা কুরআন-হাদীস মানি, তারা একবার সমীক্ষা ক'রে দেখি, ইসলামের কোথাও গান-বাজনাকে হারাম করা হয়েছে কি না?

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ } (٦) سورة لقمان

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। *(সূরা লুক্বমান ৬ আয়াত)*

প্রায় সকল তফসীর-কিতাবে এই আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه তিন তিনবার কসম খেয়ে খেয়ে বলেছেন, 'উক্ত আয়াতে 'অসার বাক্য' বলতে 'গান'কে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এবং জাবের رضي الله عنه ও ইকরামা (রঃ) হতে।

গান হল অসার, অবান্তর, অশ্লীল ও যৌন-উত্তেজনামূলক অথবা শির্কী ও বিদআতী কথামালাকে কবিতাছন্দে সুললিত ও সুরেলি কণ্ঠে গাওয়া শব্দধ্বনির নাম। যা ইসলামে হারাম। হারাম তা গাওয়া এবং হারাম তা শোনাও। গানে হৃদয় উদাস হয়, রোগাক্রান্ত ও কঠোর হয়। গান হল 'ব্যভিচারের মন্ত্র', অবৈধ ভালোবাসার আজব আকর্ষণ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। তাই তো

"মহানবী ﷺ নগ্নতা ও পর্দাহীনতা এবং গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৬৯১৪ নং)*

মিউজিক বা বাজনা শোনাও মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, বাজনা-ঝংকারও মানুষের মন মাতিয়ে তোলে, বিভোরে উদাস করে ফেলে এবং উন্মত্ততায় আন্দোলিত করে। সবচেয়ে শুদ্ধ হাদীসের কিতাব বুখারী শরীফে, মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।" *(বুখারী ৫৫৯০, আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সহীহুল জামে' ৫৪৬৬ নং)*

তিনি বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৫৪৫৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।" *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭০৮ নং)*

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "ফিরিশ্তা সেই কাফেলার সঙ্গী হন না; যে কাফেলায় ঘন্টার শব্দ থাকে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৭৩৪২ নং)*

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর হল শয়তানের বাঁশি।" *(মুসলিম২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬ নং)*

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, যে কাফেলা, অনুষ্ঠান, মিছিল, মিটিং, বিয়ে বা দাওয়াতে মিউজিক থাকে অথবা কোন বাদ্যযন্ত্র বা রেকর্ডের গান-বাজনা থাকে, সেখানে অবশ্যই ফিরিশ্তার স্থানে শয়তান আশ্রয় নেয়। তাই এমন শয়তানী অনুষ্ঠানে যোগদান করাও মুসলিমের জন্য অবৈধ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ঢোলক হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশীও হারাম।' *(বাইহাকী)*

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'ঢোলক মুসলিমদের ব্যবহার্য নয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সহচরগণ ঢোলক দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন।' *(দেখুন, তাহরীমু আলাতুত ত্বার্ব, আলবানী)*

যারা বাজনা শোনা হালাল বলে, তারা আরো বলে, 'দাউদ নবীর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হল এ জাহান, কোন্ কিতাবে আছে রে ভাই হারাম বাজনা-গান?'

অথচ এ কথা মিথ্যা যে, দাউদ عليه السلام বাঁশি বাজাতেন। বরং দাউদ নবীর কণ্ঠস্বর খুব ভাল ছিল। তাঁর তাওরাত পাঠের সুর শুনে জাহান মোহিত হয়েছে; বাঁশি বাজানোর লীলা কোন নবীর হতে পারে না। বড় দুঃখের বিষয় যে, ওরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে প্রসন্ন রাখার জন্য নবীদের চরিত্রেও অপবাদ দিতে কসুর করেনি! যেমন অবৈধ প্রেম-পাগলরা তাদের সে কাজের দলীল স্বরূপ ইউসুফ নবীর চরিত্রে অপবাদ দিয়ে বলে, 'প্রেম করেছে ইউসুফ নবী, তার প্রেমে যোলেখা বিবি গো....!' সুতরাং হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।

গান হালালকারীরা আরো যুক্তি দেয় যে, 'গান যদি হারাম হল, তাহলে তোমরা কেন সুর ক'রে আযান দাও বল? সুর ক'রে কুরআন তেলাঅত কর কেন, গজল বল কেন?'

বুঝতেই পারছেন, জাহেলদের দলীল তাদের মতই। তার মানে 'মদ যদি হারাম হল, তাহলে তোমরা কেন দুধ খাও বল?'

ওরা বলে, 'গানে জ্ঞান বাড়ে।' হ্যাঁ, অবশ্যই অধিকাংশ প্রেমের জ্ঞানই বাড়ে। আর যেগুলি ইসলামী গান বলা হয়, সেগুলি বাজনার ঝোলে মিশে গিয়ে তাও শোনা হারাম হয়ে যায়।

ওরা আরো বলে, 'গান হল রূহের খোরাক।' দুশ্চিন্তা ও কষ্টের সময় জ্বালাময় হৃদয়ের পোড়া-ঘায়ের মলম!

অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে গান হল, 'প্রেম-পীড়িত' রূহের খোরাক। কারণ, প্রেমে থাকে মাদকতা। বনের ময়ুর নাচার মত হৃদয়ের মঞ্চে প্রেমের রুনুঝুনু নাচ আছে। আর সে নাচের সাথে তাল মিলায় ঐ গান-বাজনা। তাছাড়া অবৈধ প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে শয়তান। তাই শয়তানের বাণীর মাঝেই পিরীতের জ্বালাময় অন্তরে মিঠা-পানির আস্বাদ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কুরআন হল রহমানের বাণী। আর তা হল মুসলিম রূহের একমাত্র খোরাক।

বিরহ বেদনাহত বহু যুবক, যাদের স্ত্রী (কাছে) নেই, অনুরূপ বহু যুবতী, যাদের স্বামী (কাছে) নেই, তারা গান-বাজনা শুনে (অনেকে বা গেয়ে-বাজিয়ে) মনকে 'ফ্রি', স্থির ও সান্ত্বনিত করতে চায়। এরা কিন্তু আসলে মনের তাপকে গানের আগুন দিয়ে ঠান্ডা করতে চায়। যার ফলে সেই তাপ আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ, অধিকাংশ গান হল প্রেমমূলক; প্রেমকাহিনী, প্রেম-মিলন, বিরহ-বেদনা, মিলন-আবেদন, নারী-সৌন্দর্য প্রভৃতি যৌন-জীবনের গাঁথা কথাই গানে গাওয়া হয়ে থাকে। যা শুনে যৌনক্ষুধা আরো বেড়ে যায়। ছাই-চাপা প্রেমের আগুন গানের বাতাসে গন্‌গন্ করে জ্বলে উঠে ফিন্‌কি উড়াতে শুরু করে। আর তখনই মন চুরি করে গোপনে স্বামী বা স্ত্রীর খেয়ানত ক'রে বসে অথবা করতে চায়! মনের জ্বালা মিটাবার জন্য দূরের বন্ধুর প্রতীক্ষা করতে আর ধৈর্য থাকে না।

বলা বাহুল্য, এ জন্যই সুবিজ্ঞ সাহাবী বলেন, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।' গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হলে মৃত জমিতে যেমন সুন্দরভাবে ঘাস-গাছ উদ্‌গত হয়, ঠিক তেমনি গান শোনার ফলে যৌন-পীড়িত মনের জমিতে ব্যভিচারের প্রবল বাসনা জাগ্রত হয়।

অতএব গানে কক্ষনই মন সান্ত্বনিত হয় না; বরং আরো বিক্ষিপ্ত, চিন্তিত ও উত্তেজিত হয়। দগ্ধ, অস্থির ও ব্যাকুল মনকে শান্ত ও স্থির করতে হলে মনের সৃষ্টিকর্তার 'প্রেস্‌কিপ্‌শন' নিতে হবে। তিনি বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (٢٨)

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

যারা মনে করেন, গান-বাজনার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিলে উপকার হবে, তারা আসলে পেশাব দিয়ে পায়খানা ধোওয়ার চেষ্টা করে।

পক্ষান্তরে যে ভাল লোকেরা গান-বাজনার কোন বাতিল অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য ক'রে বাড়িতে জামাই ডাকেন এবং মেলা দেখতে টাকা-পয়সা দিয়ে গান-বাজনা শোনাতে সাহায্য করেন, তাঁদেরও ভয় হওয়া উচিত।

এ দুনিয়ায় সকল মানুষই গোলাম। আর সে গোলাম দুই শ্রেণীর; রহমানের গোলাম ও শয়তানের গোলাম। রহমানের গোলামদের কিছু গুণ বর্ণনা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } (٧٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ,(তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার ক'রে চলে। *(সূরা ফুরক্বান ৭২ আয়াত)*

ইবনে উমার বাজনা শুনে কানে আঙ্গুল রেখে নিতেন। আপনি কানে আঙ্গুল না রাখলেও কান তুলে মন দিয়ে কোন গান-বাজনা শুনবেন না, ছেলে-বউ, বেটি-জামাই কাউকেও শুনতে দেবেন না।

আরো শুনুন আল্লাহর বান্দার বিশেষ গুণ,

{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ } (٥٥) سورة القصص

অর্থাৎ, ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন ওরা তা পরিহার ক'রে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৫ আয়াত)*

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } (٣)

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। *(সূরা মু'মিনূন ১-৩ আয়াত)*

হে রাহমানুর রাহীম! তুমি আমাদেরকে শয়তানের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে রহমানের গোলাম বানিয়ে নাও। আমীন।

দানশীলতা ও কার্পণ্য

ব্রাদারানে ইসলাম! দান শুধু বড়লোকদের জন্য নয়। বড়লোকরা তো যাকাত-ওশর দেবেই। কিন্তু দান-খয়রাত ধনী-মধ্যবিত্ত সকলকেই করতে হবে।

দান করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কম নয় ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়। ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুণ খাদ্য শস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী। *(সূরা বাকারাহ ২৬৫ আয়াত)*

{لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } (١١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাতে কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣٤)

অর্থাৎ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে; যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষদেরকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আল ইমরান ১৩৩- ১৩৪ আয়াত)*

{وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨) وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٩٩)

অর্থাৎ, আর এই মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তনসমূহের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত হয়, আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন। আর মরুবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি (পূর্ণ) ঈমান রাখে আর যা কিছু ব্যয় করে তা আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে; স্মরণ রাখো, তাদের এই ব্যয়কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ,; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করে নিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। *(সূরা তাওবাহ ৯৮-৯৯ আয়াত)*

{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٢٧٠) إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١) لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} (٢٧٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা (নযর) তোমরা গ্রহণ কর না কেন আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন আর অত্যাচারীগণের কোনই সাহায্যকারী নেই। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি তোমরা তা গোপনভাবে কর ও গরীবদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য বেশী উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে অবহিত। তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার উপর নেই বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধন-সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টায় ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না; এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাকারাহ ২৭০-২৭২ আয়াত)*

{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٦)

অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদেরই নিজেদেরই কল্যাণে। যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই হবে সফলকাম। *(সূরা তাগাবুন ১৫- ১৬ আয়াত)*

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (١٠)

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে এবং সদ্বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর সদ্বিষয়ে মিথ্যারোপ করলে অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। *(সূরা লাইল ৫- ১০ আয়াত)*

যাকাত প্রদান করা এবং দানশীলতা মুমিনদের গুণ ঃ-

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (١٩)

অর্থাৎ, সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রদান করবেন: কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো। এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক। *(সূরা যারিয়াত ১৫- ১৯ আয়াত)*

{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (٤) سورة الأنفال

অর্থাৎ, যারা নামায কায়েম করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার। এদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। *(সূরা আনফাল ৩- ৪ আয়াত)*

{آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (٧)

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। *(সূরা হাদীদ ৭ আয়াত)*

{وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয় তাও তাদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। *(সূরা তাওবাহ ১২১ আয়াত)*

{إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} (٣٠) سورة فاطر

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার কোন ক্ষয় নেই। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। *(সূরা ফাত্বির ২৯-৩০ আয়াত)*

{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }

অর্থাৎ, যারা রাত্রে ও দিবসে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৪ আয়াত)*

{وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ } (١٠) سورة المنافقون

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। *(সূরা মুনাফিকূন ১০ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে সে কাল সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর, যাতে ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। *(সুরা বাক্বারাহ ২৫৪ আয়াত)*

{قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ } (٣١) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদেরকে বল, নামায কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না। *(সূরা ইব্রাহীম ৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের যথার্থ সদ্ব্যবহার করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে, বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে এবং দরিদ্রতার পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১০৭৭৭ নং)*

দান ক'রে দোযখ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। আদী বিন হাতেম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান ক'রে হয়। যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও তবে উত্তম কথা বলে।" *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

ধনীর ধনের হিসাব লাগবে কিয়ামতে। হিসাবের জন্যই ধনীদের বেহেশ্তে যেতে দেরী হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি বিষয়ে কৈফিয়ত না দেওয়ার পূর্বে কিয়ামতের দিন কোন মানুষের পা সরবে না-- - (তার মধ্যে একটি বিষয় হল এই যে,) সে তার ধন-সম্পদ কোন্ উপায়ে অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে?" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২১ নং)*

দান করলে সেই দান জমা থাকে আখেরাতে। দানবীর নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, 'বান্দা বলে, আমার মাল, আমার মাল।' অথচ তার আসল মাল হল তাই, যা খেয়ে শেষ করেছে অথবা পরে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান ক'রে জমা রেখেছে। এ ছাড়া যা কিছু তার সবই চলে যাবে এবং লোকের জন্য ছেড়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

একদা নবী-পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করে তার গোশ্ত্ দান করা হল। আল্লাহর রসূল ﷺ এসে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি বাকী আছে?" আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বললেন, 'তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "বরং তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া সবটাই বাকী আছে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

দান করলে মাল কমে যায় না। বরং তাতে বর্কত ও বৃদ্ধি হয়। গণনায় না হলেও কার্যক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়, চাহে তা বান্দা বুঝতে পারুক অথবা না-ই পারুক। মহানবী ﷺ বলেন, "দান করলে মাল কমে যায় না। ক্ষমাশীলতার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বর্ধিত করেন এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন।" *(মুসলিম, তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। সেখান থেকে নালা বেয়ে সেই পানি বইতে শুরু করল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম)*

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারা নিষ্পাপ ফিরিশ্তার কাছে বর্কতের দুআ পেয়ে থাকে। আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

উক্ত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (٣٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ

রুযীদাতা। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

একটি দান করলে তার প্রতিদান সাত শ গুণ পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে; মহান আল্লাহ বলেন,

{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (٢٦١) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬১ আয়াত)*

এক ব্যক্তি দান করার জন্য একটি লাগাম লাগানো উটনী নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, 'এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)। এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, "এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি ৭০০ টি উটনী পাবে; যাদের প্রত্যেকটি মুখে লাগাম লাগানো থাকবে।" *(মুসলিম)*

আবু হুরাইরা ﷛ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

মহান প্রতিপালক আমাদের নিকট থেকে ঋণ চান এবং সেই সাথে বহুগুণ মুনাফা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন,

{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (٢٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দান করবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন? আর আল্লাহই রুযী সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ } (١١) سورة الحديد

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দান করবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তা তার জন্য দ্বিগুণ-বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন এবং তার জন্য হবে মহাপুরস্কার? *(সূরা হাদীদ ১১ আয়াত)*

{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ }

অর্থাৎ, নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার? *(সূরা হাদীদ ১৮ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করে বলেন, (ওদের উপমা) দুটি লোকের মত যাদের পরিধানে থাকে একটি করে লোহার জুব্বা। তাদের হাতদুটি বুক ও টুঁটির সাথে জড়ীভূত। এরপর দানশীল যখনই একটি কিছু দান করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি (ঢিলার কারণে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা

করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে আরো এঁটে যায় এবং প্রতিটি কড়া তার নিজের জায়গা বসে যায়।" বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর আঙ্গুল নিজের জামার বুকের খোলা অংশে রেখে ইঙ্গিত করলেন। তুমি তাঁকে দেখলে দেখতে, তিনি জুব্বাকে ঢিলা করতে চেষ্টা করলেন অথচ তা ঢিলা হল না। *(বুখারী ৫৭৯৭ নং, মুসলিম ১০২১ নং)*

অপরের দান করা দেখে হিংসা করা উচিত। মহানবী ﷺ বলেন, "দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে হিংসা বৈধ নয়; সেই ব্যক্তির হিংসা করা যায়, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, ফলে সে তা হক পথে ব্যয় করতে তওফীক লাভ করেছে এবং সেই ব্যক্তির হিংসা করা যায়, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, ফলে সে তার দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে এবং তা লোককে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬নং)*

সাদকায় রোগমুক্তি আছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকাহ দ্বারা কর।" *(সহীহুল জামে ৩৩৫৮নং)*

দান-খয়রাত করলে পাপ মাফ হয়। মহান আল্লাহ দানশীল মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ } (١٧)

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। *(সূরা তাগাবুন ১৭ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সদকাহ গোনাহ নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ য়্যা'লা, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৬৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ তার সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"

এ হাদীস শ্রবণ করে আবু মারসাদ কোন দিন ভুলেও কিছু না কিছু সদকাহ করতে ছাড়তেন না। হয় কেক, না হয় পিঁয়াজ (ছোট কিছুও) তিনি দান করতেন। *(আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

নবী ﷺ আরো বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠান্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।" *(ত্বাবাঃ কাবীর, বাঃ, সঃতাঃ ৮৭৩নং)*

আবু হুরাইরা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই দানই উত্তম, যার পরে অভাব আসে না। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহিতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার নিকট আত্মীয় থেকে দান শুরু কর।" *(বুখারী ৫৩৫৫নং, ইবনে খুযাইমাহ)*

আসুন! আমরা সমাজের গরীবদেরকে দান করি, এতীম ও বিধবাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করি। মাদ্রাসা-মসজিদের প্রতি খেয়াল রাখি। নিজের জান দিয়ে জিহাদ করার সুযোগ যদি না-ই ঘটে, তাহলে নিজের মাল দিয়ে জিহাদ করতে আমরা পিছপা হব কেন? আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন। আমীন।

সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা

বাস্তব কথাই হল সত্য কথা এবং বাস্তবের বিপরীত কথা হল মিথ্যা কথা। সত্যবাদিতা মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকের গুণ ও লক্ষণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} (١) سورة المنافقون

অর্থাৎ, যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" *(সূরা মুনাফিকূন ১ আয়াত)*

নবী করীম ﷺ বলেন, 'মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খেয়ানত করে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সত্যবাদিতার ফলে মু'মিনরা প্রতিদান পাবে। আর মুনাফিকরা তাদের মিথ্যাবাদিতার সাজা ভুগবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٢٤) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, ...কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা হলে কপটাচারীদেরকে শাস্তি দেন অথবা ওদের তওবা গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ২৪ আয়াত)*

আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত এই নৈতিক শৈথিল্য আমাদের কথা, কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, অঙ্গীকার লেন-দেন প্রভৃতিতে এমন বিস্তার লাভ করেছে; যাতে এমন মনে হয় যে, এটা এক প্রশংসার্হ চাতুরী! বরং অনেকের দাবী যে, এই 'রাজনীতি' না জানলে সাফল্যলাভ খুব অসম্ভব হয়ে পরে। আবার বাস্তব এই যে, কেউ সত্য বললেও তার উপর কারো আস্থা থাকে না। যেহেতু মিথ্যা সমাজের প্রায় সকল সভ্য ও সদস্যই ব্যবহার ক'রে থাকে। তাই সত্য কথাতেও শ্রোতার সন্দেহ ও ধোকা হয়। বাস্তব দর্শনে অনেকে বলে, 'পাগল আর শিশু ছাড়া কেউ সত্য বলে না।' তাইতো এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রে সমাজ বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় মিথ্যা ফাসেকী ও অন্যায়ের প্রতি পথ-প্রদর্শন করে এবং ফাসেকী ও অন্যায় দোযখের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সে মিথ্যাবাদী রূপে নির্ণীত হয়ে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ মিথ্যা বলে থাকে তার শাস্তির কথা তিনি তাঁর স্বপ্নে দেখলে তা বর্ণনা ক'রে বলেন, "অতঃপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তারই পার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি লোহার আঁকুশি হাতে দণ্ডায়মান। শায়িত ব্যক্তির এক পাশে এসে তার চোয়ালের চামড়াকে ঘাড় পর্যন্ত, নাক হতে ঘাড় পর্যন্ত এবং চোখ হতে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার দ্বিতীয় পাশে এসে প্রথম পাশের মতই চিরছে। এক পাশ চিরতে চিরতে অপর পাশ অক্ষত অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে! অতঃপর ঐ পাশে ফিরে গিয়ে

একই রকমভাবে চিরে ফেলছে এবং এইভাবে তার সাথে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত করা হবে।" *(বুখারী)*

ব্যবসার ক্ষেত্রেও মিথ্যা খুব বেশী প্রচলিত। বরং অনেকে বলে, 'মিথ্যা না বললে ব্যবসা চলে না।' আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক-পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের (ক্রয়-বিক্রয়ে) এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং তারা যদি সত্য বলে এবং সব কিছু স্পষ্ট করে বলে, তাহলে তাদের ব্যবসায় বর্কত দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তারা (ত্রুটি ইত্যাদি) কিছু গুপ্ত করে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের ব্যবসায় বর্কত দূর করে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যুকরা বাস্তব বিকৃত করে, হককে বাতিল এবং বাতিলকে হকরূপে প্রদর্শন করে। সৎকে অসৎ আর অসৎকে সৎ ক'রে প্রকাশ করে। শ্রদ্ধার্হকে ঘৃণার্হ এবং ঘৃণার্হকে শ্রদ্ধার্হ বলে অপলাপ করে। এটাই তো মিথ্যুকদের জঘন্য পুঁজি। শ্রাব্য ও পাঠ্য সকল প্রচার মাধ্যমে মিথ্যার কবল হতে বাঁচাও মুসলিমদের কর্তব্য। এমন মিথ্যুকরা সত্যই ভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} (٢٨) سورة غافر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' *(সূরা মুমিন ২৮)*

মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলা, যা বলেননি তা নিজের তরফ থেকে গড়ে বা বানিয়ে বলা আরো সর্বনাশী অতি মহাপাপ। যে নিয়তেই হোক এমন মিথ্যা ও গড়া কথা বলার দুঃসাহসিকতার শাস্তি সাধারণ নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

"সুতরাং যে ব্যক্তি বিনা ইলমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা আনআম ১৪৪ আয়াত)*

"বল যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা পরিত্রাণ পাবে না।" *(সূরা ইউনুস ৬৯)*

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" *(সূরা যুমার ৬০)*

"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে সেহেতু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না যে, 'এটা বৈধ এবং ওটা অবৈধ।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না। *(সূরা নাহল ১১৬)*

"আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে যে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ (ওহী) হয়' যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব; তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এবং তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন যালেমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে। 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।' *(সূরা আনআম ৯৩)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমার উপর মিথ্যা বলো না। যেহেতু যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখে প্রবেশ করল।" *(বুখারী ১/১৯৯, মুসলিম ১/৯)*

"যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলল, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল। *(বুখারী ১/২০১)*

"যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা তবে সে মিথ্যুকদের অন্যতম।" *(মুসলিম)*

মিথ্যা ক'রে কোন জিনিসের লোভ দেখিয়ে হাতে বা পাত্রে কিছু আছে এই ধারণা দিয়ে শিশু বা কোন প্রাণীকে ডাকা। অথবা মিথ্যা ভয় দেখিয়ে শাসন করাও মিথ্যা, অথচ লোকে এটা মিথ্যা ভাবে না।

বিনা বিবেক ও বিচারে শ্রুত কথা প্রচার করা, কথাটি সঠিক কিনা তা না ভেবে অপরের কাছে গাওয়া, যা শোনা হয় তাই বলে বেড়ানোও এক প্রকার মিথ্যাবাদিতা। রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়।" *(সহীহুল জামে ৪৩৫৮)*

অপরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে রসিকতা করা, মিথ্যা কৌতুক গল্প বানিয়ে অপরকে হাসানো। মানুষ এ ধরনের মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করে না। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই এতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। অথচ রসূল ﷺ বলেন, "সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(ঐ ৭০১৩)*

কোন কিছু বর্ণনা করাতে অতিরঞ্জন করাও এক প্রকার মিথ্যাবাদিতা।

সমাজে মিথ্যাবাদীর স্থান নেই। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। 'সত্য কথা মিথ্যা কার? মিথ্যা বলা অভ্যাস যার।'

"মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলের গল্প---
জানে সবাই বেশী কিংবা অল্প।
'বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে' চেঁচিয়ে দিত ধোঁকা,
গাঁয়ের লোকে ছুটে গিয়ে হয়ে যেত বোকা।
সত্য যেদিন বাঘ আসিল রাখালের চিৎকারে,
বলল সবাই, 'বোকা হতে চাই না বারেবারে।'
বাঘের পেটে গেল রাখাল জীবন হল নাশ,
মিথ্যাবাদীর কথাতে কেউ করে না বিশ্বাস।"

পরিশেষে বলি, উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা

সমাজে কিছু মানুষ আছে, যারা অপরের ভাল দেখে হিংসা করে, অপরের উন্নতি দেখে জ্বলে ওঠে, অপরের সুখ দেখে দুঃখ পায়, অপরের শান্তি দেখে নিজেকে অশান্তিতে ফেলে, পরের শ্রী দেখে বড় কাতর হয়!

অথচ নিশ্চয় হিংসা ভাল জিনিস নয়, ভাল নয় অপরের ভাল দেখে তার ধ্বংস কামনা করা। মহান আল্লাহ হিংসুকদের নিন্দা ক'রে বলেছেন,

{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (٥٤) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? *(সূরা নিসা ৫৪ আয়াত)*

হিংসা খারাপ জিনিস বলেই, সে জিনিস থেকে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, "বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রতিপালকের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে। অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং ঐসব আত্মার অনিষ্ট হতে, যারা (যাদু করার উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।" *(সূরা ফালাক্ব)*

আর আমাদের নবী ﷺ বলেছেন,

"তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা (রিষারিষি) করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহ বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---" *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কি?' বললেন, "যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, হিংসা নেই।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "সুন্দর চরিত্রের মুমিন।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৩২৯১নং)*

হাসান বাসরী বলেন, 'অনিষ্টের মূল ৩টি; অহংকার, হিংসা ও লোভ। অহংকার ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল, ফলে সে আদমকে সিজদা করেনি, লোভ আদমকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং হিংসা কাবিলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ফলে সে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল।'

হিংসুকদের অবস্থা বাক্সে আবদ্ধ অনেক কাঁকড়ার মত। যাদের একজন ওপর দিয়ে উঠে পালাতে চাইলে নিচে থেকে একজন তার পা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ফলে কেউই উঠে পালাতে পারে না। হিংসুকরা নিজেরাও বেশিদূর যেতে পারে না, আর অপরকেও যেতে দেয় না।

হিংসায় পড়ে ইবলীস আদম ﷺ-কে সিজদা করেনি। হিংসার বশবর্তী হয়ে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল। হিংসায় পড়ে ভায়েরা ইউসুফ ﷺ-কে কুয়ায় ফেলেছিল। হিংসায় পড়ে কত মানুষ কত মানুষের ক্ষতি করে।

তবে হিংসা একটি এমন একটি ব্যাধি, যার মাঝে ন্যায়পরায়ণতা আছে; এ ব্যাধি হিংসিতের যত ক্ষতি না করে, তার তুলনায় বেশী ক্ষতি করে হিংসুকের।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী বলেন, হিংসুকের হিংসা হিংসিতের কাছে পৌছনোর পূর্বে হিংসুকের কাছে ৫টি শাস্তি এসে পৌছে ঃ-

(১) সে নিরত দুশ্চিন্তা (ও অন্তরজ্বালায়) দগ্ধ হয়।

(২) এমন মসীবত আসে যাতে তার কোন সওয়াব হয় না।

(৩) লোকমাঝে তার এমন বদনাম হয় যার পর সে প্রশংসিত হয় না।

(৪) আল্লাহর নিকট ক্রোধভাজন হয়।

(৫) তাওফীকের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হিংসুকের শাস্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে আপনার খুশীর সময় মনে মনে কষ্ট পায়। হিংসুক অপরের হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখে নিজের দেহকে ক্ষীণ করে।

নাজমুদ্দীন বিন মিনফাখ বলেন, 'শুনেছি যে, শয়তান জিনরা চুরি করে উর্ধ্ব জগতের কোন খবর শুনতে গেলে তাদেরকে উল্কা ছুঁড়ে মারা হয়। কিন্তু আমি যখন বড় হয়ে তারকা হলাম, তখন বড় বড় শয়তান আমাকে আঘাত করতে লাগল।'

সফলতা একটি অপরাধ, যা মানুষ ভালো মনে ক'রে অর্জন ক'রে থাকে, যা সমশ্রেণীর সহকর্মীরা ক্ষমা করে না। আলেম হয়ে আলেমের হিংসা করে, চাষী হয়ে চাষীর হিংসা করে, ব্যবসায়ী হয়ে ব্যবসায়ীর হিংসা করে, মহিলা মহিলার হিংসা করে।

হিংসুক পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহর বিরোধিতা ক'রে থাকে ঃ-

(১) সে আল্লাহর ঐ সকল নিয়ামত অপছন্দ করে, যা তার ভাইয়ের উপর প্রকাশ পেয়েছে।

(২) সে আল্লাহর রুযী-বন্টনে অসন্তুষ্ট হয়, সে যেন আল্লাহকে প্রতিবাদ সুরে বলতে চায় যে, 'কেন এইভাবে বন্টন করলেন?'

(৩) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ বিতরণ করেন। আর সে তাঁর অনুগ্রহে কৃপণতা করে।

(৪) আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে ধন-সম্পদ ও সম্মান প্রদান করেন। আর সে তাকে ঘৃণা করে অপমান করতে চায়।

(৫) সে আল্লাহর শত্রু ইবলীসকে সাহায্য করে।

পক্ষান্তরে কোন মানুষ যদি অপর ভাইয়ের প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনষ্ট কামনা না করে তার অনুরূপ নিয়ামত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেটা হিংসা বা ঈর্ষা হবে না। বরং সেটাকে সমকামনা বলা যাবে। এই রকম সমকামনা করা বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "শুধু দুই বস্তুতে (দুই ব্যক্তির) ঈর্ষা করা যায়। প্রথম ঐ ব্যক্তির যাকে আল্লাহ তাআলা মাল ধন দিয়েছেন। আর সে ঐ মাল ধন আল্লাহর রাস্তায় রাত-দিন ব্যয় করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা (হিকমত) কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর সে তার দ্বারা রাতদিন (ফায়সালা) তিলাঅত করে সওয়াব উপার্জন করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আরো একটি পবিত্র ঈর্ষা হল, স্ত্রী-কন্যা বা মা-বোনের ব্যাপারে পুরুষের ঈর্ষা। এদের কাউকে যদি এমন পুরুষের সাথে বেপর্দা হতে দেখে অথবা কথা বলতে দেখে যার সাথে বিবাহ বৈধ অথবা কারো সাথে কোন অবৈধ প্রণয়ে জড়িত হওয়ার কথা আশঙ্কা করে, তাহলে হৃদয় ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে এবং তাতে বাধা দেওয়ার শত প্রচেষ্টা চালায়। এমন হিংসার জন্য সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

এই ঈর্ষা যার ভিতরে নেই, সে মানুষের আত্মমর্যাদা নেই। সমাজে তার কোন ধার-ভার নেই। সমাজ তাকে মেড়া পুরুষ বলে। আর এ নামের সে সত্যই উপযুক্ত। এমন পুরুষের কারণেই সমাজে অনেক নোংরামি ছড়ায়, ব্যভিচার বাড়ে, সরকারী ভাবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।" *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)*

ভাইজান! আপনি যদি কারো হিংসার কবলিত হন, তাহলে এই প্রেস্কিপশন গ্রহণ করুন ঃ-

১। আল্লাহর কাছে হিংসুকের হিংসা থেকে পানাহ চান। আর সে জন্য প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করুন।

২। আল্লাহর তাকওয়া মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং ধৈর্য অবলম্বন করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ } (١٢٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা আলে ইমরান ১২০ আয়াত)*

৩। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। যেহেতু যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন।

৪। হিংসার আলোচনা থেকে মনকে খালি রাখুন। হিংসুকের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করবেন না। 'হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

৫। আল্লাহ-অভিমুখী হন। মনের কষ্টের কথা তাঁকেই জানান।

৬। গোনাহ থেকে তওবা করুন। হতে পারে যে, আপনার পাপের কারণে লোকে আপনার প্রতি হিংসা করছে।

৭। সততা ও দানশীলতা ব্যবহার করুন। তাতে অনেক হিংসুকের হিংসা দূর হয়ে যাবে।

৮। কঠিন হলেও হিংসুকের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করুন। তার যথাসাধ্য উপকার করুন। তাহলেই তার মনে হিংসার জ্বলন্ত আগুন নিভে যাবে। *(বাদায়িউল ফাওয়াইদ)*

আল্লাহ আমাদেরকে হিংসা থেকে দূরে রাখুন। যাতে আমরা না হিংসুক হই, আর না হিংসিত এবং পরশ্রীকাতর না হয়ে নিজের শ্রীবৃদ্ধির যথার্থ চেষ্টা করি।

বিপদ যখন আসে

পৃথিবীর সংসার জীবন, একদিন সুখের অপর দিন দুঃখের। একদিন মধু, অপর দিন কদু। এটাই জীবনের নীতি, এটাই সংসারের রীতি। কখনো মানুষের আনন্দের তুফান বয়ে যায়, আবার কখনো কষ্টের ঝড় সব ধ্বংস ক'রে যায়। সুখ-দুঃখের জোয়ার-ভাটা ও টানাপোড়েনের মাঝেই মানুষকে জীবনধারণ করতে হয়।

বিপদ আসে, কিন্তু আসে কেন?

১। বিপদ আসে পাপের কারেন্ট শাস্তি স্বরূপ।

আর সেই বিপদে তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়। অতি দর্পে হত লঙ্কার মত তাকে শেষ ক'রে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে অনেককে ভেঙ্গে গড়ার জন্য বিপদ দেওয়া হয়। সৃষ্টিকর্তার হাতুড়ীর নিচে আমরা জং ধরা লোহার মত। আমাদের নিষ্পিষ্ট করার জন্য তিনি আঘাত করেন না, বরং নতুন ক'রে গড়ে তোলার জন্য আঘাত করেন।

দুঃখ আসে মানুষকে নতুন করে গড়ার জন্য। গাফলতি থেকে সতর্ক করার জন্য, নিদ্রাভিভূতকে জাগ্রত করার জন্য, উদাসীন মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য। 'মহান আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের চক্ষুকে অশ্রু দ্বারা ধুয়ে দেন; যাতে সে তাঁর বিধি-বিধান সঠিকভাবে পড়তে পারে।'

খাঁচার বাঘ যদি বেশী গুঁতাগুঁতি করে, তাহলে সে তো খাঁচার শিক ভাঙতে পারে না। আর তার

বাড়াবাড়ি দেখে তার খাবার কমিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর দুনিয়া-খাঁচায় বাস করে মানুষ যদি বাড়াবাড়ি করে, তবে তার সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ}

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না। *(সূরা তাওবাহ ১২৬ আয়াত)*

{وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (١١٢) سورة النحل

অর্থাৎ, আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তারা যা করত, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ। *(সূরা নাহল ১১২ আয়াত)*

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। *(সূরা রূম ৪১ আয়াত)*

{وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (٣٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। *(সূরা শূরা ৩০ আয়াত)*

দর্পের শাস্তি স্বরূপ বিপদ কেমন আসে তার কথা আল্লাহ বলেছেন, "তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির একটি উপমা; তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুর বাগান এবং সে দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম। আর এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নদী। তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে তোমার তুলনায় আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার তুলনায় আমি বেশী শক্তিশালী।' এভাবে নিজের প্রতি যুলুম ক'রে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' উত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে বীর্য হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে তোমার তুলনায় আমাকে কম দেখলে, তখন তোমার বাগানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ হতে আগুন বর্ষণ করবেন; যার ফলে তা মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো ওকে

ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' তার ফল-সম্পদ পরিবেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল; যখন তা মাচান সহ পড়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার সত্য আল্লাহরই। পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।" *(সূরা কাহফ ৩২-৪৪ আয়াত)*

অন্য এক বাগান-ওয়ালাদের ঘটনা তিনি বলেছেন, "আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে; যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল এবং তারা 'ইন শাআল্লাহ' বলল না। অতঃপর সেই বাগানে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ফলে তা ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল। ভোর-সকালে তারা এক অপরকে ডাকাডাকি করে বলল, 'তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে সকাল সকাল বাগানে চল।' অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে শুরু করল, 'আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।' অতঃপর তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত!' তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।' অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।' শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি কঠিনতর; যদি তারা জানত। *(সূরা ক্বালাম ১৭-৩৩ আয়াত)*

২। বিপদ আসে মানুষের পাপের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে, তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে, তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮ নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

৩। বালা-মুসীবত আসে বান্দার কোন মঙ্গলের জন্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন (তাদের মঙ্গল চান), তখন

তাদেরকে বিপন্ন করেন।” *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৭০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, “মু’মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।” *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

৪। আপদ-বিপদ আসে ঈমানের পরীক্ষার জন্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক’রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা আনকাবূত ২-৩ আয়াত)*

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ }

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫ আয়াত)*

৫। কষ্ট আসে মুমিনের মর্যাদা বর্ধনের জন্য।

দুঃখ আসে মুমিন বান্দার মর্যাদাবর্ধনের জন্য। মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এইভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আযযা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!” *(আহমদ, সহীহ আবু দাঊদ ২৬৪৯ নং)*

কিন্তু বিপদ এলে কি করা উচিত?

১। ধৈর্য ধারণ করা।

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } (١٥٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।’ এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭ আয়াত)*

বিপদ-আপদ নিবারণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু তা বরণ ক’রে নেওয়ার মত প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

প্রত্যেক জিনিসই শুরুর সময় ছোট থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বড় হয়। কিন্তু মসীবত তার বিপরীত। মসীবত শুরু হয় বড় আকার নিয়ে তারপর তা ছোট হতে থাকে।

নিজের বিপদে ধৈর্য ধরুন। অপরের বিপদে ধৈর্যের উপদেশ দিন। যেহেতু “মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।” *(সূরা আস্‌র)*

২। নিরাশ না হওয়া।

মহান আল্লাহ ইয়া’কূব ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক’রে বলেন,

{وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } (٨٧)

অর্থাৎ, আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না। *(সূরা ইউসুফ ৮৭ আয়াত)*

তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক’রে বলেন,

{وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ } (٥٦) سورة الحجر

অর্থাৎ, পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়? *(হিজ্‌র ৫৬)*

{لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ } (٤٩) سورة فصلت

অর্থাৎ, মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না। কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। *(সূরা হামীম সাজদাহ ৪৯ আয়াত)*

{وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ } (٣٦)

অর্থাৎ, আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহ আস্বাদ করাই, তখন ওরা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। *(সূরা রূম ৩৬ আয়াত)*

বিপদে ভেঙ্গে যাবেন না। বরং উঠে নতুন ক’রে জীবন গড়ুন। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন না এবং অক্ষম হয়ে বসে যাবেন না।

‘যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে,
বারেক হতাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
বিপদে পতিত তবু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলে হতে পারে কাল।’

দয়ার নবী ﷺ বলেন, “মু’মিনের উপমা হল গম গাছের মত; যে হাওয়ার চাপে কখনো নুয়ে পড়ে, আবার তখনই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুনাফিক ও কাফেরের উপমা হল ‘আরযা’ **(Cedar)** গাছের মত; যা হাওয়ার চাপের মুখেও সোজা খাড়া থাকে। কিন্তু (সামলাতে না পেরে) অবশেষে ভেঙ্গে শেষ হয়ে যায়।” *(সহীহুল জামে’ ৫৮৪৪ নং)*

৩। কুমন্তব্য না করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } (١١) سورة الحج

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। *(সূরা হাজ্জ ১১ আয়াত)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন,) "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।" *(মুসলিম ২২৪৬, প্রমুখ)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিনই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম এবং প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমার উপকারী বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা কর এবং অক্ষম হয়ে যেও না। তোমার কোন বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হত।' বরং বলো, 'আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছিলেন এবং যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।' কারণ 'যদি' শয়তানের কর্ম উদ্‌ঘাটন করে।" *(মুসলিম)*

'আমি কি পাপ করলাম যে, আমার এই বিপদ? আল্লাহর কি চোখ নেই। আমারই ছেলেটা কেন নিল? আমার তৈরি বেটা কেন নিল?' ইত্যাদি অনেক প্রকার কুমন্তব্য ক'রে মানুষ নিজের ঈমান খারাপ করে। আসলে এগুলি দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক অথবা সঠিক ঈমান নেই বললেই চলে।

৪। দুআ করা।

মানুষের প্রকৃতির কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ}

অর্থাৎ, দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তাহলে তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং ওদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে, সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। *(হা-মীম সাজদাহ ৫০-৫১ আয়াত)*

{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} (٦٥)

অর্থাৎ, ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার ক'রে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন ওরা তাঁর অংশী করে। *(সূরা আনকাবূত ৬৫ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য কোন অধিকার নেই যে, আমরা বঞ্চিত হলে তাঁর প্রতি অভিযোগ আনতে পারি। তিনি যা দান করেন, তা তাঁর অনুগ্রহ। আর যা দেন না, তা তাঁর ইনসাফ। বান্দার কি অনুগ্রহ প্রার্থনা ছাড়া অন্য কিছু বলার থাকতে পারে?

বৃষ্টি কেন বন্ধ হয়?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

সূদ হারাম

আল্লাহ তাআলা সূদকে সর্বতোভাবে কঠোররূপে হারাম গণ্য করেছেন এবং সূদখোরদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন,

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (٢٧٦)

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, 'বেচা-কেনা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (٢٧٩)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সূদ ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ হল আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও না। *(ঐ ২৭৮-আয়াত)*

ইসলামী অর্থনীতিতে সূদের মত শোষণ থেকে মুসলিমকে বিরত রাখার জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামেরও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } (١٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আ-লে ইমরান ১৩০ আয়াত)*

সূদ ইহ-পরকালের ধ্বংসের কারণ। মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাঊদ, নাসাঈ)*

সূদ আপাত দৃষ্টিতে অনেক মনে হলেও পরিণামে তা অল্পই। যেহেতু সে মালে আভ্যন্তরিক বর্কত নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } (٣٩) سورة الروم

অর্থাৎ, লোকের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু তোমরা আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য যে যাকাত দিয়ে থাক, তাই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে; সুতরাং ওরাই সমৃদ্ধিশালী। *(সূরা রূম ৩৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে, তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮-নং)*

যে সূদ খায়, সে অভিশপ্ত। মহানবী ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮নং)*

আবূ জুহাইফা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ চামড়ায় দেগে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

সূদ খাওয়া সাধারণ কাবীরা গোনাহ নয়। বরং কাবায়েরের পর্যায়ে সূদ খাওয়া অনেক বড়।

মহানবী ﷺ বলেন, "জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর!" *(আহমাদ ৫/২২৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়ার গোনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার গোনাহ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও বড়। বরং সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট গোনাহ হল নিজ মায়ের সহিত

ব্যভিচার করার সমান!!

রসূল ﷺ বলেন, "সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত!" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

"সূদ এমন একটি বড় গোনাহ যে, যদি তাকে সত্তর ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে তার সবচেয়ে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান গোনাহর শামিল!" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, মিশকাত ২৮২৬ নং)*

আর এ কথা বোঝাবার নয় যে, ব্যভিচার কত বড় ঘৃণ্য পাপ; যে পাপ বিবাহের পর করলে, তার শাস্তি হল হত্যা। এতো দূরবর্তী একটি পর মেয়ের সাথে ব্যভিচার করার পাপ। পক্ষান্তরে তার দশগুণ বেশী পাপ কোন প্রতিবেশীর মহিলার সাথে ব্যভিচার করার। তার থেকে বড় পাপ বাড়ির কোন বেগানা মহিলার সাথে ব্যভিচার করার, তার থেকে বড় পাপ বাড়ির কোন এগানা মহিলার সাথে ব্যভিচার করার। তার থেকেও বড় পাপ নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার। আর সবচেয়ে বড় পাপ নিজের জননী মায়ের সাথে ব্যভিচার করার। আর সূদ খাওয়া তার চাইতেও বড় পাপ। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

আখেরাতে সূদখোরের নির্দিষ্ট প্রকার শাস্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। সামুরাহ ইবনে জুনদুব ؓ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম, সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।"

এই বর্ণনায় আছে, "একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম। সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।"

সে দু'জন আগন্তুক ছিলেন ফিরিশতা। তাঁরা তাঁকে জানালেন যে, ঐ লোক হল সূদখোর। *(বুখারী)*

বলাই বাহুল্য যে, সূদের টাকা এবং সেই টাকার খাদ্য নিঃসন্দেহে হারাম।

যাকে শরীয়তে সূদ বলে, তাই হারাম; চাহে তা ব্যক্তিগত কারো সাথে লেনদেন ক'রে হোক অথবা কোন কোম্পানী বা সংস্থার সাথে লেনদেন ক'রে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেওয়া হোক অথবা ব্যবসার প্রয়োজনে। সূদ সূদই। ব্যাংকের সূদও সূদই।

শয়তান থেকে সাবধান

মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি ক'রে ফিরিশ্‌তাদেরকে সিজদা করতে বললেন। ফিরিশ্‌তাদের দলে বড় আবেদ বলে ইবলীস শামিল ছিল। কিন্তু সে আসলে ছিল জ্বিন জাতিভুক্ত। ফিরিশ্‌তারা সকলে সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলীস হিংসা ও অহংকারবশে সিজদা করল না। মহান আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিলেন। সে বিতাড়িত হল এবং যার কারণে বিতাড়িত হল, তার সাথে চিরশত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেল। মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিলেন। সেই ক্ষমতা সে মানুষের উপর প্রয়োগ করতে পারবে। মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ ক'রে তাকে যথাসাধ্য ভ্রষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেবে, কষ্ট দেবে এবং মানুষকে বিপদগ্রস্ত করবে। অনেক সময় দৃশ্যতঃ উপকার করলেও আসলে সে বিরাট ক্ষতি করবে।

মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন।

শয়তান নিজে ভ্রষ্ট, সে তার শত্রুদেরকে ভ্রষ্ট করবে। সে যে দলের, সে দল ভারী করতে চাইবে। তাই মহান আল্লাহ আদেশ দিলেন, শত্রুকে বন্ধু মনে না ক'রে শত্রুরূপেই গ্রহণ করতে,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } (٦)

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। *(সূরা ফাত্বির ৬ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! ভ্রষ্ট বন্ধুর অনুসরণ ক্ষতির কারণ হলে ভ্রষ্ট শত্রুর পদাঙ্ক অনুসরণ কেমন হতে পারে? মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৮ আয়াত)*

মানুষকে তিনি কেবল তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ জানতে-অজান্তে অনেক সময় শয়তানের ইবাদত ক'রে থাকে। মহান আল্লাহ তাই সতর্ক ক'রে দিলেন,

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ }

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই দাসত্ব কর। এটিই সরল পথ। শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে; তবুও কি তোমরা বোঝ না? *(সূরা ইয়াসীন ৬০-৬২ আয়াত)*

আপনি বলতে পারেন, 'শয়তান যদি না হত, তাহলে মানুষ সরল পথে চলতে পারত এবং পাপ হতে বাঁচতে পারত, কিন্তু আল্লাহপাক তাকে সৃষ্টি করলেন কেন?'

নিষ্পাপ সৃষ্টি ফিরিশ্তামন্ডলী। অগণিত ফিরিশ্তা কোন প্রকারের পাপ না ক'রে সদা তাঁর ইবাদতে মগ্ন। কিন্তু তিনি এমন এক সৃষ্টি চাইলেন যারা ইবাদত করে আবার পাপও করে এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারো দরগায় না গিয়ে শুধু তাঁরই দরগাহে ভুলের মাথা অবনত করে ক্ষমা প্রার্থনার হস্ত উত্তোলন করে। কিন্তু শয়তান সৃষ্টি না করলে মানুষ হয়তো পাপ করতো না। আর

মানুষ নিষ্পাপ হয়ে ইবাদত করলে তাহলে তো ফিরিশ্তাই যথেষ্ট ছিল। আবার তাঁর আদেশ পালন করা যেমন ইবাদত, তেমনি তাঁর নিষেধ মানাও ইবাদত, পাপ না করাও ইবাদত। পাপের মহান নেতা (লিডার ও ডিলার) ইবলীসের সাথে লড়াই করাও ইবাদত।

তদনুরূপ ভালো-মন্দ বাছাই করার জন্যও শয়তান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যেহেতু অন্ধকার সৃষ্টি না করলে আলোর কদর হত না। শয়তান সৃষ্টি না করলে নেকী বা পুণ্যের কদর হত না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এক ভীষণ পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, অসংখ্য বন্ধন ও বাধা সত্ত্বেও সমস্তকে উল্লঙ্ঘন করে কে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করছে। শয়তানের বাধা ও তার চক্রবন্ধন না হলে সে পরীক্ষা (বিনা প্রশ্নে) অসমাপ্ত থেকে যায়।

শয়তানই মানুষের মাঝে পাপ ঘটায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সমুদ্রের উপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ!'" *(মুসলিম ২৮১৩নং)*

মানুষ ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের ইবাদত দেখলে তার ঈর্ষা হয়। তাকে সিজদা করতে দেখলে তার আফসোস হয়। তাই তাকে ইবাদতে বাধা দিতে প্রয়াস চালায়। কুফরী ও শির্কী কুমন্ত্রণা দিয়ে তার ঈমান ও তওহীদ নষ্ট করতে চায়; যাতে মানুষ ইবাদতই না করে। ইবাদতে বাধা দিতে না পারলে ইবাদতকেই নষ্ট করার চেষ্টা করে; হয় তাতে রিয়া ভরে দেয়, না হয় বিদআত করাতে চেষ্টা করে। নামাযের ভিতরে নানা অসঅসা সৃষ্টি করে। ভুলে যাওয়া নানা কথা নামাযে স্মরণ করিয়ে দেয়। নামাযীর রাকআত গুনতে ভুল হয়, তাশাহহুদ ছুটে যায়। নামাযীর ওযূতে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

মানুষকে বিপথগ্রামী করার বিভিন্ন ফাঁদ, জাল বা হাতিয়ার রয়েছে শয়তানের। যথাঃ মদ, জুয়া, মানুষের মনগড়া মা'বুদ, ফালকাঠি বা ফালনামা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَـاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِـي الْخَمْـرِ وَالْمَيْـسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(সূরা মাইদাহ ৯০-৯১ আয়াত)*

যোগযাদু, মানুষের প্রবৃত্তি ও রিপু; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য, নারী, অর্থ, পার্থিব প্রেম, অশ্লীল ছবি, গান-বাজনা, গাফেল মন প্রভৃতির সাহায্যে মানুষকে বিপন্ন করে। বাতিল জিনিসকে মানুষের কাছে হক বলে, অবৈধ জিনিসকে লোভনীয় ও শোভনীয় ক'রে পেশ করে।

বস্তুতঃ এইসব ফাঁদ দ্বারা মানুষের ঈমান-ধর্ম শিকারে ইবলীস বড় সফলতা অর্জন করেছে। মানুষের সম্বন্ধে ইবলীসের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। ওদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করেছে। অথচ ওদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان }

অর্থাৎ, ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল; অথচ ওদের ওপর তার কোন আধিপত্য ছিল না। *(সূরা সাবা' ২০-২১ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! শয়তান মানুষের (মুসলিমের) চিরশত্রু। সেই শত্রুর সাথে আজীবন তার জিহাদ চলে। অতএব তার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করুন।

ঈমানের আলোতে আলোকিত অন্তর প্রস্তুত করুন।

কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করুন।

আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা ও আল্লাহর যিক্র করুন।

পূর্ণ ইসলামী সমাজে বাস করার চেষ্টা করুন।

শয়তানের বিভিন্ন ধোকাদান পদ্ধতি ও মাধ্যমাদি সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করুন।

তার বিরোধিতা করুন।

আল্লাহর যিক্র নিয়মিত করলে শয়তান মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ২০১৮, আবু দাউদ ৩৭৬৫নং)*

মুসলিম যথার্থ অস্ত্র যখন ব্যবহার করে, তখন শয়তান কাবু হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। খাঁটি নেক ও মুমিন বান্দার কাছে সে কোনদিনই জয়লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ } (١٠٠) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে। *(সূরা নাহল ৯৯- ১০০ আয়াত)*

অতএব মানুষের উচিত, সেই গোপন শত্রুর বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ করা। শয়তান যত বড়ই শয়তান হোক, প্রকৃত আল্লাহর বান্দার কাছে সে বড় দুর্বল।

{الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } (٧٦) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগূতের পথে সংগাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল। *(সূরা নিসা ৭৬ আয়াত)*

নাউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম; মিন হামযিহী, অনাফখিহী, অনাফসিহ।

মা শাআল্লাহ-ইন শাআল্লাহ

মহান আল্লাহর বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তার নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। এ বিশ্বে যা কিছু ঘটছে সব তাঁরই ইচ্ছায় ঘটছে। তিনি যা চেয়েছেন, তা হয়েছে। যা চাচ্ছেন, তা হচ্ছে। যা চাইবেন, তা হবে। যা চাননি, তা হয়নি, যা চান না, তা হয় না। যা চাইবেন না, তা হবে না। তিনিই একমাত্র ইচ্ছাময় কর্তা।

তিনি ছাড়া এ বিশ্ব-পরিচালনায় কারো এখতিয়ার চলে না। এমনকি তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরও ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে যেতে পারে না। তিনি বলেছেন,

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ } (٤٩) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি তো আমার নিজের জন্য কোন অপকার ও উপকারের মালিক নই।' (সূরা ইউনুস ৪৯ আয়াত)

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (٣٠) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা দাহর ৩০ আয়াত)*

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(সূরা তাকবীর ২৯ আয়াত)*

ভাল-মন্দ সবকিছুই তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে কোন পাপ, কোন মন্দ ঘটত না। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা-ইরাদা দুই প্রকার; কওনী বা সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও শরয়ী বা শরীয়তগত ইচ্ছা। কওনী ইচ্ছাতে তিনি ফিরআউনের ঈমান চাননি, কিন্তু শরয়ী ইচ্ছাতে চেয়েছিলেন। কওনী ইচ্ছাতে চাইলে ফিরআউন অবশ্যই ঈমান আনত। আর যারা ঈমান আনে, তারা কওনী-শরয়ী উভয় ইচ্ছা অনুযায়ী এনে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা শরয়ী ইচ্ছা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا }

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন....। *(সূরা আনআম ১২৫ আয়াত)*

{وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ } (١٠٧)

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা অংশী-স্থাপন করত না। আর তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের কার্যবাহী (উকীল)ও নও। *(ঐ ১০৭ আয়াত)*

{وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (٩٣) سورة النحل

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। *(সূরা নাহল ৯৩ আয়াত)*

সুতরাং কোন কাজে বিকুলি প্রদর্শন করবেন না। কথায় বলে, 'যত কর বিকুলি, খোদার হাতে সকলি।' যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আপনার কোন কাজ উদ্ধার হবার নয়।

কাজের শুরুতেই আল্লাহর নাম নিন, সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে কাজে সফলতা পাবেন। সৃষ্টির কাছে কাজে বিফল হয়ে পরিশেষে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া লজ্জার কথা। আগামীতে কিছু করব বললে, 'ইন শাআল্লাহ' বলুন। বিস্ময় প্রকাশের সময় 'মা শাআল্লাহ' বলুন। আল্লাহ নারায হবেন না।

আমাদের আদর্শ নবীগণ (আলাইহিমুস স্বালাতু অস্‌সালাম) এবং তাঁদের অনুসারিগণ এই নির্দেশানুসারে কথা বলতেন। তার উদাহরণ রয়েছে আল-কুরআনে। যেমনঃ-

মূসা ﷺ আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর সম্প্রদায়কে গাই যবেহ করতে বললেন। তাঁরা গাইয়ের নানা গুণ জানতে চেয়ে তাঁকে বলেছিলেন,

{ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} (٧٠)

অর্থাৎ, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলুন, গাইটি কি ধরনের? আমাদের নিকট গরু তো পরস্পর সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথ পাব।' *(সূরা বাক্বারাহ ৭০ আয়াত)*

ইসমাঈল ﷺ চলাফিরার বয়সে উপনীত হলে আব্বা ইব্রাহীম বললেন,

{يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى}

অর্থাৎ,'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি বল।'

তখন ইসমাঈল ﷺ বলেছিলেন,

{ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (١٠٢) سورة الصافات

অর্থাৎ,'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ১০২ আয়াত)*

ইউসুফ ﷺ-এর পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ মিসরে প্রবেশ করাকালে তিনি বলেছিলেন,

{ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ} (٩٩) سورة يوسف

অর্থাৎ,'আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' *(সূরা ইউসুফ ৯৯ আয়াত)*

মূসা ﷺ খাযির ﷺ-এর কাছে ইল্‌ম শিখতে গেলে খাযির ﷺ বলেছিলেন, 'তুমি আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না।' মূসা ﷺ বলেছিলেন,

{سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} (٦٩) سورة الكهف

অর্থাৎ,'ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' *(সূরা কাহফ ৬৯ আয়াত)*

মূসা ﷺ-এর শ্বশুর নিজ মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহের মোহর ধার্য করার সময় বলেছিলেন,

{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} (٢٧) سورة القصص

অর্থাৎ, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে; অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন শাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।' *(সূরা ক্বাসাস ২৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর নবীর ভবিষ্যতে মক্কা প্রবেশ করার ব্যাপারেও ঐ কথা বলেছেন,

{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} (٢٧) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে কেউ কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। *(সূরা ফাত্‌হ ২৭ আয়াত)*

যারা নিজেদের কাজে 'ইন শাআল্লাহ' বলে না। তাদের অনেককে মহান আল্লাহ কারেন্ট্‌ শাস্তি দেন। এর প্রমাণ রয়েছে কুরআন-হাদীসে। যেমনঃ-

একদা সুলাইমান ﷺ বললেন, 'আজ রাতে আমি অবশ্যই আমার সকল স্ত্রীদের সাথে মিলন করব। তাতে প্রত্যেকটি স্ত্রী একটি ক'রে ছেলে সন্তান প্রসব করবে, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।' কিন্তু তিনি 'ইন শাআল্লাহ' বললেন না। ফলে স্ত্রীদের মধ্যে মাত্র একজন একটি অর্ধাকৃতির শিশু ভূমিষ্ঠ করল। মহানবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তিনি যদি 'ইন শাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে (তাঁর আশানুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করত এবং) তারা সকলে অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইউসুফ ﷺ যুলাইখার প্রেম-আহবানে সাড়া না দিয়ে জেলে গেলেন। সেখানে দুই সাথীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বললেন এবং তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত দিলেন।

{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} (٤٢) سورة يوسف

আর তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তাঁকে তাঁর প্রভুর কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং তিনি কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেলেন। *(এক তফসীর অনুযায়ী অর্থ, সূরা ইউসুফ ৪২ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তিনি যদি 'ইন শাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে তার আগেই মহান আল্লাহ জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

মুশরিকরা একদা আমাদের নবী ﷺ-কে আসহাবে কাহ্‌ফ, যুল-ক্বারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, "আগামী কাল তোমাদেরকে বলব।" তিনি 'ইন শাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। আর তার ফলে পনেরো দিন অহী আসা বন্ধ থাকল। তিনি দুঃখিত হলেন এবং কাফেররা তাঁর ব্যাপারে কটাক্ষ করতে লাগল। অতঃপর মহান আল্লাহ প্রশ্নের উত্তর-সহ অহী অবতীর্ণ করলেন এবং নবীকে শিক্ষা দিলেন যে,

{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا} (٢٤) سورة الكهف

অর্থাৎ, কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, 'আমি ওটা আগামীকাল করব।' ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বলো, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এ অপেক্ষা সত্যের নিকটতম পথ নির্দেশ করবেন।' *(সূরা কাহফ ২৩-২৪ আয়াত)*

দু'টি বাগান-ওয়ালা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"(হে নবী!) তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির একটি উপমা; তাদের একজনকে আমি

দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুর বাগান এবং সে দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম। আর এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নদী। তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে তোমার তুলনায় আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার তুলনায় আমি বেশী শক্তিশালী।' এভাবে নিজের প্রতি যুলুম ক'রে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' উত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে বীর্য হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে তোমার তুলনায় আমাকে কম দেখলে, তখন তোমার বাগানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ হতে আগুন বর্ষণ করবেন; যার ফলে তা মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' তার ফল-সম্পদ পরিবেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল; যখন তা মাচান সহ পড়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার সত্য আল্লাহরই। পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।" *(ঐ ৩২-৪৪ আয়াত)*

যেমন অন্য কিছু বাগান-ওয়ালাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে; যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল এবং তারা 'ইন শাআল্লাহ' বলল না। অতঃপর সেই বাগানে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। ফলে তা ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল। ভোর-সকালে তারা এক অপরকে ডাকাডাকি করে বলল, 'তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে সকাল সকাল বাগানে চল।' অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে শুরু করল, 'আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।' অতঃপর তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত!' তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।' অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।' শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি কঠিনতর; যদি তারা জানত।" *(সূরা ক্বালাম ১৭-৩৩ আয়াত)*

ব্রাদারানে ইসলাম! আমরা জানি যে, বদ-নজর লাগা সত্যি। অর্থাৎ বদ-নজরের প্রভাবে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, শিশু দুধ খায় না, গাইয়ে দুধ দেয় না, গাছ মারা যায় ইত্যাদি। একদা সাহ্ল বিন হুনাইফ গোসল করছিলেন। আমের বিন রাবীআহ তাঁর দেহের ত্বক দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'আজকের মত কোন পর্দানশীন যুবতীর ত্বকও দেখিনি!' এর তাসীরে সাহল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, "কিসের জন্য তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করে? তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের মুগ্ধকর কিছু দেখবে, তখন সে যেন তার জন্য বর্কতের দুআ দেয়।" অতঃপর তার চিকিৎসার কথা বলে দিলেন।

সুতরাং বুঝা গেল যে, মুগ্ধকর কোন আশ্চর্য ও সুন্দর (বৈধ) জিনিস দেখে বর্কতের দুআ দিলে বদ-নজর কার্যকর হয় না। যেমন ঃ 'বাঃ! গাছটা এত সুন্দর হয়েছে? বারাকাল্লাহু ফীহা।' 'আরে! তোমার বাচ্ছাটা বেশ দেখার মত হয়েছে তো! তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন।' 'ইস! গাইটা এত দুধ দেয়? আল্লাহুম্মা বারিক ফীহা।' ইত্যাদি বললে নজর লাগে না।

যেমন নিজের নয়নাভিরাম জিনিস দেখে 'মা শাআল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বললে আল্লাহ নারাজ হন না।

'মা শাআল্লাহ-ইন শাআল্লাহ'র সঠিক ব্যবহার হওয়া চাই। 'মা শাআল্লাহ' অতীতের সুন্দর খবর বলতে এবং 'ইন শাআল্লাহ' আগামীতে কোন ভাল অথবা বৈধ কাজ করব বলতে ব্যবহার করতে হয়।

এক ব্যক্তি বাজার যাচ্ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' বলল, 'বাজার যাচ্ছি, বাজার করব।' লোকটা বলল, 'ইন শাআল্লাহ বল।' সে বলল, 'এতে ইন শাআল্লাহর কি আছে? পকেটে টাকা আছে। বাজার ক'রে থলে ভরব আর ফিরে আসব।'

কিন্তু বাসের ভিড়ের মধ্যে পকেটমার তার পকেট মেরে নিল। বাজারে নেমে সে মাথায় হাত দিল। ফিরার পথে সেই লোকের সাথে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করল, 'বাজার করলে?' সে তখন শিক্ষা পেয়ে বলল, 'ইন শাআল্লাহ হয়নি।' সে বলল, 'কি ব্যাপার?' বলল, 'ইন শাআল্লাহ পকেটমারে টাকা চুরি ক'রে নিয়েছে।' সে বলল, 'কোথায় কিভাবে?' বলল, 'ইন শাআল্লাহ বাসে ভিড়ে....।'

নিশ্চয় 'ইন শাআল্লাহ'র এ ব্যবহার সঠিক নয়। যেমন বৈধ নয় চোরের 'ইন শাআল্লাহ ধরা পড়ব না' বলা, অভিনেত্রীর 'এ ফিল্মটা ইন শাআল্লাহ ভাল হবে' বলা, ব্যবসায়ীর 'ইন শাআল্লাহ মদের ব্যবসায় লাভ হবে' বলা ইত্যাদি।

'ইন শাআল্লাহ' তিন অর্থে ব্যবহার হয় ঃ-

১। তাকীদের অর্থে। 'ইন শাআল্লাহ আমি যাব।'

২। আল্লাহর ইচ্ছার উপর লটকে দেওয়ার অর্থে। অর্থাৎ, 'আল্লাহ চাইলে আমি যাব।'

৩। ধোকা দেওয়ার অর্থে।

একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে। একজন অমুসলিম একজন মুসলিমকে টাকা ধার দিয়েছিল এক সপ্তাহের জন্য। সপ্তাহ পার হলে অমুসলিম লোকটি মুসলিমের কাছে এসে টাকা চাইল। মুসলিম লোকটি বলল, 'আগামী সপ্তাহে দিয়ে দেব ইনশাল্লা।' পরের সপ্তাহেও একই কথা বলল। আসলে লোকটি ছিল ছেঁচড়। পায়ের চপ্পল ক্ষয় ক'রেও যখন টাকা আদায় করতে পারল না, তখন শেষদিন অন্য এক মুসলিমকে অমুসলিম লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা! এই ইনশাল্লা মানে কি?' সে বলল, 'কেন কি ব্যাপার?' বলল, 'অমুকের কাছে টাকা পাব। যখনই চাইতে যাই, তখনই বলে, ইনশাল্লা আগামী সপ্তাহে। অথচ পরের সপ্তাহে এলেও ঐ একই কথা বলে।'

বলল, 'ওহো! অমুককে টাকা ধার দিয়েছ? ওর ইনশাল্লা মানে, দেব নারে শালা!'
বলা বাহুল্য, মিথ্যা কথায় 'ইন শাআল্লাহ' বলা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে আল্লাহর নামের ভুল প্রয়োগ হয়ে থাকে।

জাহান্নামের বিবরণ

জাহান্নাম পরকালের এক নিকৃষ্টতম বাসস্থান। যা আল্লাহপাক ধর্মদ্রোহী, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী। অবিশ্বাসী, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং পাপীদের জন্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। যেখানে তারা স্ব-স্ব কৃতকর্মের শাস্তিমূলক প্রতিফল ভোগ করবে।

জাহান্নাম পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নীচে অবস্থিত। কিয়ামতের দিন তা উপস্থিত করা হবে। *(কুঃ ৮৯/২৩)* সেদিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতি লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা ধারণ ক'রে আকর্ষণ পূর্বক আনয়ন করবেন। *(মুঃ ২৮৪২)*

দোযখে সাতটি বিভাগ ঃ জাহান্নাম, জাহীম, সায়ীর, সাকার, হুতামাহ, হাবিয়াহ ও লাযা। সাধারণভাবে সবগুলিকেই জাহান্নাম বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} (٤٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, ওর সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে পৃথক পৃথক দল আছে। *(সূরা হিজ্র ৪৪ আয়াত)*

দোযখের গভীরতা সত্তর বছরের পথ। *(মুঃ ২৮ ৪৪)* জাহান্নাম ও তার সবকিছু কালো আকার। জাহান্নামবাসীরাও বীভৎস কৃষ্ণকায়। ওদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার নিশীথের আস্তরণে আচ্ছাদিত। *(কুঃ ১০/২৭)*

জাহান্নামের অগ্নি পার্থিব অগ্নি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার দাহিকা শক্তি ও উষ্ণতা এ অগ্নির চেয়ে সত্তর গুণ বেশী। *(বুঃ ৩২৬৫, মুঃ ২৮৪৩)*

প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড! কি ভয়ঙ্কর তার লেলিহান শিখা। যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই অধিক অগ্নি বৃদ্ধি করা হবে। *(কুঃ ১৭/৯৭)* দূর হতে যার ভীষণ ক্রুদ্ধনিনাদ ও ভয়াল গর্জন শোনা যাবে। *(কুঃ ২৫/১২)* যে জ্বালাময় হুতাশনের ইন্ধন হবে (কাফের) মানুষ, (বারুদ জাতীয়) প্রস্তর, বাতিল মা'বুদ (যাঁরা তাদের ইচ্ছা ও খবর ছাড়াই পূজিত হন তাঁরা ব্যতীত) *(কুঃ ২১/৯৮)* এবং কাফের জিন। *(কুঃ ৭২/১৫)*

যার নিয়ন্ত্রণ-ভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশ্তাগণের উপর। *(কুঃ ২/২৪, ৬৬/৬)*

পার্থিব জীবনে কাফেররা সাধারণতঃ শীতল বায়ু, ছায়া এবং শীতল পানীয় দ্বারা বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পুনরুত্থান বা পরকালকে অবিশ্বাস করে অনমনীয়ভাবে ঘোরতর পাপে লিপ্ত থাকে। তাই সেদিন তার প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নাম হতে সেবন করবে- অত্যুষ্ণ বায়ু, পান করবে উত্তপ্ত পানি এবং অবস্থান করবে (জাহান্নামের) কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। *(কুঃ ৫৬/৪২-৪৭)*

জাহান্নামীদের খাদ্য ঃ

১। যন্ত্রণাদায়ক যাক্কুম বৃক্ষ ঃ এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশে উদ্‌গত হয়। এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মত। সীমালঙ্ঘনকারীরা তা ভক্ষণ করে উদরপূর্ণ করবে এবং (কণ্ঠে আটকে গেলে) তার

সঙ্গে ফুটন্ত পানি তৃষ্ণার্ত উঁটের ন্যায় পান করবে। এটিই হবে জাহান্নামীদের আপ্যায়ন। *(কুঃ ৩৭/৬২-৬৭, ৫৬/৫২-৫৬)* যাক্কুম উদরে গিয়ে ফুটন্ত পানি ও গলিত তাম্রের মত ফুটতে থাকবে। আবার তার উপরেও তাদের মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। *(কুঃ ৪৪/৪৩-৪৮)* ঐ যাক্কুমের সামান্য পরিমাণ যদি জাহান্নাম হতে পৃথিবীতে আসে তবে পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় তার বিষাক্ততায় বিনষ্ট হয়ে যাবে। *(তিঃ ২৫৮৫)*

২। যারী' ঃ এক প্রকার কন্টকময় বিষাক্ত গুল্ম। যা জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে। যাতে তারা পুষ্টও হবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না। *(কুঃ ৮৮/৬-৭)*

৩। গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য। *(কুঃ ৭৩/১৩)*

৪। গিসলীন ঃ জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত স্রাব। *(কুঃ ৬৯/৩৬)*

জাহান্নামীদের পানীয় ঃ

১। হামীম ঃ অত্যুষ্ণ ফুটন্ত পানি। *(কুঃ ৫৬/৫৪-৯৩)* যা পান করলে জাহান্নামীদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। *(কুঃ ৪৭/১৫)*

২। গাস্‌সাক ঃ অতিশয় দুর্গন্ধময় তিক্ত অথবা নিরতিশয় শীতল পানীয়। *(কুঃ ৩৮/৫৭, ৭৮/২৫)*

৩। সাদীদ ঃ জাহান্নামীদের পচনশীল ক্ষত-নির্গত পুঁজ-রক্ত বা ঘাম; যা তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। তারা অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তখন) সব দিক থেকে তাদের নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের ঘটবে না। আর তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। *(কুঃ ১৪/১৬-১৭)*

৪। গলিত ধাতু অথবা তৈলকিট্টের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় ও দুর্গন্ধময় পানীয় ঃ যখন জাহান্নামীরা পানি চাইবে তখন এই পানীয় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কি ভীষণ সে পানীয়, আর কি নিকৃষ্ট তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান! *(কুঃ ১৮/২৯)*

জাহান্নামীদের পোষাক হবে আলকাতরা, *(কুঃ ১৪/৫০)* লোহা এবং আগুনের। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে। আর ওদের জন্য থাকবে লৌহ-মুদগর বা সাঁড়াশি। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে আবার ওখানেই ফিরিয়ে দিয়ে বলা হবে, 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা!' *(কুঃ ২২/১৯-২২)*

জাহান্নামীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ঃ

শৃঙ্খল। *(কুঃ ৭৬/৪)* যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। *(কুঃ ৬৯/৩২)* এবং ওদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে। *(কুঃ ৩৪/৩৩)* আর ওদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে পদবেড়িও। *(কুঃ ৭৩/১২)*

অধিক ও চিরস্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য যখনই অগ্নিদাহে তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করা হবে। *(কুঃ ৪/৫৬)*

তেমনি তাদের দেহের স্থূলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। একজন কাফেরের দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশ দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ-সম দীর্ঘ হবে! একটি দাঁত উহুদ পর্বতসম এবং তার চর্মের স্থূলতা হবে তিনদিনের পথ! *(মুঃ ২৮৫১, ২৮৫২)* অথবা বিয়াল্লিশ হাত। আর জাহান্নামে তার অবস্থান ক্ষেত্র হবে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমিঃ।) *(তিঃ ২৫৭৭, মুঃ আঃ ২/২৬)* এসব বিচিত্র হলেও আল্লাহর কাছে অবাস্তবতার কিছু নেই।

অগ্নির বেষ্টনী জাহান্নামীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। *(কুঃ ১৮/২৯)* অগ্নিদগ্ধে ওদের

মুখমন্ডল বীভৎস হয়ে যাবে। *(কুঃ ২৩/১০৪)*

জাহান্নামে উটের মত বৃহদাকার এমন সর্প আছে, যদি তা একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বছর তার বিষাক্ত যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকবে। খচ্চরের মত এমন বড় বড় বিছা আছে যার দংশন জ্বালা চল্লিশ বছর বর্তমান থাকবে। *(মুঃ আঃ ৪/১৯১)*

দোযখে কাফেরদেরকে উল্টা করে মুখের উপর ভর দিয়ে টানা হবে। *(কুঃ ৫৪/৪৮)* যারা কোন অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে সেই অস্ত্র নিয়েই চিরদিন নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। যে বিষপান করে নিজের জীবননাশ করে, জাহান্নামে সে সেই বিষ চিরদিন পান করতে থাকবে। যে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামে চিরদিন ঐভাবে পড়তে থাকবে। *(বুঃ ৫৭৭৮, মুঃ ১০৯)*

কেউ কেউ নিজের নাড়িভুড়ি ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে বেড়াবে। কোন কোন কাফেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা সেখানে নিজেদের ধ্বংস কামনা করবে। তখন ওদের বলা হবে,

{لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا } (١٤) سورة الفرقان

অর্থাৎ, 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বরং বহুবার ধ্বংস কামনা করতে থাক।' *(কুঃ ২৫/১৩-১৪)*

জাহান্নামে অনেকের তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হবে। *(মুঃ ২৮৪৫)*

জাহান্নামের সবচেয়ে ছোট আযাবঃ

জাহান্নামীকে আগুনের তৈরী একজোড়া জুতা পরানো হবে, যার তাপে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই আযাব নবী ﷺ-এর চাচা আবু তালেবকে দেওয়া হবে। *(মুঃ ২১২, মিঃ ৫৬৬৭)*

আযাবের কঠিনতায় জাহান্নামীরা ভীষণ চীৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে। *(কুঃ ১১/১০৬)* কিন্তু ওরা তো স্থায়ীভাবে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। *(কুঃ ৪৩/৭৪-৭৫)* ওদের মৃত্যুরও আদেশ দেওয়া হবে না, যে ওরা মরবে। ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা আর করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকটে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" *(কুঃ ৩৫/৩৬-৩৭)* ওরা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে ছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী (অবিশ্বাস) করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী (যালেম) হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে (মুমিন দলকে) নিয়ে তোমরা উপহাস (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) করতে এত বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের (ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের)কে

নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে। আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" *(কুঃ ২৩/১০৬-১১০)*

"ওরা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে এবং চীৎকার করে বলবে, হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ ক'রে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই অবস্থান করবে।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছায়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য বিমুখ ছিল।" *(কুঃ ৪৩/৭৭-৭৮)*

জাহান্নামীরা কেঁদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নদী প্রবাহিত হবে এবং তার উপর নৌকা চলাও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। *(সজাঃ ২০৩২নং)*

দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। *(বুঃ ৬৫৪৬, মুঃ ৭৯)*

জাহান্নামে অধিকাংশ মানব-দানব নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরো আছে কি?' *(কুঃ ৫০/৩০)*

{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ } (٣٠) سورة ق

তখন আল্লাহ পাক নিজের কদম (পা) দোযখে রাখবেন। তখন সংকুচিত হয়ে সে বলবে, 'ব্যস, ব্যস্।' *(বুঃ ৭৩৮৪, মুঃ ২৮৪৮)*

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ.

জান্নাতের বিবরণ

এ পৃথিবীর বুকে মানুষ যতই সুখের অধিকারী হোক না কেন, সে সুখ নির্মল নয়। যতই শান্তির মালিক হোক না কেন, সে শান্তি অনাবিল নয়। কিন্তু পরকালের সুখ অতুলনীয়, অকল্পনীয়, সকল সৌন্দর্য অমলিন ও নিখুঁত।

সেখানে হাসি আছে, কান্না নেই। সুচিন্তা আছে, দুশ্চিন্তা নেই। আনন্দ আছে, বেদনা নেই। প্রীতি আছে, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ নেই। সেখানে কেবল সুখ আছে, কোন দুঃখ, কর্মব্যস্ততা ও বিপদ-আপদ নেই।

জান্নাতীদের দেহ হবে আদি পিতা আদম ﷺ-এর সমতুল্য ষাট হাত দীর্ঘ। *(বুখারী ৩৩২৬, মুসলিম ২৮৪১)* শোভনীয় লোম ছাড়া দেহে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় লোম এবং শ্মশ্রু থাকবে না। চক্ষু হবে সুর্মাবরন। বয়স হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ। *(তিরমিযী ২৫৪৫)* অনন্তকাল ধরে তারা এই বয়স নিয়েই চির সুন্দর যুবক হয়ে থাকবে। *(মুসলিম ২৮৩৬)* সেখানে যৌন-মিলনে অধিক তৃপ্তিলাভ করবে। প্রত্যেক জান্নাতীকে একশ জন পুরুষের সমান যৌন-শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা প্রদান করা হবে। *(তিরমিযী ২৫৩৬)*

জান্নাতের প্রস্থ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমান। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } (١٣٣)

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(কুরআন ৩/১৩৩) সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীকে পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণ স্থান দেওয়া হবে। *(মুসলিম ১৮৬)*

জান্নাতে বিভিন্ন সৌন্দর্যখচিত হিরন্ময় মহল ও কক্ষ, বহুতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ প্রাসাদ আছে। পাশাপাশি একটি সোনার ও অপরটি চাঁদির ইঁট এবং মধ্যখানে সংযোজক মিস্‌ক দ্বারা নির্মিত। *(তিরমিযী ২৫২৬, মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ} (٢٠) سورة الزمر

অর্থাৎ, তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। *(সূরা যুমার ২০ আয়াত)*

জান্নাতে একটি মুক্তানির্মিত তাঁবু আছে। যার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। *(মুসলিম ২৮৩৮)* জান্নাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশ। *(কুরআন ৫৫/৫৪)* স্বর্ণখচিত আসন, *(কুরআন ৫৬/১৫)* উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। *(কুরআন ৮৮/১৩-১৬)*

জান্নাতের উদ্যান ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। *(কুরআন ৫৬/৪৮)* সেখানে থাকবে কন্টকহীন বদরীবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা ও সম্প্রসারিত ছায়া। *(কুরআন ৫৬/২৮-৩০)*

জান্নাতে এমন এক সুবৃহৎ বৃক্ষ আছে যার নিচে আরোহী একশত বৎসর চললেও তার ছায়ার সমাপ্তি হবে না। *(বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭)*

নাম এক হলেও দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে জান্নাতের কোন জিনিসের কোন মিল নেই, কোন তুলনাই নেই। *(কুরআন ২/২৫, তফসীর ইবনে কাসীর ১/৬২-৬৩)*

জান্নাতের মাটি জাফরান। তার নিম্নদেশে চারটি নহর প্রবাহিত। নির্মল পানির নহর, দুগ্ধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুস্বাদু সুধার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। *(কুরআন ৪৭/১৫)* জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। *(কুরআন ৫৬/১৯)*

বেহেশ্তের খাবার পর্যাপ্ত পছন্দমত ফল-মূল, ইপ্সিত পাখির মাংস। *(কুরআন ৫৬/২০-২১)*

সেখানে প্রত্যেক ফল দু'-প্রকার থাকবে। *(কুরআন ৫৫/৫২)* রকমারি ফলের বৃক্ষে ফল ঝুলে থাকবে। *(কুরআন ৫৫/৫৪)* যা সম্পূর্ণরূপে জান্নাতীদের আয়ত্তাধীন করা হবে। *(কুরআন ৬৯/২৩, ৭৬/১৪)* জান্নাতীগণ বসে বা শয়ন করেও ফল তুলে খেতে পারবে।

জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে একপ্রকার মাছের কলিজা দ্বারা। *(বুখারী ৩৩২৯, মুসলিম ৩১৫)*

জান্নাতের সুগন্ধি ঃ

জান্নাত সুগন্ধিতে এত ভরপুর হবে যে, তার সুগন্ধ ৫০০ বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও পাওয়া যাবে। *(ত্বাবারানী)*

জান্নাতীর প্রয়োজন ঃ

জান্নাতীদের কোন কফ-থুথু নেই। জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। *(মুসলিম ২৮৩৫)*

জান্নাতী জীবন এক চিরস্থায়ী বিলাসরাজ্য। যেখানে কোন দুঃখ-দুর্দশা নেই। কোন দুশ্চিন্তা, ক্লেস ও ক্লান্তির স্পর্শ নেই। (কুরআন ৪৪/৫৬) চিরসুখ ও আনন্দোপভোগের স্থান জান্নাত। সেখানে আর মৃত্যু নেই। সেখানে নিদ্রাও নেই। (সিঃসঃ ১০৮৭নং) সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ মুমিন তার সঙ্গিনীদের সহিত তথায় ইচ্ছাসুখে অফুরন্ত মহানন্দে অনন্তকাল বাস করবে।

সেখানে কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন পালনীয় ইবাদত-বন্দেগী থাকবে না। শ্বাসক্রিয়ার ন্যায় সদা তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। শান্তিবাক্য ছাড়া তারা কোন অসন্তোষজনক বা অসার বাক্য শুনবে না। *(কুরআন ১০/১০, ৫৬/১৪-২৬, মিশকাত ৫৬২০)*

জান্নাতীর পরিচ্ছদ ঃ

জান্নাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(কুরআন ২২/২৩)* তাদের বসন হবে সুক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে। *(কুরআন ৭৬/২১)* তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। *(বুখারী, মুসলিম)*

জান্নাতী স্ত্রীগণ ঃ

সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনী। *(কুরআন ২/২৫)* বেহেশ্তী পত্নী, হুর বা অপ্সরা। তাঁদের সহিত জান্নাতীদের বিবাহ হবে। *(কুরআন ৪৪/৫৪,৫২/২০)* (অতএব তাদেরকে স্বর্গ-বেশ্যা বা স্বর্গীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভুল)। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়।

প্রত্যেক জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেশ্তী স্ত্রী পাবে। সপত্নী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না। *(কুরআন ৭/৪৩, ১৫/৪৭)* পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহেশ্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্নীর খিদমত করবে।

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছু থাকবে না। *(বুখারী ৩৩২৭, মুসলিম ২৮৩৫)* স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। *(তিরমিযী ২৫৬৩, মুসলিম ৩/৮০ দাঃ)*

বেহেশ্তী হুর। লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বীগণ -সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। *(কুরআন ৩৭/৪৮-৪৯)* সে আয়ত নয়না তরুনীগণ -যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি। *(কুরআন ৫৫/৫৬,৫৮)* বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। *(মুসলিম ২৮৩৪)*

সম্ভ্রান্তা শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য বিষেশরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। *(কুরআন ৫৬/৩৪-৩৭)* এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী।

(কুরআন ৭৭/৩৩) সেই বেহেশ্তবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন তরুণী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। অনন্ত যৌবনা -এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মূল্যবান। *(বুখারী ৬৫৬৮নং)*

জান্নাতের খাদেম ঃ

সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর (গেলমান)রা স্বর্ণনির্মিত পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পাত্র নিয়ে জান্নাতীদের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকবে। *(কুরআন ৫৬/ ১৭। ৪৩/৭১, ৭৬/১৯, ৫২/২৪)*

জান্নাতীর চরিত্র

জান্নাতীদের মাঝে আপোসে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সকলেই ভাই-ভাই হয়ে সেখানে বসবাস করবে। *(সূরা হিজ্র ৪৭ আয়াত)* তাদের সকলের হৃদয়-মন একটি মানুষের হৃদয়-মনের মত হবে। *(বুখারী)*

জান্নাতের বাজার ঃ

জান্নাতীগণ তো এমনিতেই শোভা সৌন্দর্য ও সৌরভের রাজা। তা সত্ত্বেও যখন তারা জান্নাতের বাজারে প্রতি শুক্রবার বিহারে (ভ্রমণে) যাবে, তখন এক প্রকার সুবাসিত উত্তরী বাতাস চলবে। যাতে তাদের মুখমন্ডল ও পোশাকাদি সুরভিত হয়ে উঠবে এবং তাদের অধিক সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। অতঃপর তারা যখন স্ব-স্ব বাসস্থানে স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসবে তখন দেখবে তাদেরও অধিক রূপ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়েছে। *(মুসলিম ২৮৩৩)*

জান্নাতের সুখ অকল্পনীয় ঃ

সেখানকার সব কিছুই ভোগ-বিলাস ও অতুল সুখ-সম্ভোগের উপকরণ। সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় সমস্ত কিছু। সেখানে কারো কোন বস্তুর উপর আশা, আকাঙ্খা, বা অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকবে না। *(কুরআন ৪৩/৭১, ৭৬/২০, ৪১/৩১, বুখারী ৭৫১৯, মিশকাত ৫৬৪৮)*

জান্নাত এমন সৌন্দর্যময় বাসস্থান যা কোনদিন কোন চক্ষু দর্শন করেনি, যার কথা কোন কর্ণও শ্রবণ করেনি এবং কারো ধারণায়ও আসেনি। 'যত তুমি ভাবতে পারো, তার চেয়ে সে অনেক আরো' সৌন্দর্য ও শ্রীতে ভরা। কারো কল্পনা ও খেয়ালে সে সৌন্দর্য কোন দিন অঙ্কিত হয়নি এবং হবেও না। *(কুরআন ৩২/১৭, মুসলিম ২৮২৪, বুখারী ৭৪৯৮)*

{يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (٧١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। *(যুখরুফ ৭১)*

{نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ }

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন। *(সূরা ফুসসিলাত ৩১-৩২ আয়াত)*

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ঃ

এ সমস্ত সম্পদ অপেক্ষাও এক বৃহত্তর সম্পদ রয়েছে বেহেশ্তীদের জন্য; মহান প্রতিপালক রব্বুল ইযযাত অল-জালালের চেহারা করীম দর্শনের তৃপ্তি ও সৌভাগ্যলাভ। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "আরো অধিক (উত্তম সম্পদ) এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদের প্রদান করব।" তারা বলবে, 'আপনি আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন (এর চেয়ে আবার উত্তম কি চাই প্রভু?)' ইত্যবসরে (ঊর্ধ্বদিকে) জ্যোতির যবনিকা উন্মোচিত হবে। তখন জান্নাতীরা সকলে আল্লাহর চেহারার প্রতি (নির্নিমেষ) দৃষ্টিপাত করবে। (তাতে তাদের নিকট অন্যান্য সব কিছু অবহেলিত হবে) এবং সেই দর্শন সুখই হবে জান্নাতীদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোনীত সম্পদ। *(কুরআন ৫০/৩৫,৭৫/২২-২৩, ১০/২৬, মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৩২)* আর এক উত্তম সম্পদ যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর চির সন্তুষ্ট হবেন। কোন কালে আর অসন্তুষ্ট হবেন না। *(মুসলিম ২৮২৯)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (٧٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। *(সূরা তওবা ৭২ আয়াত)*

মহান আল্লাহর কাছে দুআ ঃ-

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِله وَآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِله وَآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِيْ رُشْداً.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.